প্রবাস বন্ধু

শারদীয়া সংখ্যা ২০২১

১৪২৮ : প্রবাস বন্ধু : সূচীপত্র : শারদীয়া সংখ্যা : 2021

সম্পাদকীয়	মালবিকা চ্যাটার্জী (হিউস্টন, টেক্সাস)	2
গদ্য		
নব্য ভারতচর্যার উন্মেষ	৺অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ভাষান্তর: রন্তিদেব সরকার (কলকাতা, ভারত)	3
ইতিবাচক ভাবনার গুরুত্ব	মৃণাল চৌধুরী (হিউস্টন, টেক্সাস)	7
অজানা দেশ	অলোক কুমার চক্রবর্তী (কলকাতা, ভারত)	11
অসমাপ্ত রূপকথা	অদিতি ঘোষদস্তিদার (মরিস প্লেইনস্, নিউ জার্সি)	16
ছেলেবেলার ছাদ	সুমিতা বসু (হিউস্টন, টেক্সাস)	19
শালিনী আন্টির গল্প	বীরেশ্বর মিত্র (পুনা, ভারত)	24
রোমন্থন	সুজয় দত্ত (ক্লিভল্যান্ড, ওহাইও)	28
হাজারো নিকোলাস	নিবেদিতা গাঙ্গুলী (হিউস্টন, টেক্সাস)	52
যত কাণ্ড ক্যালকুলেটরে	সংগ্রামী লাহিড়ী (পারসিপ্যানি, নিউ জার্সি)	55
অনামিকা	মল্লিকা ব্যানার্জী (আমেদাবাদ, ভারত)	58
হে ভগবান, ব্রাজিলই যেন জেতে	বলাকা ঘোষাল (হিউস্টন, টেক্সাস)	63
২০২১-এর সর্বগ্রাসী রাক্ষস	হুসনে জাহান (স্যান হোসে, ক্যালিফোর্নিয়া)	68
আত্মজ	দেবব্রত তরফদার (কলকাতা, ভারত)	71
সহজ টানাপোড়েন	সুস্মিতা রায়চৌধুরী (পাইন ব্রুক, নিউ জার্সি)	84
মেরি খ্রীস্টমাস	অমিত দে (হিউস্টন, টেক্সাস)	88
হলুদ গোলাপ	পৌষালী ঘোষ (কলকাতা, ভারত)	89
ভক্ত কুকুর ও বুনো শিয়াল	রঙ্গনাথ (হিউস্টন, টেক্সাস) রঙ্গনাথ	91
জয় পরাজয়	জয়া ঘোষ (স্যাক্রামেন্টো, ক্যালিফোর্নিয়া)	93
তেষ্টা	অযান্ত্রিক (কলকাতা, ভারত)	95
সুরার সুড়সুড়ি	রাজর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায় (হিউস্টন, টেক্সাস)	98
ওরা অকারণে চঞ্চল	কল্যাণী মিত্রা ঘোষ (ভিস্টা, ক্যালিফোর্নিয়া)	103

কবিতা

অব্যক্ত, অয়ন-অন্ত পত্র	শেলী শাহাবুদ্দিন (স্টোন মাউন্টেন, জর্জিয়া)	35, 51
মনসঙ্গীত ১, ২, ৩	অচিন্ত্য কুমার ঘোষ (হিউস্টন, টেক্সাস)	35, 48, 50
উন্মুক্ত আশ্চর্য	অমিত চক্রবর্তী (ম্যানহ্যাটন্, ক্যানসাস)	36
উপহার, আমার আমি	মিশা চক্রবর্তী (হিউস্টন, টেক্সাস)	36, 49
আরণ্যক, হরিণ গোলাপ বৃত্তান্ত ২	উদ্দালক ভরদ্বাজ (হিউস্টন, টেক্সাস)	37, 51
অমলতাস, মন পুড়ে	নমিতা রায়চৌধুরী (হিউস্টন, টেক্সাস)	37, 45
ইতিহাস না বর্তমান	বৈশাখী চক্কোত্তি (কলকাতা, ভারত)	38
কিছু এলোমেলো কথা	গৌতম তালুকদার (কলকাতা, ভারত)	39
অপেক্ষা, আমি আসব আবার	সফিক আহমেদ (হিউস্টন, টেক্সাস)	40, 50
রাতের রেলগাড়ি, কে রবে	শঙ্কর তালুকদার (কলকাতা, ভারত)	40, 45
বন্ধু মানে	জয়া ঘোষ (স্যাক্রামেন্টো, ক্যালিফোর্নিয়া)	41
যুদ্ধ শেষে ফিরছি ঘরে	রঙ্গনাথ (হিউস্টন, টেক্সাস)	41
কবিতার পাতা	কৃষ্ণা গুহ রায় (কলকাতা, ভারত)	42
আকাশ ভর্তি মেঘ	নার্গিস পারভিন (মুম্বাই, ভারত)	42
উৎসব	সুস্মিতা রায় (মুম্বাই, ভারত)	43
সুখ	গৌতম সমাজদার (কলকাতা,ভারত)	44
প্রাণের বাণী	কমলপ্রিয়া রায় (হিউস্টন, টেক্সাস)	44
ভুখ আর এক ভিখারি কবি	পিয়াংকী মুখার্জী (কলকাতা,ভারত)	46
সূর্যাস্তের শেষে	সৌমি জানা (বেলমিড, নিউ জার্সি)	47
আলোর সন্ধানে	সুব্রত ভট্টাচার্য (কলকাতা, ভারত)	48
বাইশে শ্রাবণ	অঞ্জনা দাস (কলকাতা, ভারত)	49

প্রবাস বন্ধু

শারদীয়া সংখ্যা

অশ্বিন ১৪২৮, অক্টোবর ২০২১

প্রকাশনায়: প্রবাস বন্ধু পাঠচক্র সভ্যবৃন্দ

প্রচ্ছদ চিত্র

অনুভব দাশগুপ্ত (বয়স ১৬)

সহযোগিতায়

চন্দ্রা দে

রূপছন্দা ঘোষ

ভজেন্দ্র বর্মন

অসিত কুমার সেন

আমাদের পত্রিকা

‘প্রবাস বন্ধু ওয়েবসাইট’-এ প্রকাশিত হ’ল

https://www.prabashbandhu.org/

সম্পাদনায়

মালবিকা চ্যাটার্জী

সুজয় দত্ত

সম্পাদকীয়

পরিস্থিতির পরিবর্তন আমাদের অনেক প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দেবার পর তার সব উত্তর যে মনমতো হয় তা অবশ্যই সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের অন্তর্নিহিত উপলব্ধির ভিত অবশ্যই ক্রমাগত দৃঢ় হওয়া সম্ভব। দুবছর ধরে আমরা যে কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে রয়েছি, সেই পরিবর্তিত জীবনের প্রতিক্রিয়া অনেকটাই অর্থবহ হয়ে উঠেছে । আমরা যথেষ্ট বিবেচনা করে জীবনের পদক্ষেপগুলো নিতে শিখছি। সবকিছুই সুষ্ঠু ও সুন্দর রাখতে গেলে প্রতিনিয়ত তার রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন আছে, এমনকি মানুষের সঙ্গে সম্পর্কও। আমার ধারণা ইদানীং আমাদের সকলেরই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন এসেছে। দুঃসময় আসে, চলেও যায়; চলার পথের ধারে ছড়িয়ে রেখে যায় অভিজ্ঞতার চিহ্ন।

আজকাল আমরা বৈশ্বিক উষ্ণতা (global warming) বিষয়টির আলোচনা হরদম শুনছি। কারণ এই বিষয়টিও আমাদের জীবনে নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করছে। আপাত দৃষ্টিতে আমরা হয়তো সবসময় সবটা দেখতে পাই না ঠিকই, কিন্তু চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া কিছু প্রমাণ অস্বীকার করি কী করে! দেখতে পাচ্ছি আইসবার্গ ক্রমশ লোপ পেতে বসেছে, ফলে সমুদ্রে জলের স্তর বাড়ছে। সমুদ্রের তাপমাত্রা বেড়ে ওঠায় সামুদ্রিক জীবদের জীবদ্দশা বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে; হারিকেন, সুনামি ইত্যাদি স্বাভাবিকের থেকে বেশি দেখা যাচ্ছে। বাতাসে আর্দ্রতা (humidity) বাড়ছে। পৃথিবীর বুকে শীতের থেকে গরমের স্থায়িত্ব বাড়ছে। ভীষণ ঠান্ডার জায়গাগুলো তেমন ঠান্ডা হচ্ছে না। প্রচন্ড গরমে জঙ্গলে আগুন লেগে যাচ্ছে।
আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের মানুষরা আশাকরি এই সমস্যা আয়ত্তে আনতে সফলকাম হবে। সুইডেনের কন্যা Greta Thunberg-কে তার ১৫ বছর বয়স থেকেই পৃথিবীর জলবায়ু নিয়ে সুচিন্তিত মতামত রাখতে দেখা গেছে। আবহাওয়া স্বাভাবিক করে তুলতে তার মতো আরো অনেকে এগিয়ে আসুক তাদের পরিকল্পিত চিন্তাভাবনা নিয়ে। এদিকে আমরা দেখছি দুর্গাপুজো এসে গেল অথচ তাপমাত্রা না কমার জন্য এখনও শরতের আকাশতলে শিউলি ফুলের দেখা মিলছে না। কিন্তু বাঙালির এই সার্বজনীন অনুষ্ঠান কোনভাবেই দমিত নয়। পূর্ণ উদ্যমে এগিয়ে চলে বাঙালির বার্ষিক পরিকল্পনা।

এই পত্রিকার প্রচ্ছদ চিত্রটি এঁকেছে অনুভব দাশগুপ্ত (বয়স ১৬)।
অনুভব হিউস্টনবাসী সোমা ও সন্দীপ দাশগুপ্তর সন্তান।
সমস্ত লেখক, লেখিকা, চিত্রশিল্পী এবং আমার সহকর্মীদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাই।
সবাইকে পূজা অভিনন্দন জানিয়ে –
মালবিকা চ্যাটার্জী

নব্য ভারতচর্যার উন্মেষ

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

ভাষান্তর: রন্তিদেব সরকার

প্রথমেই ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বলা যাক যে আমার এই উপস্থাপনা একেবারেই আনুসারিক-ধর্মী; জার্মানির হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাউথ এশিয়ান ইন্সটিটিউট্-এর Neure Sprachen and Literatures বিভাগে অর্থাৎ আধুনিক ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে অধ্যাপনার সময়ে অভিজ্ঞতালব্ধ ধ্যান ও ধারণার ভিত্তিতেই গড়া।

ব্যাপারটা শুনলে অদ্ভুত লাগবে যে এই বিশেষ বিভাগটির জন্মলগ্ন, যা পুরনো এক চাঁদোয়ার নিচে প্রাচীন ভারততত্ত্বের উৎসমুখ হতে উৎসারিত হয়েছিল একদিন; যে বিদ্যাটিকে আদৌ মৌলিক বলা যায় না বরং বেপথুমান বলা যেতে পারে । রক্ষণশীল ধ্রুপদীজনেরা যে বিদ্যাটিকে Fachrichtung – অর্থাৎ নিছক এক সহযোগীবিদ্যা বলে অভিহিত করেছিলেন; যা নাকি বিদ্যার মূল স্রোতে পরিগণিত হবার মতো নয় বলে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখেছিলেন, তা এখন আপন যোগ্যতায় মান্যতা পেতে শুরু করেছে। এতদসত্ত্বেও, আপন অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে এমন এক প্রতিকূল পটভূমি, যেখানে বিদ্বজন এবং পন্ডিত মহলের অবজ্ঞা এবং সদাজাগ্রত ভ্রূকুটি নিরন্তর সঞ্চরমান। সেখানে দাঁড়িয়ে আধুনিক ভাষা ও সাহিত্যের এই শাখা Neue Indologie-র ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিল এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যেই যার অবিসংবাদী প্রভাব তদানীন্তন পূর্বাঞ্চলীয় দেশগুলি (Eastern Block), যেমন পোল্যান্ড এবং চেকোস্লোভেকিয়ার উপর পড়েছিল।

এই নন্দিত সমাপতনের কারণ খুঁজতে বেশী দূরে যাবার প্রয়োজন নেই । একটা কারণ অবশ্যই যে ধ্রুপদী ভারততত্ত্ব বিষয়টি সর্বতোভাবে সংহত এমনকি এর মধ্যে একমেবদ্বিতীয়ম্ গোছের অন্তর্নিহিত একটা ভাব ছিল । এর অন্তর্গত ভারত-জার্মানি সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের যে জোয়ার হিটলারের জার্মানিকে প্লাবিত করেছিল, সেই প্রবাহে ১৩টি (তখনও সংখ্যাটির গায়ে ‘অপয়া’ তকমাটি আঁটেনি) সংস্কৃত-অধ্যাপকের পদ, তুমুল উদ্দীপনায় সৃষ্টি করা হয়েছিল। এমনকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর জার্মানিতে সংস্কৃত ভাষার প্রতি এই অন্ধ অনুরাগ দেশের এক সংস্কারে পর্যবসিত হয়েছিল, যা তখনও পর্যন্ত কথ্যভাষার মধ্যে গণ্য করা হতো না। তবুও ‘প্রাকৃত’ বা ‘পালি’ ভাষার থেকে কিছুটা হলেও বেশি গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল।

ক্রমবিকাশশীল ভারততত্ত্ব, যাই হোক না কেন, সে সময় যাবতীয় গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল বিভিন্ন ভারতীয় কথ্যভাষার উপর, বিশেষ করে ইন্দো-এরিয়ান এবং দ্রাবিড়, উভয় ভাষা-ভাষীদের উপর। এই প্রয়াসকে কমবেশী বহুধামুখী ছক বলে চিহ্নিত করা যায় । সরকারীভাবে তখনকার দিনে ১৫টি স্বীকৃত ভারতীয় ভাষা-ভাষীরা (এখন ২৪টি) নিজেদের মধ্যে চমৎকার এক যোগাযোগের সেতু তৈরী করতে সক্ষম হয়েছিল, যা প্রায় এক যৌথ মিলন-মেলার সঙ্গেই তুলনীয়; যা খ্রীষ্টীয় পার্বণ ‘Pentecost’-এর কথা মনে করিয়ে দেয়, যেখানে বহুদেশ থেকে আগত প্রবাসীদের সমাবেশে তারা আবিষ্কার করে যে তারা ভিনদেশের কথ্য ভাষা বুঝতে সক্ষম হচ্ছে।

একটি মিশ্র শব্দবন্ধন, হয়তো বা আধুনিক ভারততত্ত্বের অন্যতম মেরুরেখা, কেননা যে পঠনবিন্যাস আমরা অনুসরণ করতাম তার মূল উপজীব্য ছিল বিভিন্নতা এবং বহুবাচনিক। এভাবে শুধুমাত্র কোন একটি সাহিত্য বিশেষের নয়, পাশাপাশি অন্যান্য অনেক, যার প্রতিটি মূল থেকে বেজে উঠত নিখাদ ভারতীয়তার সম্মেলক সুর। এখানে ‘বিভিন্নতা’ বলতে সেই মান্ধাতার আমলের রূপরেখাটি নয়, যা শুধুমাত্র প্রকৃতি, তা থেকে বিভাজিত ভিন্নতর শ্রেণীবিন্যাস, তা থেকে মহাজাতি, প্রজাতি ইত্যাদি নয়, আমি সেই মারাত্মক অনুশাসিত বিন্যাসের কথা বলতে চাইছি । এক বৈচিত্রময় বিরোধাভাসের উপস্থিতি, যা আমি ভারতীয় সংস্কৃতিতে পেয়েছি । পক্ষান্তরে, এটা ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের অতীব সম্ভাবনাময় সৃজনশীলতা, যা তাকে কর্তৃত্বময়তা প্রদান করে। অন্য কোন ধর্মের পক্ষে কি কোনদিন তেত্রিশ কোটি দেবদেবীকে সৃষ্টি করা কল্পনাতেও স্থান পেয়েছে?

এই যে ছড়ানো বিশালত্ব, মহাবিশালত্বও বলা যায় – রক্তে সত্যিই এক নেশা ধরিয়ে দেয় এবং কোন পাশ্চাত্যবাসীর

কাছে তা হয়তো এক বিভ্রান্তিকর ব্যাপার। সবকিছুর মধ্যে সে চায় পরিপাটি; সাজানো টেবিল, চিহ্নিত এলাকা। মেরুকরণটাই মুখ্য সেখানে, মেলামেশাটা বাহ্য! পাশাপাশি ভারতীয় সংস্কৃতিতে ‘সীমানা’ বয়ে আনে তাকে অতিক্রম করার হাতছানি, কেননা আকার কখন হয়ে ওঠে নিরাকার, কখনও বা সাকার আবার কখনও তা মিলেমিশে একাকার হয়ে অন্য কোনো আকৃতিতে স্বপ্রকাশ, এক অনিশ্চিত লক্ষ্যের দিকে ছুটে যাওয়া, যা দেখে নীতিবাগীশরা তাকে অসম্ভব বলে সাব্যস্ত করতে চাইবে। কিন্তু তা বলে সৃজনশীলতা কি উচ্ছন্নে যাবে? তা হবার নয়, কেননা একে দৃঢ়হাতে ধারণ করেছে, এক সদাপ্রবাহী সাম্যাবস্থা, যেখানে সংস্কার এবং স্বকীয়তা একটি সূত্রে গ্রথিত হয়ে যাচ্ছে। যেখানে ঐতিহ্য এবং আধুনিকতা এক যুগলনৃত্যে সামিল হয়ে পড়ছে এবং নিরন্তর এক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শৈলী রচনা করেই চলেছে।

শুধুমাত্র হেগেলীয় দর্শনে সূত্র বা বিরোধাভাস নয়, তার থেকেও অনেক গভীর অধ্যাত্মবোধ নরনারীর জীবনে ক্রিয়াশীল রয়েছে। বিদ্বেষপ্রসূত মেরুকরণ প্রক্রিয়ায় পাশ্চাত্য সভ্যতার আরোপিত প্রাণশক্তি-নিংড়ানো যন্ত্রব্যবস্থা নয়; বরঞ্চ হৃদয়তন্ত্রীতে অর্কেস্ট্রার ঝঙ্কার তোলা সুরমূর্ছনা ছড়িয়ে বহুরূপী ঈশ্বরের বন্দনা। অধ্যাত্মরূপের বিভিন্ন প্রকাশের প্রতি কোন নিয়মনিষ্ঠ ছকের শৃঙ্খলা নয়, পক্ষান্তরে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্পণের অঙ্গীকার যেখানে পরস্পর গান ও ভাষণ, সংগীত ও গতিময়তা, দেহ ও পার্থিবতা এবং পৃথিবী ও আকাশ, বাতাস ও উপলখন্ড এবং মহাশূন্য খুঁজে ফেরে, প্রাণের অস্তিত্ব ঘোষণা করে, নিদারুণ আনন্দের উল্লাসে।

এমনতর তূরীয় আনন্দে আমার সতীর্থ বন্ধুরা মশগুল ছিলেন, যাঁরা রসদ সংগ্রহে ব্রতী হয়ে যোগাযোগ ঘটাতেন নিত্য এবং অনিত্য সাহিত্যের সঙ্গে। এমনকি তাঁরাও, যাঁরা লিখিত এবং অলিখিত সাহিত্য সামগ্রী সংগ্রহের দায়িত্বে ছিলেন। মৌখিক সাহিত্য (আপাতবিরোধী শব্দ হচ্ছে না তো?) বহুভাষাভাষী ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী পটভূমিতে এক বিশেষভাবে আবশ্যিক উপাদান – যে ভান্ডার থেকে এই উপমহাদেশের কত শত সৃজনশীল সাহিত্য রচনা এখনও আমাদের প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের যোগানদার। ভারতীয় উপমহাদেশের আর যাই হোক, অন্তর্মুখিতার অপবাদ নেই। উদ্দীপ্ত বাঙ্ময়তা, তা সে গপ্পোই হোক বা বাজারে দরাদরি, নিছক কেনাকাটা হোক বা আটপৌরে সুখদুঃখের পাঁচালি, বকবকানি বা আড্ডা – এ সবই এই উপমহাদেশের চালচিত্র। এই সজীব উর্বরশীলতার মধ্যেই ‘লিখিত’ সাহিত্যের জন্ম; তা হয়তো কোনো চূড়ান্ত বা নিখুঁত রূপরেখা নয়, কিন্তু আরও পাঁচটি বিকশিত ফুলের মধ্যে গণ্য করার মতো একটি তো নিশ্চয়ই। সে অর্থে এটা হয়তো ক্ষুদ্রাকার, কেননা লিখিত সাহিত্যের সুযোগ সুবিধে মুষ্টিমেয় লোকেদের নাগালেই ছিল তখন। সেসব উচ্চৈঃস্বরে পঠনের মাধ্যমে অথবা মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অঙ্কনের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হতো। সম্ভবত এখানেই, আশ্চর্যজনকভাবে, ইংরেজি ভাষায়, কৃত্রিম সুরভিযুক্ত ভারতীয় সাহিত্যের নমুনা মেলে। এসব অবশ্যই ভারতীয় সমাজের গভীর ব্যাপ্তি থেকে উৎসারিত আলো নয় বা সৌরভ নয়, কিন্তু সমাজের মূল স্রোতের সাধারণ শ্রেণীর দ্বারা লালিত অভিজ্ঞতালব্ধ নির্যাস বলা যেতে পারে। এটা বলা যেতে পারে, মার্কিন মুলুকে Indian Studies নামে যে বিষয়টি পড়ানো হয়ে থাকে, তা মূলত নিবিড় গবেষণার মাধ্যমে সংগৃহীত লোকায়ত জীবনের উপাদানগুলির উপর আধারিত। কিন্তু আসল উদ্দেশ্যগুলি তো পুঁথিগতই থেকে যাচ্ছে। তবে যাই হোক না কেন, হাইডেলবার্গ সাউথ এশিয়ান ইন্সটিটিউট্-এ আমরা কিন্তু আমাদের অধ্যাপনার সময় শুধুমাত্র মেধামনস্কতায় আচ্ছন্ন থাকতাম না। পক্ষান্তরে, যেটার উপর গুরুত্ব দিতাম তা হ’ল গিয়ে – সৃজনশীল মননের সঙ্গে আমাদের নিরন্তর দ্বৈরথ। তাদের মধ্যে অনেকেই দলবেঁধে এসে নৃত্যগীত পরিবেষণ করত এবং আমরা তৎক্ষণাৎ সেগুলিকে পরবর্তী অধ্যয়নের বিষয়বস্তুতে পরিণত করতাম।

হাইডেলবার্গে, আমরা বিচ্ছিন্ন কোন পুঁথিগত বিশেষত্বের উপর গুরুত্ব না দিয়ে বরং শিক্ষাদান-শিক্ষাগ্রহণের এই চিরায়ত প্রক্রিয়াটির সামগ্রিক অন্বেষায় জোর দিতাম। আমাদের কেন্দ্রিত অনুপ্রাণনা ভাষা-সাহিত্যমুখী নির্ভরতার দ্বারা আচ্ছন্ন থাকত, যার মূল ভাবধারাটি ছিল জৈবিকবৃত্তি দ্বারা চালিত মানুষের যুগপৎ ভাষা ও সাহিত্যের স্বরায়ণ। তাই আপনারা বিস্মিত হতেই পারেন যে আমি প্রায়ই প্রারম্ভিক স্তরে কাজ শুরু করতাম রবীন্দ্রনাথের ‘সহজ পাঠ’ দিয়ে। শিশুদের এই চমৎকার বইটি পড়ানো হতো তাঁর শান্তিনিকেতনের

আশ্রমিক বিদ্যালয়ে | বইটিতে 'বর্ণপরিচয়' ঘটানো হয়েছে 'বাগধারা'-র সাহায্যে, ছড়ার মাধ্যমে বা গদ্য দিয়ে যেখানে ছড়ার মেজাজটি রাখা হয়েছে | বিশ্বখ্যাত মনীষীরা, যেমন লোথার লুউৎসে বা নরিহিকো উচিদা – এঁরা ছোটদের পড়ার ক্লাসে গিয়ে নিজেরাই কখন শিশু হয়ে উঠতেন | আমার কাছে এ এক অমেয় প্রাপ্তি যেদিন দু-একটা ক্লাস নেবার পর লোথার আমার রুমে ঢুকে বললেন, "অলোকরঞ্জন, চলো আমরা দুজনে মিলে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কবিতার জার্মান-অনুবাদের একটা সংকলন বের করে ফেলি"| আর সত্যি সত্যিই এমন একটি বই প্রকাশিত হ'ল – 'GANGESDELTA' (১৯৭৪) নাম দিয়ে; যে সংকলনটিতে স্থান পেয়েছিল সমসাময়িক বাংলার তথা ভারতের নির্বাচিত কিছু কবিতাসহ বাংলাদেশের কবিতা | পরবর্তী সময়ে এটি জার্মানিতে একটি উচ্চতর সিলেবাসে পাঠ্যবই-এর মর্যাদা লাভ করেছিল এবং আমাদের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও অন্যত্র সবার জন্য এই বইটি অবশ্য-পাঠ্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল |

তুলনামূলক সাহিত্যের মূল নীতির উপর দাঁড়িয়ে আমাদের অন্যান্য ভাষা-ভাষী অনুষদবর্গের কাছে নির্ভরশীল হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না | বস্তুত কারো পক্ষেই সমস্ত ভারতীয় ভাষাগুলিতে দক্ষ হওয়া সম্ভব নয়, যার ফলে আমাদের ক্লাসগুলি একাধিক ভাষার অধ্যাপকে অধ্যুষিত হয়ে থাকত | যেমন ছোটগল্পের ক্লাসে অথবা উপন্যাস ক্লাসে দেখা যেতে লাগল, যুগ্মভাবে বাংলা-তামিল কিংবা মারাঠী-কন্নড় অথবা হিন্দী-উর্দু ক্লাসগুলি একযোগে চলছে | সেসব ক্ষেত্রে, যেসব ছাত্রছাত্রী এ ধরনের যুগ্মক্লাসে অভ্যস্ত হচ্ছে তাদের স্নাতকোত্তর বিভাগের পরীক্ষায় অথবা গবেষণার কাজে কমপক্ষে দু-দুটি সাহিত্যে / ভাষায় কাজ করার প্রবণতা এসে যেত | এই প্রবণতার ফলে এমন প্রণোদন তৈরী হয়েছিল যে একটি কর্মশালায় বাংলাভাষাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, যার পরিচালন ভার ছিল Institute of Sinology and Japanese Studies-এর হাতে | সেটা উৎসর্গীকৃত হয়েছিল ভারত, চিন ও জাপানের তিন আধুনিক লেখকের নামে |

যে ব্যাপারটা আমাদের কাছে গুরুত্ব পেত, তা ছিল – সমকালীন ভারতীয় লেখনের মাতৃভাষাশ্রিত লেখাপত্তরের গভীর অধ্যয়ন | একদিন পন্ডিত আইথাল, কন্নড় ভাষায় বিরচিত অনন্থমূর্থি-র গল্প-'সূর্যের ঘোড়া' আমাদের পড়ে শোনাচ্ছিলেন | সেখানেই তিনি আমাদের জানালেন –'কন্নড় ভাষা চার কোটি দক্ষিণ-ভারতীয়দের মাতৃভাষা; তথাপি শুধুমাত্র একটি অঞ্চলের অধিবাসীরাই এই ভাষা বোঝে | যতক্ষণ পর্যন্ত না কন্নড়-সাহিত্য ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হচ্ছে এবং তার থেকে অন্যান্য ভাষায়, ততক্ষণ সারা দুনিয়ার কাছে কন্নড় ভাষার দরজা বন্ধ; যদিও এই ভাষায় সাহিত্য হাজার বছরেরও বেশী পুরনো | এ প্রসঙ্গে আমাদের মারাঠী ভাষার বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক, সোনঠাইমার এই লেখকের উপর একটি জ্ঞাতব্য পাদটীকা সংযোজন করলেন – "অধ্যাপক অনন্থমূর্থি এক গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবার থেকে উঠে এসেছেন | হিন্দু জাতির মধ্যে কুলীনশ্রেষ্ঠ; যার অর্থ, এক নিবিড় সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের মধ্যে বেড়ে ওঠার এক নিশ্চিন্ত আশ্বাস | তাঁর লেখা বই 'সংস্কার'-ই তাঁকে প্রথম পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসে | তারপর তিনি আরো দুটি উপন্যাস, বহু ছোটগল্প এবং কবিতা, একটি নাটক এবং একাধিক সাহিত্য সমালোচনা রচনা করেন | একজন লেখক হিসেবে বারে বারে বর্তমানের প্রেক্ষিতে ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধের প্রাসঙ্গিকতা টেনে এনেছেন তিনি | পারস্পরিক বিরোধিতাপূর্ণ ঐতিহ্যের লড়াই তিনি নিজের জীবনযাত্রায় অনুভব করেছিলেন প্রায়শই | অধ্যাপক অনন্থমূর্থির মতে বেশ কিছু শতাব্দীর এই সহাবস্থানই সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের বিশেষত্ব | তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছেন এইভাবে – "আমার ঠাকুমা মধ্যযুগের, তার সঙ্গে তাঁর মূল্যবোধ ও স্মৃতিও | আমি সেদিক দিয়ে অনেকটাই আধুনিক | কিন্তু আমার শৈশব কেটেছে চসার-এর সমসাময়িক চতুর্দশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডে | আমার অভিজ্ঞতার ঝুলি সরাসরি 'ক্যানটারবেরি টেলস' থেকে টেনে বের করার মতোই | আমি প্রথম যখন তা পড়লাম, তাদের লেখককে আমার সমকালীন বলেই মনে হয়েছিল | ডিকেন্সও প্রায় আমার সমসাময়িক, কেননা ভারতবর্ষে তখন আমরা অনুরূপ সামাজিক অবিচার এবং শ্রমিক অসন্তোষের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি | শ্রীহীন শহরতলি – আরও সব কিছুই, যা দ্রুত শিল্পায়নের পায়ে পায়ে এসে পড়ে সেসব লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে উঠছিল | তথাপি পাশাপাশি চন্দ্রপৃষ্ঠে কী কী হচ্ছে তাও আমরা জানতে পারছিলাম | কয়েক শতাব্দীর এই যে সহাবস্থান, তা ভারতীয় সাহিত্যকে

ধনী করেছে। বিভিন্ন ভাষায় তা প্রকাশ পেয়েছে, বিশেষ কোন আগ্রহকে ঘিরেই।”

এহেন এক পটভূমিতে ঋদ্ধ হয়ে আমরা তাঁর মূল গল্প – সূর্যের ঘোড়া-র সহযোগী গল্পগুলি গভীর মনযোগ নিয়ে শুনতে শুরু করলাম এবং সে সময় আমাদের অনুভূতি হচ্ছিল, যেন কোন মন্ত্র মন্দ্রিত হচ্ছে। আমরা আবিষ্কার করলাম, বস্তুতপক্ষে কোন ব্যাখ্যা ছাড়াই, লেখক অনন্তমূর্তি তাঁর লেখার মধ্যে তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধু ‘অনন্ত’কে সবরকম সামাজিক সংস্কার এবং প্রথার জাল থেকে মুক্ত করতে চাইছেন। ভারতীয় ব্যাপার-স্যাপারও রয়েছে এর মধ্যে। এক প্রতীকী জঙ্গল, যা সমগ্র মানবসত্তার স্মৃতিভান্ডার হিসেবে প্রতীয়মান করতে চেয়েছেন –

“অনন্ত, অনন্ত, এখন তুমি জঙ্গলে প্রবেশ করেছ। জঙ্গলে প্রবেশ, জঙ্গলে প্রবেশ... বৃক্ষ, বৃক্ষ, বৃক্ষ... বৃক্ষের মাঝখানে ... একটি টিয়ে। সবুজ টিয়ে... পাতার আড়ালে এক সবুজ, সবুজ টিয়ে... এক সবুজ টিয়ের বাঁকানো ঠোঁট, বাঁকানো ঠোঁটে একটি লাল ফল, লাল, লাল ফল...”

আমি এখানে একটি তাৎপর্যপূর্ণ স্মৃতি রোমন্থন করছি যেখানে আন্তঃআঞ্চলিক অথবা আন্তর্বিষয়ক ভাষার শিক্ষাদান নিয়মিতভাবে করে থাকে Department of Modern Languages & Literatures, যেখানে সমস্ত ছাত্রছাত্রী, সমস্ত ভাষার অনুষদবর্গ, অতিথি অধ্যাপক এবং মানববিদ্যা, ধর্মতত্ত্ববিদ্যা, শিল্প-ইতিহাস বিভাগের অংশগ্রহণকারীরা – সবাই এই বন্ধুত্বপূর্ণ বিতর্কে যোগদান করেছেন এক বিশেষ মহৎ অনুসন্ধিৎসায় অংশীদার হতে, যৌথভাবে।

আমি এখনও এখানে দাঁড়িয়ে, চিরশিক্ষার্থী এক শিক্ষকের ভূমিকায় এমন একটি সৃজনমুখী অ্যাকাডেমিক তথা নান্দনিক ঐতিহ্যের শরিক, যাকে আমি গ্রহণযোগ্য শিক্ষায়তনের কাঠামো হিসেবেই দেখতে ভালবাসি; যা শুষ্ক, প্রথাজীর্ণ বিদ্যার্জনের বালাই থেকে মুক্ত।

****

১৭ই মার্চ, ২০০৮ সালে কলকাতার ‘ম্যাক্স মূলার ভবন’-এ শ্রী অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত প্রদত্ত উপরোক্ত ভাষণটি ইংরেজিতে ছিল। জার্মানির হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘ভারততত্ত্ব’ ছিল তাঁর অধ্যাপনার বিষয়।

সেই বিষয়টি বাস্তবজমির উপর অগ্রসৃতি ঘটেছে। নবায়ন ঘটেছে। তার উপর এই কথন।

সেই বক্তৃতার বাংলা ভাষান্তর – রন্তিদেব সরকার।

{স্বর্গীয় শ্রী ৺অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত-র ইংরেজি বক্তৃতার ভাষান্তরিত নিবন্ধটি শ্রী রন্তিদেব সরকার-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।}

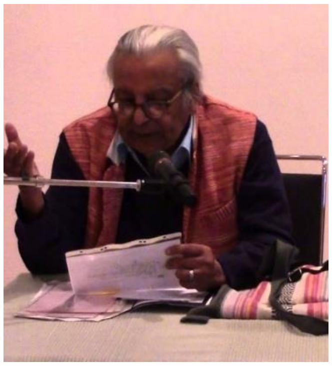

ইতিবাচক ভাবনার গুরুত্ব

মৃণাল চৌধুরী

ইতিবাচক অর্থাৎ সদর্থক চিন্তা এমন একটি মানসিক অবস্থা সৃষ্টি করে যা মানুষের জীবন সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দিতে সক্ষম হয় | কারুর জীবনই শান্ত সমুদ্রের মতো সচ্ছলভাবে অতিবাহিত হয় না | উত্থান পতন জীবনের অঙ্গ, এটাই গূঢ় সত্য, এটাই ভবিতব্য | তাই বেশিরভাগ মানুষের প্রশ্ন হ'ল তাহলে জীবনে ইতিবাচক ভাবনার ভূমিকা কোথায়? দ্ব্যর্থ ভাবনা মাথায় ঢুকিয়ে কী ফল পাব? এ তো অলীক, শুধুই সময় নষ্ট!

গবেষণায় দেখা গেছে, ইতিবাচক ভাবনার একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে | সত্যি কথা বলতে কি, পৃথিবীটাকে কোন একজন বদলাতে পারে না, এটা সত্য | কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোনো কিছু সম্বন্ধে অবহিত হতে বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান আহরণ করতে অথবা উপলব্ধি ও ধারণা করতে তো অবশ্যই পারে | একজন তার নিজের এবং অন্য মানুষের সম্বন্ধে যা ভাবে, তারই ফল তার নিজের ভাবনা-চিন্তার ওপর প্রভাব বিস্তার করে |

ইতিবাচক ভাবনার গুরুত্ব বা প্রভাব বুঝতে হলে সবথেকে ভাল আর ফলপ্রসূ উপায় হ'ল প্রথমেই বিষয়টির নেতিবাচক দিকটা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা | বেশিরভাগ নেতিবাচক আবেগ, যেমন ভয় অথবা রাগ উন্মোচিত হয় অস্তিত্ব বোধ থেকে | এই নেতিবাচক আবেগগুলোই তাৎক্ষণিক কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয় |

নেতিবাচক ভাবনাচিন্তা আসলে একটা স্বভাব, যা ইচ্ছে বা অভ্যাসের ফলে সহজেই মন থেকে সরিয়ে দেওয়া যায় | নেতিবাচক চিন্তা-ভাবনা একরকম মানসিক চাপজনিত রোগ, যার ফলে আসে বিষণ্ণতা, হতোদ্যম আর মনমরা ভাব | অথচ এর থেকে সহজেই মুক্ত হওয়া যায় | তার জন্য দরকার কেবল মানসিক প্রস্তুতি এবং মনের জোর |

ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী শারীরিকভাবে ক্যান্সার সারাতে না পারলেও, মানসিকভাবে একজনের জীবন অবশ্যই সহজ করে দিতে পারে, মানসিক চাপজনিত রোগ থেকে মুক্ত করতে পারে, যার জন্য শারীরিক শক্তির ভান্ডার বর্ধিত হয় |

সদর্থক অর্থাৎ ইতিবাচক ভাবনা জীবনে চলার পথ অনেক সহজ আর উপভোগ্য করার ক্ষমতা রাখে | আমরা কী খাব, কী ধরনের পোশাক পরব, কী ঘটনায় কেমন প্রতিক্রিয়া করব এসবই নির্ভর করে আমাদের অন্তর্নিহিত ভাবনা-চিন্তার ওপর | তাই এই ভাবনা-চিন্তাগুলি যদি ইতিবাচক হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই জীবনযাত্রা সহজ হয়ে উঠবে | আর যদি নেতিবাচক ভাবনা-চিন্তা মাথায় বাসা বাঁধে তাহলে স্বাভাবিকভাবেই জীবনযাত্রা জটিল এবং বিষময় হয়ে ওঠে |

সমীক্ষায় দেখা গেছে নেতিবাচক মানুষ হতাশায় ভোগে | যার ফলে সংযম হারায়, জীবনযাত্রায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, অল্প অথবা বেশি ঘুমের কবলে পড়ে | অন্যরা তার সম্বন্ধে কী ভাবছে সেই বোধশক্তিও হারিয়ে ফেলে | অসম্ভব আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে |

অপর দিকে জীবনে যতই ঝড়ঝাপটা আসুক না কেন, ইতিবাচক মানুষরা ভাবে তা সত্ত্বেও জীবনে হাজার একটি ভাল জিনিস আছে, যা নিয়ে ভালভাবে জীবন কাটানো যায় | তাই ভাল থাকো, ভাল খাও, ভাল ঘুমোও, ভাল পোশাক পরো, ভাল কথা বলো, ভাল ভাবনা-চিন্তা করো এবং জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আনন্দ উপভোগ করো |

সদর্থক ভাবনার গুণাগুণ –

শারীরিক উন্নতি:

এটা নিশ্চিত এবং বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত যে শরীর আর মনের মধ্যে একটা সংযোগ আছে | মন স্থির থাকলে শরীর ভাল থাকে | আর মন অস্থির হলে শরীরের ওপর তার প্রতিক্রিয়া শুরু হয় | ইদানীং পৃথিবী জুড়ে প্রতিনিয়ত এই সত্যকে অস্বীকার করার প্রবণতা চলেছে | তাই দুনিয়ায় শুধু খারাপ খবরগুলো প্রকট হয়ে ওঠে | আমাদের মন এই নেতিবাচক প্রচারের মাধ্যমে ভয় ভাবনা আর হতাশায় জর্জরিত হয়ে রয়েছে; যার ফলে মানসিকভাবে আমরা দুর্বল হয়ে পড়ছি | আর এই মানসিক দুর্বলতার কারণে শারীরিক প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় | একমাত্র ইতিবাচক মনোভাব এই প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে | তাই করোনা ভাইরাসের মতো পৃথিবীতে যখনই নেতিবাচক অবস্থার উপস্থাপন হবে, তখন প্রত্যেকের উচিত মানসিক চাকার হাল ধরে সদর্থক পথের

দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া।

মানসিক চাপের হ্রাস:

ইতিবাচক চিন্তা থেকে উৎপত্তি হয় ইতিবাচক মানসিকতা এবং এই মানসিকতাই একজনের মানসিক চাপ এবং পীড়া রহিত করতে সাহায্য করে। এর কারণ আমাদের মন, যা আমাদের চেতনার আধার আর আমাদের শরীর একই সূত্রে বাঁধা। তাই যখন আমাদের চিন্তা-ভাবনাগুলো ভাল আর মধুর হয়, তখন আমাদের শরীর থাকে অনেক সতেজ এবং অহেতুক উত্তেজনাহীন।

কিন্তু যখন নেতিবাচক ভাবনা মনের মধ্যে বাসা বাঁধে তারা সঙ্গে নিয়ে আসে মানসিক চাপ। যার ফলে শরীরের মধ্যে এক রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। এর কারণ – আমাদের ভাবনা-চিন্তা আমাদের স্নায়ুতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করে। আর এই রাসায়নিক প্রক্রিয়া শরীরের সব অঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করে স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে।

নেতিবাচক ভাবনা-চিন্তা আমাদের শরীরে অবস্থিত তিনটি রাসায়নিক পদার্থের (dopamine, epinephrine এবং norepinephrine) পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। এই তিনটি পদার্থের পরিমাণের সাথে সরাসরি মানসিক চাপের সংযোগ আছে, যা ধরা পড়ে রক্তচাপ নির্ধারণ যন্ত্রের সাহায্যে। রক্তচাপ বেশি মানে শরীরে ঐ তিনটি রাসায়নিক পদার্থের পরিমাণ স্বাভাবিকের থেকে বেশি। যেটা সাধারণত ঘটে দুশ্চিন্তা বা মানসিক অস্বস্তি আর অশান্তি থেকে।

রক্তচাপ কমাবার নানাবিধ ওষুধ আছে; তবে মনে রাখতে হবে প্রত্যেক ওষুধের কিছু না কিছু নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া আছে। সেই অর্থে সবচেয়ে ভাল উপায় ধ্যান অর্থাৎ মেডিটেশনের মাধ্যমে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করা।

ইতিবাচক ভাবনা ও সৃজনশীলতা:

ইতিবাচক চিন্তা উদ্বুদ্ধ করে "আমি করতে পারি" চেতনাকে। মন এবং শরীর সুস্থ, সবল আর আনন্দে থাকলে সুনিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনার মাধ্যমে সবকিছু সহজভাবে সমাধান করা যায়। নেতিবাচক আবেগ বা মানসিক আলোড়ন আমাদের কার্য-ক্ষমতাকে সরাসরি প্রভাবিত করে গুরুতর ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।

পক্ষান্তরে ইতিবাচক ভাবনা শরীর আর মনের উন্নতি সাধন করে নিপুণতা বর্ধন করে।

ইতিবাচক ভাবনার প্রসার:

এটা সত্যি যে যতই বাধাবিপত্তি আসুক না কেন, জীবনে সাফল্য লাভ করতে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করে একাগ্রতা আর এগিয়ে যাবার প্রবণতা – পড়ে গেলেও উঠে দাঁড়াবার প্রচেষ্টা।

টমাস এডিসন ইতিবাচক প্রবক্তার এক মহান উদাহরণ। একই গবেষণায় ৯৯৯বার অকৃতকার্য হয়েও ১০০০তম প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ করে ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন তিনি। আজও তা দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রচলিত আছে।

তাই আমাদের মনে যদি কখনও নেতিবাচক ভাবনা আসে, তা মন থেকে দূর করার উপায় হ'ল আলোর বাল্বের দিকে তাকিয়ে টমাস এডিসনকে স্মরণ করা।

ইতিবাচক ভাবনা ও শারীরিক সৌন্দর্য:

নানা পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে মানসিক চাপ বার্ধক্যের দিকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যায়।

অপরপক্ষে ইতিবাচক ভাবনা-চিন্তা, স্মৃতি, মেধা আর কল্পনাশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। যার ফলে মানসিক এবং শারীরিক সৌন্দর্য বর্ধিত হয়।

দেখা গেছে যে মানসিক চাঞ্চল্য জীবকোষে সৃষ্ট প্রোটিন জাতীয় জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সংগঠনে এক জ্বালাময়ী পদার্থ উদ্ভাবনে সাহায্য করে, তাতে সহজেই চামড়ায় ভাঁজ, শিথিলতা এবং বার্ধক্যজনিত ছাপ পড়ে।

অপরপক্ষে ইতিবাচক ভাবনা-চিন্তা মানসিক সুস্থতার সঙ্গে সঙ্গে সেই জ্বালাময়ী পদার্থ উদ্ভাবন বন্ধ করে; endorphins এবং neurotransmitters নামক দুটি রাসায়নিক পদার্থ উদ্ভাবন করে, যা চামড়াকে প্রশস্ত করে শরীরের রক্ত চলাচলে সাহায্য করে।

আকর্ষণী শক্তি:

এটা অবশ্যই সত্যি – ইতিবাচক চিন্তাসম্পন্ন মানুষকে স্বভাতই সকলে পছন্দ করে, কারণ সদর্থক লোকেরা অন্যদের কাছে আশা এবং ভরসার পাত্র।

ইতিবাচক ভাবনা মানুষকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তোলে, এবং তারা সকলের ভালবাসা অর্জন করে।

ধৈয্য ও সহনশীলতা:

ধৈয্য ও সহনশীলতা এমন একটি ক্ষমতা যা জীবন পথের চড়াই, উৎরাই, অপ্রিয় এবং অপ্রীতিকর অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে সাহায্য করে। ইতিবাচক চিন্তাশীল মানুষরাই সদর্থক ভাবনার গুরুত্ব বুঝতে পারে এবং অপ্রীতিকর অবস্থা সামলাতে সক্ষম হয়।

আত্মনির্ভরতা:

একজনের চিন্তাভাবনার সাথে তার উপস্থাপনা, দৃষ্টিভঙ্গি, আত্মপ্রত্যয়, আস্থা, মনোভাব ইত্যাদির এক নিগূঢ় যোগসূত্র আছে। নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি আর চিন্তা প্রধানত নিয়ে আসে খারাপ আর অপ্রিয় বিষয়; যেমন – কোন কিছুই কাজ করছে না, মানুষজন কেমন নিষ্ঠুর ইত্যাদি। এরূপ মনোভাবের জন্য উৎপন্ন হয় আতঙ্ক, বিষণ্নতা, আত্মহত্যার প্রবণতা। নেতিবাচক চিন্তা এতটাই ক্ষতিকারক।

ইতিবাচক ভাবনা-চিন্তার ফল হয় সম্পূর্ণ বিপরীত। সকলের শ্রদ্ধা ভালবাসা পাওয়ার জন্য নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস বাড়ে। জীবনের পথ সুগম হয়। বিপদের মুখেও আত্মবিশ্বাস দৃঢ় থাকে, নেতিবাচক ভাবনাকে জয় করার ক্ষমতা থাকে। এটা তখনই সম্ভব যখন একজন সম্পূর্ণভাবে আত্মবিশ্বাস অর্জন করে।

হৃদপিন্ড সংক্রান্ত স্বাস্থ্যের উন্নতি:

ব্রিটেনে সম্প্রতি হৃদপিন্ড সংক্রান্ত সমীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে ইতিবাচক এবং সর্বদা আনন্দময় মানুষ ৩০ শতাংশ কম হৃদরোগ সংক্রান্ত রোগের শিকার হয়।

নেতিবাচক ভাবনা-চিন্তা হর্মোনের ভারসাম্য হারিয়ে মানসিক চাপ সৃষ্টি করে। ফলে আক্রান্ত হয় হৃদরোগ এবং উচ্চ রক্তচাপ জনিত রোগে।

ইতিবাচক চিন্তাভাবনা শরীর এবং মনকে প্রতিকূল অবস্থাতেও স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে সাহায্য করে। তার জন্য হৃদযন্ত্র দীর্ঘকাল স্বাভাবিক এবং সুস্থ থাকে।

রোগমুক্তি:

গভীরভাবে চিন্তা করলে নিশ্চিত উপলব্ধি করা যায় যে ইতিবাচক ভাবনা-চিন্তা সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনীশক্তি আনতে সাহায্য করে। আর এই জীবনী-শক্তিই শরীরের যে কোন অসঙ্গতিপূর্ণ কার্যকলাপ থেকে রক্ষা করে। এক কথায় বলা যায় ভাল চিন্তা-ভাবনা শরীরকে রোগমুক্ত করতে সাহায্য করে। Carnegie Mellon ইউনিভার্সিটির প্রফেসর Dr. Sheldon Cohen গবেষণায় দেখিয়েছেন “When under stress, cells of the immune system are unable to respond to hormonal control and produce levels of inflammation that produce disease.”

গঠনমূলক কার্যকলাপ:

একজনের চিন্তাভাবনার ধারা অবশ্যই তার কথা বলার ধারায় প্রভাব ফেলে। তাই ইতিবাচক ব্যক্তি নেতিবাচক কথাবার্তা পরিহার করে ইতিবাচক কথাবার্তা বলবে এটাই স্বাভাবিক। আর সে কথা হবে অবশ্যই সুখের কথা এবং নানান সুযোগ সুবিধার কথা। লোকজন তাতে আকৃষ্ট হয়ে তার কথা শুনতে আগ্রহী হবে।

সাফল্য লাভ:

আকস্মিক বা দৈব ঘটনায় কেউ সাফল্য লাভ করতে পারে না; ঘটনাচক্রে তা ঘটলেও সাধারণত সেটা স্থায়ী হয় না। একাগ্রতা আর বাস্তববাদী মানুষরা জীবনে সাফল্য লাভ করে। সদর্থক মানসিকতা একজনের বর্তমান ভাবমূর্তি প্রকাশ করে এবং ভবিষ্যতে কী হতে চলেছে তা প্রতিফলিত করে।

যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস এবং আত্মপ্রত্যয় ছাড়া সাফল্য সম্ভব নয়।

ইতিবাচক অনুভূতি:

জীবনে উত্থান, পতন, বিপর্যয় ইত্যাদি থাকবেই। এটাই জীবনের নিয়ম। কেবল ইতিবাচক মনোভাব আর মানসিকতাই এই উত্থান পতনের দিক নির্ণয় করতে পারে।

ইতিবাচক ভাবনার প্রভাব:

ইতিবাচক ব্যক্তিত্বরাই আদর্শ নেতা হতে পারে। আদর্শ নেতা বলতে তাকেই বোঝায় যে অন্যের ভাল দিকটা বুঝতে পেরে তাকে ঠিকভাবে চালিত করে। কোন বড় কাজই একার দ্বারা সম্ভব হয় না; সমষ্টিগত প্রচেষ্টা তার একমাত্র উপায়। তাই এমন মানুষের দরকার যে অন্যকে উৎসাহিত এবং উজ্জীবিত করতে পারে।

নেতিবাচক ক্ষতি:

নেতিবাচক ভাবনা অত্যন্ত ক্ষতিকারক। সেটা যে কোন উদ্যম,

উৎসাহ এবং প্রবণতাকে নষ্ট করে ফেলতে পারে | সবসময় মনে করা উচিত, আজকে যেটা অসম্ভব মনে হচ্ছে, কালের গতিতে কাল হয়তো সেটা সম্ভব | তাই কোন উদ্যমকেই ছোট করে দেখা ঠিক নয় | আজকের অবাস্তব, অপার্থিব বা খেপামো আগামীকাল বাস্তবে পরিণত হয়ে মানুষের উপকারে লাগতে পারে | এরকম অনেক উদাহরণ আছে | প্লেন আবিষ্কারের আগে ধারণা ছিল, উড়তে গেলে পাখা লাগবে | সেই পরিপ্রেক্ষিতে রেনেসাঁস সময়কালে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি যখন ornithopter- এর নকশা করেছিলেন, সেসময় তিনি নিদারুণ নিন্দার কারণ হয়ে উঠেছিলেন, এই ভেবে যে পাখা (wings) ভগবানের সৃষ্টি এবং যা একমাত্র তাঁরই অধিকারে | পরবর্তীকালে ১৯০৩ সালে Wright ব্রাদার্স প্রথম এরোপ্লেন বাস্তবে আনেন | তার পেছনে ছিল দুজন Wright ব্রাদার্স-এর সদর্থক নিষ্ঠা, যা দূর করেছিল ওই ভ্রান্ত ধারণা |

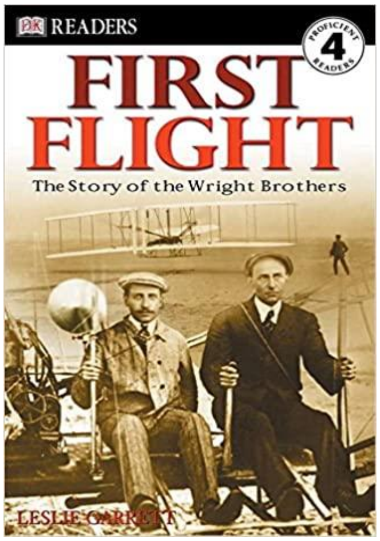

সম্পর্ক পালন:

পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক সামাজিক জীবনের এক বিশেষ অঙ্গ | আত্মীয়,বন্ধু অথবা সহকর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক এক অতি প্রয়োজনীয় বিষয় | সমীক্ষায় দেখা গেছে “আমি পারব” মনোবৃত্তি নিয়ে যারা জীবন যাপন করে তারাই নিজেদের এবং আপনজনদের বিষয়ে একইভাবে ভাবনা-চিন্তা করে | সেই অর্থে ইতিবাচক মানুষরাই সম্পর্ক সযত্নে পালন করতে সক্ষম হয় |

বাস্তবতা:

আগে থেকে রাস্তা না জানা থাকলে সাধারণত গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে দেরী হয় | কিন্তু নিশানা ঠিক করে পথের কিছু দিকচিহ্ন চিহ্নিত করে রাখলে গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো সহজ হয় | জীবনে চলার পথও ওই একই নিয়মের অন্তর্ভুক্ত |

মানসিক প্রখরতা:

মানসিক প্রখরতার সঙ্গে উৎসাহ ও উদ্দীপনার এক অকৃত্রিম সম্পর্ক আছে | সাধারণত মানসিক প্রখরতাসম্পন্ন মানুষরাই সমস্যা, জটিলতা আর সংকট মোচনে অগ্রগামী হয়; অনিশ্চিত বিপজ্জনক অবস্থার সম্মুখীন হয়েও সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসে |

অপরপক্ষে নেতিবাচক ধারণা সম্পন্ন মানুষ অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিহীনতায় ভোগে | সবকিছুর মধ্যে অবিশ্বাস, বিষাদ, অস্পষ্টতা এবং বিষণ্ণভাব প্রকাশ করে | মনটা তাই সর্বদা বিষণ্ণ এবং বেদনার্ত হয়ে থাকে | মনের প্রসারতার সংকোচন ঘটে | ফলে স্বার্থপরতার কবলে নিষ্পেষিত হয় |

তাই আমাদের প্রয়োজন একটি সদর্থক ভাবনাসম্পন্ন মনোবৃত্তি গঠন করা এবং সবকিছুর মধ্যে একটি স্থিতি উপস্থাপন করা |

গবেষণায় দেখা গেছে নীচের তিনটি অভ্যাস ইতিবাচক ভাবনার শক্তিকে বাড়াতে সাহায্য করে –

১. ধ্যান বা তন্ময়তা (Meditation):

প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হয়েছে যারা নিয়মিত ধ্যান করে তারা অনেক বেশি ইতিবাচক ভাবনার অধিকারী হয় | তারা সব ব্যাপারেই সচেতন এবং যত্নশীল; সব বিষয়ে সজাগ এবং সদর্থক ভাবনার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে |

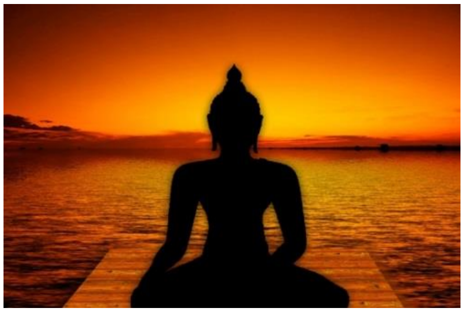

২. লেখালেখি:

যারা লেখালেখি করতে ভালবাসে তারা নিজের বাঁধাধরা বিষয়ের বাইরে দ্ব্যর্থ ভাবনার গুরুত্বও বুঝতে পারে | তাতে তারা শারীরিক এবং মানসিকভাবে অনেকটাই শক্তি সঞ্চয় করে |

৩. খেলা/আনন্দ/খুশি থাকা:

আনন্দে থাকা মানুষরা শুধু যে নিজেরাই আনন্দে থাকে তা নয়, তারা অন্যদেরও আনন্দে আর খুশিতে রাখতে সাহায্য

করে এবং সুন্দর এক পরিবেশ তৈরি করে, যার উপকারিতা অসীম এবং অন্তহীন। সাফল্য যেমন আনন্দ এনে দেয় তেমনি আনন্দও অন্তিমে সাফল্য আনতে সাহায্য করে। পার্থিব সাহায্যের থেকেও কাউকে ইতিবাচক মানসিকতা অর্জনে সাহায্য করলে তার ফল অনেক ভাল হয়, যা একজনকে আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য –

হিউস্টন বাঙালি সমাজের এক প্রবীণ সদস্য শ্রী গঙ্গানারায়ণ ঘোষের সঙ্গে কথা বলার সময় এই বিষয়ে কিছু লেখার কথা মাথায় আসে। আমরা অনেকেই ওঁকে “গঙ্গাদা” বলে সম্বোধন করি। বর্তমানে তাঁর বিরানব্বইয়ের উর্ধ্বে বয়স, কিন্তু এখনও সর্বদা কর্মরত এবং তৎপর। উনি ২০০১ সালে হিউস্টনে “March Together” নামে একটি দারিদ্র সেবামূলক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন, যা আজও চালু অছে। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে গঙ্গাদা অবসর গ্রহণ করেছেন, তবে নিয়মিত কাজকর্ম থেকে

নিজেকে বিরত রাখতে পারেননি। ইতিবাচক ভাবনাচিন্তার উনি একজন জাজ্জ্বল্যমান নিদর্শন। গত কয়েক বছর ধরে আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর দূষণমুক্ত করার উদ্দেশ্যে নানাবিধ ভাবনা-চিন্তা, নকশা আর পদ্ধতির ওপর কাজকর্ম করে চলেছেন তিনি।

অজানা দেশ

অলোক কুমার চক্রবর্তী

তখন আমি কলেজে। এক চরম অশান্তির ১৯৭১। নকশাল আন্দোলন দমন, চোরাগোপ্তা খুনজখম, তুমুল রাজনৈতিক অস্থিরতা, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ – বিশাল ডামাডোল চারিদিকে। ভীষণ অনিশ্চিত পরিবেশ। তার মধ্যেই সময় পেরিয়ে অনেক দেরিতে হওয়া হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষা পাশ করেছি সদ্য। ব্যারাকপুরে গঙ্গার ধারে মিলিটারি ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে ব্রিটিশ আমলের বিরাট বাড়ি, বাগান নিয়ে কলেজ। ক্যান্টনমেন্টেই আশেপাশে খালি পড়ে থাকা অন্যান্য মিলিটারি বাংলোগুলোর বাগানে দেখি শুধু গেঞ্জি বা শার্ট আর পাজামা বা প্রায় ছেঁড়া ট্রাউজার্সপরা প্রচুর তরুণ বয়সী ছেলে। তারা ভারতীয় সামরিক অফিসারদের কাছে মিলিটারি শৃঙ্খলা ও লড়াইয়ের নানা কলাকৌশলের, রাইফেল চালানোর ট্রেনিং নিচ্ছে। ক'দিন পরেই ওরা চলে গিয়ে নতুন দল আসছে। তারা শিখছে, চলে যাচ্ছে। ওরা ‘মুক্তিযোদ্ধা’। এদের আর ভারতীয় সামরিক বাহিনীর যৌথ লড়াইয়ে নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র “বাংলাদেশ” জন্ম নিল ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১।

এদিকে আমাদের পাড়ায় ও চেনাজানা অনেকের বাড়িতেই ওপার বাংলা থেকে প্রচুর আত্মীয়স্বজন প্রাণ ও মর্যাদা বাঁচাতে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছেন কিছুদিন আগে থেকেই। এখানে যাঁরা অনেক আগে থেকে আছেন, সকলেই একসময় উদ্বাস্তু হয়ে এসে কঠিন সংগ্রাম করে নিজের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এখন হঠাৎ এই প্রায় সম্পর্ক-ছিন্ন আত্মীয়রা বিপুল সংখ্যক সদস্য নিয়ে অনির্দিষ্ট কালের জন্য হাজির হওয়ায় সবাই অল্পবিস্তর বিব্রত। প্রথম প্রথম কিছুদিন সুন্দর সদ্ভাবে, পুরনো আত্মীয়সঙ্গ পাওয়ার স্বাভাবিক আনন্দে কেটেছে। কিন্তু কিছুদিন পরই নানা বিরোধ, অস্বস্তি দেখা দিতে লাগল। আর্থিক কারণ তো বটেই, পুরনো তিক্ততাও স্মৃতিতে এসেছে। হয়তো বড় দাদা-বৌদি বা কাকা-জ্যাঠাদের দুর্ব্যবহারে ছোটবেলায় বাধ্য হয়ে ওপারের বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে এসে এখানে অমানুষিক সংগ্রামে নিজের ভাগ্য গড়ে নিতে হয়েছে, স্বস্তির সংসার পেতে কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেছে।

এখন সেই দাদা বা কাকা এখানে আশ্রয় নিলে চাপা থাকা অভিমান এক সময়ে প্রকট হতেই পারে। বিশেষ করে, বাড়ির পুরুষ মানুষটির হয়তো শৈশব-কৈশোরের স্মৃতিমেদুরতা, সেন্টিমেন্ট কিছুটা কাজ করছে, কিন্তু বাড়ির গৃহিণীর মনে তো এই আবেদনের কোনো দাগ নেই! তিনি তো এঁদের দেখেননি! বরং এঁদের সম্পর্কে বিরূপ কথাই শুনেছেন। এখন তাঁকে বাধ্য হয়ে এতজনের জন্য একটানা অনেকদিন ধরে বাড়তি কাজ করতে হচ্ছে। এটা ক্রমে বিরক্তি-উৎপাদক হয়ে দাঁড়াচ্ছিল স্বাভাবিকভাবেই। এমন অনেক দেখতে পাচ্ছিলাম। অথচ, দেশ স্বাধীন হলেও তখনও কুখ্যাত রাজাকার বাহিনীর জঘন্য নিষ্ঠুর অত্যাচার চোরাগোপ্তা চলছিলই। বুদ্ধিজীবী আর মহিলাদের জন্য বিপদ ছিল সবচেয়ে বেশি। প্রচুর শিল্পী, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিকের খুন হয়ে যাওয়ার খবর পাওয়া যাচ্ছিল। কাজেই এঁরাও ফিরে যাওয়ার সাহস করতে পারছিলেন না।

আমাদের বাড়িতে ভাড়া থাকতেন নীলুদা। ভীষণ বাস্তববাদী, সংগ্রামী মানুষ। ওঁর চেয়ে বয়সে অনেক বড় বৈমাত্রেয় দাদা আর বৌদির অত্যাচারে অল্পবয়সে বিতাড়িত হয়ে এখানে চলে আসতে হয়েছিল তাঁকে। তারপর কঠিন লড়াই, মাঝে মাঝেই উপবাস ইত্যাদি পার করে জীবনে থিতু হয়েছেন। রূপকথার মতো এসব গল্প শুনতাম নীলুদার কাছে। তাঁরই কাছে সেই দাদা-বৌদি তিন যুবতী মেয়ে নিয়ে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। প্রথম প্রথম সব ঠিকঠাক থাকলেও পরের দিকে মাঝে মধ্যে বিরক্ত নীলুদার বাক্যবাণে তাঁর দাদা অনিলদাকে মাথা নীচু করে নিশ্চুপ বসে থাকতে দেখতাম। আমি দুজনের দিকটাই অনুভব করতাম। একজনের বিপুল অভিমান, আরেকজনের নীরব অনুশোচনা।

অনিলদার ছেলে বাংলাদেশের ঈশ্বরদীতে হাইস্কুলের হেড মাস্টার। ওখানেই ছিলেন। মাঝে মধ্যে চিঠি আসত। সম্ভবত ’৭২-এর মার্চ মাস নাগাদ চিঠি এল অনিলদাদের ফিরে যাওয়ার জন্য। নীলুদা সব ভুলে দাদা ও তাঁর পরিবারের জন্য দু’হাত ভরে শুকনো খাবারদাবার, চাদর, বিছানা, নানারকম খুঁটিনাটি সাংসারিক জিনিস, শাড়ি-জামা ইত্যাদি কিনে ডাঁই করে ফেললেন। ওখানে কী পাবেন না পাবেন ঠিক নেই, অসুবিধে যেন না হয়!

লটবহর তো হ’ল বিশাল। অনিলদা প্রৌঢ় ও জীর্ণ চেহারার মানুষ, তায় একটি চোখ নষ্ট। তার ওপর এত মালপত্তর, প্রৌঢ়া স্ত্রী, তিন মেয়ে নিয়ে যাবেন কী করে! আমি তখন সতেরো-আঠারোর গড়পড়তা বাঙালি ছেলেদের মতোই টগবগে তুমুল সমাজকর্মী। অতএব পাড়ার বন্ধু আশিস আর সোমনাথকে সঙ্গে নিয়ে কোমর বেঁধে ফেললাম।

এপ্রিল মাসের কোনো একদিন সকালবেলাতেই বেশ কয়েকটি রিকশায় (এখনকার মতো ‘মিনি ট্রাক’ জাতীয় গাড়ি তখনও চালু হয়নি) সব মালপত্র ও মানুষ চাপিয়ে সবার অজস্র শুভেচ্ছা ও বিদায়ী চোখের জল নিয়ে রওনা দিলাম। শ্যামনগর স্টেশন থেকে কয়লার এঞ্জিনে টানা গেদে প্যাসেঞ্জার। আপ লাইনের ফাঁকা ট্রেনে সী-অফ করতে আসা সবাই মিলে হাতে হাতে মালপত্র তুলে দিয়ে কুউউ-ঝিক-ঝিক! ট্রেনপথ জুড়ে আমাদের নানা স্টেশনে নেমে এ কামরা সে কামরা ঘুরে বেড়ানো। আরো অনেক পরিবারই পেলাম যাঁরা ফিরে চলেছেন। অনিলদার মেয়েরা, সীমা, নীলিমা আর সন্ধ্যা আমার পাতানো সম্পর্কে ভাইঝি হলেও বয়সে সীমা-নীলিমা একটু বড়, সন্ধ্যা সামান্য ছোট। আমি তিনজনকেই “পিসি” ডাকতাম। ওরাও আমায় “কাকা” ডাকত। ওদের সঙ্গেও হাসি মজা করে যাচ্ছি ওদের মনের ভার কমাতে। রানাঘাটে এসে এঞ্জিন জল খেল পেট ভরে। আবার চলা।

ভারতের সীমান্তবর্তী স্টেশন ‘গেদে’-তে এসে পৌঁছালাম বেলা প্রায় দশটায়। দুই প্ল্যাটফর্মের ছোট স্টেশন। শান্টিং পেরিয়ে রেললাইন সামান্য ধনুকী বাঁক নিয়ে চলে গেছে বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার ‘দর্শনা’। ‘এপার ওপার’ কী করে বলি! সবই তো একই রকম! টানা ক্ষেত, মাঠ, খাল, গাছপালা, আকাশ, পাখি – সবই তো অবাধ, অনর্গল! ভাগের দাঁড়িটা কোথায়? কে কী বুঝে এই ভাগটা করল? এখানকার মাটিতে কি নেমে দাঁড়িয়েছিল? মাটির আর আকাশের গন্ধ নিয়েছিল?

স্বাধীন হয়ে যাওয়া দেশে নিজের ছেড়ে আসা ভিটেতে ফেরার তাগিদে যাত্রী আরো অনেক। প্রায় গিজ গিজ করছে। অনিলদাদের এক জায়গায় বসিয়ে আমরা ত্রিমূর্তি বার হলাম সরেজমিন পুরো খতিয়ে দেখতে। রবিবার ছিল। গেদে স্টেশনের একটু আগে ডানদিকে বিরাট হাট বসেছে। প্রথমেই ওখানে ঢুঁ মারলাম। ধান, চাল-ডাল, আনাজপাতি, মশলা,

বাসন, ডালা-কুলো-ধামা, চাষীর টোকা, জেলের জাল, মণিহারী জিনিস, জুতো-চপ্পল সব তো আছেই, গরু-ছাগলও আছে। আর আছে খাবার হোটেল। চনমনে খিদে পেয়ে গিয়েছিল। তিনজনে জীবনে এই প্রথম রসগোল্লার রস দিয়ে পেটাই পরোটা খেলাম। ওঁদের পাঁচজনের জন্যও নিয়ে নিলাম। স্টেশনে ওঁদের খাবার দিয়ে এবার রিকনেশ্যাঁস আমাদের পুবমুখো মূল গন্তব্য পথের, দর্শনার রাস্তার। রেললাইন ধরেও হেঁটে যাওয়া যায়। তবে মালপত্র থাকলে লাইন থেকে কিছুটা নীচের সমান্তরাল কাঁচা রাস্তা দিয়েই যেতে হবে। তিন কিলোমিটার মতো পথ। অনেককেই দেখলাম সপরিবারে লাইন ধরেই হাঁটা দিয়েছেন। আবার গরুর গাড়িতে মালপত্র চাপিয়েও অনেকে চলেছেন।

রাস্তা ধরেই হাঁটতে হাঁটতে কখন যে সীমানা পার করে 'বিদেশে' চলে এসেছি টেরই পাইনি! হঠাৎ দেখি সামনে 'দর্শনা' স্টেশন! নিজের ভেতরেই যেন শিহরণ খেলে গেল! অন্য দেশ! আবার, আমার পিতৃপুরুষের ছেড়ে আসা ভিটেমাটির দেশও! বিদেশ বলতে নেপাল-ভুটান গিয়েছি, পশ্চিম পাকিস্তান দূর থেকে দেখেছি। কিন্তু এর সঙ্গে যে অন্যরকম অনুভূতি জড়িয়ে আছে, রক্তের ভিতরের! আমার বাবা-মা দু'জনেরই পৈতৃক ভিটে ময়মনসিংহ জেলায়, যা ওঁরা ১৯৪৬ সালে ছেড়ে এসেছেন। দর্শনা স্টেশন পেরিয়ে ওপাশে বাজার, বাড়িঘর, স্কুল, ডাকঘর। গঞ্জ মতো জায়গা। গেদের মতো নির্জন নয়। ওদিকে লাল ইঁটের পাঁচিলতোলা 'কুষ্টিয়া সুগার মিল'। যুদ্ধের শুরু থেকে বন্ধ। খবর নিয়ে জানলাম, অনেক দেরিতে দেরিতে দর্শনা-চুয়াডাঙ্গা ট্রেন চলাচল করছে। বাস আছে, কিন্তু এখন তাও অনিয়মিত। জ্বালানি তেলের অভাব খুব। একটি ট্রেন তখনি প্রচুর লোক বোঝাই করে নিয়ে চুয়াডাঙ্গা গেল। ভাবলাম, লোক যত পার হয়ে যায় ততই ভাল। একটু ফাঁকা পাওয়া যাবে। রাতে গেদেতে গাড়িও আসবে না, লোকও না। বেশি সময় না কাটিয়ে রেললাইন ধরে জোরে পা চালিয়ে ফিরে এলাম গেদেয়। রেললাইনের পাশেই মাঝামাঝি জায়গায় বোর্ড দেখতে পেলাম, বাংলায় 'ইণ্ডিয়া' লেখা, না 'ভারত' নয়! কেমন যেন লাগল। তার আগেই 'ইণ্ডিয়া'-র দিকে মুখ করা বোর্ড আছে 'বাংলাদেশ' লেখা, তার উল্টোপিঠে বাংলাদেশের দিকে লেখা 'ধন্যবাদ' – যাঁরা ওদেশ থেকে ফিরছেন, তাঁদের উদ্দেশে। রাজনৈতিকভাবে দুই আলাদা রাষ্ট্র, আর আমরা চিনে বা না চিনে যথেচ্ছ এপার ওপার করে বেড়াচ্ছি!

বেশ বেলা হয়ে গেছে। আশিস আর সোমনাথ রইল মালের পাহারায়। আমি অনিলদাদের সবাইকে নিয়ে গেলাম গেদে হাটের হোটেলে। ওঁরা সঙ্গে থাকা খাবারই খেয়ে কাটিয়ে দেবেন বলছিলেন। বোঝালাম, এখনও অনেকটা পথ বাকি। পথের অবস্থা খুব ভাল নয়। কী পাবেন না পাবেন, কতদিনে পৌঁছাবেন কিচ্ছু ঠিক নেই। যেটা আছে আপৎকালের জন্য থাক। ওঁরা মাছভাত খেলেন, আমি মাংসভাত; খুবই সস্তা। কোনো কোনো হোটেলে গরুর মাংসও বেশ পাওয়া যাচ্ছে। ইতিমধ্যে এক গরুর গাড়িওয়ালার সঙ্গে কথা বলা হয়ে গেছে। একটু রোদ পড়লে আমাদের মালপত্র সমেত দর্শনা পৌঁছে দেবে। যথাসময়ে আমাদের ঠিক করা গরুর গাড়িটি তার অন্য খেপ সেরে এসে গেল। পড়ন্ত বিকেলে মালপত্তরসহ অনিলদাদের তুলে নিয়ে সে চলল সাদা মাটির ধুলোয়ভরা পথ ভেঙে ক্যাঁচোর কোঁচর আওয়াজ তুলে। পিসিরাও আমাদের সঙ্গে হেঁটে চলল তার পাশাপাশি। দর্শনা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে মালপত্র তুলে এখন অপেক্ষা চুয়াডাঙ্গার ট্রেনের। কিছু আগে যে গাড়িটি গেছে, সেটি ঘুরে আসতে অনেক দেরি। দূরত্ব বেশি নয়, ২২ কিমি মতো। কিন্তু সময় নিচ্ছে অনেক।

আমরা আবার চারপাশ দেখতে বার হলাম। কিছু স্থানীয় মানুষের সঙ্গে বেশ আলাপ জমে গেল। তাঁদের দু'জন আমাদের নিয়ে গেলেন একটি দোতলা ভগ্নদশার বাড়িতে। এটি একটি স্কুল ছিল, আপাতত পরিত্যক্ত। বাড়িটির মেঝে, ভেতরের বিশাল উঠোন পুরো খুঁড়ে ফেলা হয়েছে। জানা গেল, পাকিস্তানি খান সেনারা এখানে ঘাঁটি গেড়েছিল। তারা শত শত মেয়েদের তুলে এনে চরম অত্যাচার করে, নৃশংসভাবে খুন করে প্রথমদিকে এখানেই মাটিতে পুঁতে দিয়েছে; পরের দিকে এমনিই স্তূপ করে রেখে দিয়েছে। দুর্গন্ধে পুরো এলাকায় নাকি টেকা যেত না। শুধু তাই নয়, শিশুদেরও নাকি নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। তার এত রূঢ় বাস্তব বর্ণনা পেয়েছি যা এখানে বিবৃত করা অসম্ভব। সেসব শুনে শুধুই কেঁপে উঠিনি, আজও তা মনে করলে আমার বমি

এসে যায়।

রাত সাড়ে সাতটা নাগাদ একটি ট্রেন এলে সেটিও ছেড়ে দেওয়াই স্থির করলাম। এত জিনিসপত্তর, একটু ফাঁকা না পেলে তোলা যাবে না। সেইসময় ট্রেনের ড্রাইভার সাহেবের সঙ্গেও একটু খেজুরে আলাপে খাতির জমালাম। উনি পরামর্শ দিলেন, "আমি পরেরবার রাইত বারোটায় আসুম। আফনেরা রানিং গাড়িতে উইঠ্যা বগির দরজা আটকাইয়া নিয়েন। পারবেন তো ওঠতে?"

আমাদের কাছে তো কলেজে ডেলি প্যাসেঞ্জারির দৌলতে রানিং ট্রেনে ওঠা কোনো ব্যাপারই নয়! রাতের খাবার অল্প করেই খেয়ে গল্প, পায়চারি, তিন পিসির সঙ্গে একটু খুনসুটি, অপেক্ষা ইত্যাদি চলল। রাত সাড়ে বারোটায় দূরে ট্রেনের আলো আর হুইসল পেলাম। আমি আর সোমনাথ অনেকটা পিছিয়ে পোজিশন নিয়ে দাঁড়ালাম। ট্রেন ঢুকতেই আমরা আমাদের লাগেজের অবস্থান হিসেব করে কয়েকটা কামরা ছেড়ে দিয়ে একটিতে উঠে গেলাম চলতিতেই। থামার পর সেটা প্রায় আমাদের লাগেজের সামনেই পড়ল। সোমনাথ এমনিতে খুব ভ্যাবলার মতো থাকে। কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ বেশ কড়া মস্তানি দেখিয়ে দেয়। এখনও অন্য লোকেরা এতে ওঠার চেষ্টা করতেই সোমনাথ তেমনি কিছু 'অদাকারি-করতব' দেখিয়ে দেওয়ায় তারা এই দরজা ছেড়ে অন্যগুলোর দিকে দৌড়াল। পরে ভেবে খারাপ লেগেছে যে, এই মানুষগুলো চিরকাল বলশালী বা প্রভাবশালী লোকেদের দাপট আর দাবড়ানিতে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ছাড়াই শুধু পালিয়ে যেতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। আমরা ঝটপট সব মালপত্র তুলে অনিলদাদের বসিয়ে দিলাম। না, ট্রেনের টিকিটের কোনো ব্যবস্থা নেই। কারণ, সবাই "ওয়েলকাম হোম"!

কয়লার এঞ্জিন এখানেও। কোচগুলো আমাদের ওখানকার চেয়ে যেন দুর্বল চেহারার। গেদের দিকে মুখ করে থাকা এঞ্জিন আবার ঘুরে এসে চুয়াডাঙ্গার দিকে মুখ করে বগিগুলোকে টেনে নিয়ে চলতে শুরু করল। ঘরে ফিরতে চাওয়া মানুষগুলোকে তাদের নিজেদের ঠিকানার দিকে এগিয়ে দিতে হবে। আমাদের দায়িত্ব এঁদের চুয়াডাঙ্গা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে সেখানে গোয়ালন্দ ঘাট যাওয়ার ট্রেনে তুলে দেওয়া। চিঠিচাপাটিতে স্থির হয়ে গেছে আগেই, আগামীকাল সোমবার অনিলদার ছেলে ঈশ্বরদী থেকে গোয়ালন্দ চলে আসবেন। সেখান থেকেই ওঁদের নিয়ে নেবেন।

সারাদিন ধরে তো বটেই, এখন এই ট্রেনযাত্রায় আরো বিশেষ করে, সবার মুখে শুনছি ঘরে ফেরার চাপা উত্তেজনাকে ছাপিয়ে উৎকণ্ঠা, ফেলে আসা ঘরদোর কী অবস্থায় পাবেন! পরিচিত কার কী ক্ষতি হয়ে গেছে সে সব খবর, ইণ্ডিয়াতে কেমন কাটিয়েছেন তার অম্লমধুর অভিজ্ঞতা – এই সব। তবে সবার মনই ভরে আছে বহুকাল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন আত্মীয়দের সঙ্গে আবার দেখা হয়ে যাওয়ার আনন্দে। তাঁরা যে নিজেদের এত কষ্টের মধ্যেও এতদিন আশ্রয় দিয়েছেন, সেজন্য কৃতজ্ঞতা যেন উপচে পড়ছে তাঁদের কথাবার্তায়। সত্যিই তো, ওঁদের তো আর ধানী জমিজমা নেই এখন! চাকরির পয়সায় নির্ভর করে এতদিন সবাইকে খাওয়ানো তো সোজা কথা নয়!

রাত প্রায় দু'টো নাগাদ পৌঁছালাম চুয়াডাঙ্গা। বড় স্টেশন। খবর নিয়ে জানলাম, এখন নতুন দেশ নতুন করে গড়ে ওঠার পথে কোথাও কোনো নির্দিষ্ট সূচি মানা যাচ্ছে না, বিশেষত দূরের এলাকায়। পূর্বতন সরকার প্রায় সমস্ত ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ নিহত, নয়তো পরিবার স্বজন হারিয়ে বিধ্বস্ত। এখন সাময়িক জোড়াতাপ্পি ব্যবস্থায় কোনোমতে ঘরছাড়া মানুষগুলোকে ঘরে ফেরানোটাই প্রধানতম কর্তব্য। টুকরো টুকরো রুটে গাড়ি চালিয়ে সামাল দেওয়া হচ্ছে। এমনকী, এখন এইসব ঘরে ফেরা মানুষগুলোর কাছ হতে ট্রেনের ভাড়াও নেওয়া হচ্ছে না। দেশ আগে গড়ে উঠুক, সুস্থিত হোক। মুগ্ধ হয়ে গেলাম স্টেশন মাস্টার আর অন্য কয়েকজনের কথায়। ভোরবেলায় একটি ট্রেন ছাড়বে পদ্মাপারের গোয়ালন্দ ঘাট যাওয়ার জন্য। অনেক শুনেছি এই গোয়ালন্দ ঘাটের, তার স্টীমারের কথা। খুবই ইচ্ছে ছিল সেই জায়গা দেখার। কিন্তু উপায় নেই। সামনেই আমার আর আশিসের অনার্সের পরীক্ষা। তাই এখান থেকেই ফিরতে হবে। ভোর সাড়ে চারটেয় গোয়ালন্দগামী গাড়ি লাগল প্ল্যাটফর্মে। এই ভোরে ভিড় হলেও তা তেমন নয়। গতকাল আসা বেশিরভাগ মানুষই তো তাড়াহুড়ো করে আগের গাড়িগুলোতে চলে গেছেন! সমস্ত লাগেজ তুলে সাজিয়ে, অনিলদাদের বসিয়ে দিয়ে এবার আমাদের ছুটি। ওঁরা নিজেদের ঘরে ফেরার আনন্দের চেয়েও যেন বেশি ব্যথিত আমাদের

সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়ার ব্যথায়! সবারই চোখের জল যেন বাঁধ মানছে না।

সময় কেটে গেল অনেকক্ষণ। গাড়ি নড়ে উঠল হুইসল বাজিয়ে। কয়েকটি হাত জানালা দিয়ে নাড়তে নাড়তে অদৃশ্য হ'ল বাঁকে। আরও দেখলাম, বিষণ্নতা মাখা একজোড়া বিশেষ চোখের দৃষ্টি যেন চরাচরে ছড়িয়ে রয়ে গেল কোনো সীমানা না মেনে।

আমাদেরও মন ভার। কাল থেকে একটুও বিশ্রাম না নিয়ে এতক্ষণ দৌড়ঝাঁপ, মালপত্র টানাহেঁচড়া সব মহোৎসাহে করে গিয়ে এখন যেন অনন্ত অবসন্নতা গ্রাস করে ফেলছে।
কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা দর্শনার ট্রেন পেয়ে গেলাম। ভোরের আলোয় শ্যামল সবুজ প্রান্তর চিরে ছুটে চলে সেই ট্রেন আমাদের পৌঁছে দিল দর্শনায়। সকাল সাড়ে ছ'টায় দর্শনায় নেমে রেললাইন ধরেই হাঁটতে হাঁটতে সকালের সোনা রোদ গায়ে মাখতে মাখতে আবার সীমানা পেরিয়ে এসে ঢুকলাম আমার প্রিয় দেশ, আমার জন্মভূমিতে।

"...এমন দেশটি কোথাও খুঁজে
পাবে নাকো তুমি..."

রাতের সফরে এই স্নিগ্ধ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখার সুযোগ ছিল না। কিন্তু এখন সুযোগ এলেও মনের ভেতরকার বিষণ্নতা যেন তাকে উপভোগ করতে দিচ্ছে না।

আমার হাত, শরীর সব জায়গায় যেন এক অলৌকিক উষ্ণ স্পর্শের অনুরণন হয়ে চলেছে। আমি কোনো কথাই বোধহয় সংলগ্নভাবে বলতে পারছি না। দুটো চোখের গভীর দৃষ্টি মনে গেঁথে রয়ে গেছে। আসলে কিছুক্ষণ আগে সবার চোখের আড়ালে আচমকা ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা আমার ভেতরসুদ্ধ নাড়িয়ে দিয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা স্টেশনে তখনও ট্রেন ছাড়তে কিছু দেরি আছে। আশিস আর সোমনাথ কামরায় অনিলদাদের সঙ্গে নানা গল্পে মেতে রয়েছে। আমি প্ল্যাটফর্মে একটু সরে পরের কামরার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছি উল্টোদিকে তাকিয়ে। যদিও কিছুই দেখছিলাম না। শুধু ভাবছিলাম। প্রায় একবছর এঁরা আমাদের বাড়িতেই তো একসঙ্গে ছিলেন! নানা কথা মনে আসছিল। হঠাৎ একটা স্পর্শ আর হাতে একটু টান – ঘুরে দেখি সন্ধ্যাপিসি, অনিলদার ছোটমেয়ে, বয়সে আমার চেয়ে একটু ছোট।
আস্তে করে বলল, "আসো একটু, কথা আছে।" বলেই সেই পাশের কামরার দরজা দিয়ে উঠে গেল ছিপছিপে, বেতসলতার মতো শ্যামলা রঙের সদ্য তরুণী চেহারাটা। আমি একটু অবাক হয়েই অনুসরণ করলাম ওকে। এই কামরাটা প্রায় ফাঁকা। অনেকটা ভেতরদিকে কয়েকজন বসে আছে। দরজা দিয়ে উঠেই যেখানে ও দাঁড়াল, তার দু'দিকেই পার্টিশন ওয়াল। ও ওর বড় বড় চোখে এক অদ্ভুত দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।
বললাম, "বলো, সন্ধ্যাপিসি।"
ও হিস হিস করে উঠল, "পিসি, পিসি আর পিসি! আমারে দ্যাখতে সাত বুড়ির এক বুড়ি লাগে, তাই না? সেই জইন্য তাকাইয়াও দ্যাখতে ইচ্ছা করে না আমারে। তাই 'পিসি' ডাক।"
চমকে উঠলাম, "না না, তা কেন? এটা তো শুধু একটা ডাক। তুমি তো সত্যিই সুন্দরী। তোমার দিকে কে না তাকাবে?"
- "অন্য কারও কথা শুনতে চাই না। তুমি দ্যাখ কিনা, কী রকম দ্যাখ, হেইটা শুনতে চাই। তুমাদের লাখান (মতো) কইলকাতার ভাষায় তো পুরা কথা কইতে পারি না, মৈমনসিঙ্গ্যা ভাষায়ই কথা কওন শিখছি যে! আমারে পসন্দ করবা ক্যান?"
আমি ভেতরে ভেতরে নাড়া খেয়ে গেলাম। এভাবে তো ভাবিনি কখনো! কো-এড কলেজে পড়ি, ছেলে-মেয়ে দু'রকম বন্ধুই অনেক, কিন্তু ভেদাভেদ করিনি। তবে নিজের পড়াশোনা, সব পেয়েছির আসর, বামপন্থী ছাত্র রাজনীতি, সোশ্যাল ওয়ার্ক এসব নিয়েই তো মেতে থাকি সবসময়। এক বাড়িতে পাশাপাশি ঘরে থেকে একবছর ধরে এই চেহারাটা সর্বক্ষণই তো ঘুরে বেড়িয়েছে চোখের সামনে। অন্যকিছু ভাবনা যে মনের মধ্যে কখনো উঁকি দেয়নি, তা তো নয়! হঠাৎ হঠাৎ চোখ টেনেছে, হয়তো নাড়াও দিয়েছে মনে। তবে নিজেই সেসব সরিয়ে দিয়েছি মন থেকে। আমাকে তো 'কাকা' ডাকে! মাঝে মাঝেই কারণে অকারণে পড়ার টেবিলের পাশে এসে ও বসে থেকেছে। কথা বলেছে কম, বড় বড় দুই গভীর চোখ মেলে তাকিয়ে থেকেছে, শুনেছে বেশি।

আমাদের বাড়ির বিশাল বইয়ের স্টক থেকে ওকে বই বেছে দিতাম, পড়ত। বই পড়তে ভালবাসে খুব। কিন্তু এখনকার কথার গতিপ্রকৃতি একটু ঝাঁকুনি দিয়ে দিল। আমি আস্তে করে ওর হাতটা ধরলাম। একটু উষ্ণ, তিরতির করে কাঁপছে যেন সেটা। বললাম, "এরকম ভেবো না। তুমি সত্যিই খুব ভাল। কতদূরে চলে যাচ্ছ, আর দেখা হবে কিনা জানি না। একটা বছর একসঙ্গে কাটালাম। এত কাছের হয়ে গেছ। তোমাকে, তোমাদের ভুলতেই পারব না। তুমি সবসময় কাছে এসেছ। আমার অনুভবে তুমি থাকবে।"

ওর কাজল কালো চোখদুটোতে যেন দূরে কোথাও হারিয়ে যাওয়ার বিষণ্ণতা। এক অন্যমনস্কতা।

সন্ধ্যা হঠাৎ করে ওর হাত ধরে থাকা আমার হাতটা তুলে নিয়ে ওর সুডৌল বুকের ওপর চেপে ধরল। আমার সারা শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন। একইসঙ্গে কোমল অথচ সুদৃঢ় এক অনির্বচনীয় স্পর্শের অনুভূতি। এক অন্যরকম উষ্ণতা। আমার প্রায় আঠারো বছরের জীবনে এই প্রথম এমন স্পর্শানুভূতি! ফিসফিসিয়ে ও বলে উঠল, "তুমি কুনোদিন কাউরে ছুঁইয়া দ্যাখ নাই, জানি। এই আমারে ছুঁয়াইয়া দিলাম। ভুইল্যা যাইবা না তো? আমারে ছুঁইয়া কও!"

আমি এক ঘোরের মধ্যে ওর নরম শরীরের উষ্ণতা নিজের মধ্যে চারিয়ে নিতে নিতে বললাম, "তুমি আমার মনের মধ্যে চিরকাল থাকবে। ভুলব না কোনদিনও।"

অসমাপ্ত রূপকথা

অদিতি ঘোষদস্তিদার

দিল্লিতে থাকতেই শুনেছিলাম বিধ্বংসী ঝড়ের দাপটে আমাদের পৈতৃক বাড়ির এলাকার রাজবাড়িটার বিরাট ক্ষতি হয়েছে। এবার এসে নিজের চোখে দেখলাম।

আমাদের চারপুরুষের ভিটের পিনকোড কলকাতার হলেও আদপে এলাকাটা মফস্বল। পুরনো আর নতুনের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। একদিকে ফ্ল্যাটবাড়ি উঠছে ব্যাঙের ছাতার মতো, অন্যদিকে চারশো বছরেরও বেশি পুরনো ভাঙাচোরা রাজবাড়ি, জোড়া শিবের মন্দির।

রাজবাড়িটা বারমহল, বৈঠকখানা, রাধাগোবিন্দের নিত্যসেবার মন্দির, দুর্গাদালান সব মিলিয়ে একেবারে জমজমাট ব্যাপার ছিল। কালের করাল গ্রাসে ক্রমশঃ ভাঙাচোরা, বিপজ্জনক। শুধু দুর্গাদালানটাই টিমটিম করছিল। আজ সেও ধ্বংসস্তূপ! চোখে জল এল। সেই ক্লাস ফাইভ থেকে আমার রাজবাড়ির অন্দরে যাতায়াত। আসা যাওয়ার পথে রোজ দেখতাম একটি লোক ভেতরে ঠাকুর গড়ছে। পরে জেনেছিলাম তার নাম শ্রীমন্ত, আমার শ্রীমনদা।

এলাকায় ঠাকুর গড়ার লোক অনেক ছিল, কিন্তু শ্রীমনদার জাতই ছিল আলাদা। শ্রীমনদার ঠাকুর একবার দেখলে কেউ চোখ ফেরাতে পারত না। যেমন ঢলঢলে মুখশ্রী, তেমনি সেরার সেরা দু'চোখ। ঠাকুর গড়ার সব কাজ একাহাতে শ্রীমনদা করতে পারত না ঠিকই, কিন্তু চোখ আঁকার কাজ করত নিজে। তুলির এক এক টানে চোখগুলো যেন হেসে উঠত।

রাজবাড়িতে ঢুকে ঠাকুর গড়া দেখা আমার কেমন যেন নেশায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। অদ্ভুত একটা আকর্ষণ ছিল বাড়িটার। তখনই দোতলাটা প্রায় ভাঙাচোরা, সংস্কারের অভাবে ফাটল দিয়ে বড় বড় গাছ গজিয়েছে। তবু একদিকে বড় বড় ঘর, চাতাল, ভাঙা দেওয়াল আর অন্যদিকে শ্রীমনদা, রাশি রাশি ঠাকুর, কাঠামো, খড় – সব মিলেমিশে সে ছিল আমার রূপকথার জগৎ।

শ্রীমনদা স্বভাবে চাপা হলেও আমাকে খুব ভালবাসত।

একদিনের কথা বড্ড মনে পড়ে।

ক্লাস নাইনে পড়ি তখন। গরমের ছুটি। দিনের বেলাতেই অন্ধকার করে শুরু হ'ল অঝোর বৃষ্টিধারা। কেন জানি না সেদিন শ্রীমনদার মনের বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল। বলেছিল,

- "জানিস, রাজবাড়ির দোতলাটা আমাদের কম বয়েসে অতটা খারাপ ছিল না। মানুষজন থাকতেন। একদিকে ছিল পায়রার বাসা। একসময় রাজারা পায়রা ওড়াতেন, বাজি ধরতেন। অবস্থা পড়ে গেল, কিন্তু পায়রাগুলো রয়ে গেল। খুব ভাল ভাল জাতের পায়রা!

আমার পায়রা পোষার শখ ছিল, কিন্তু সংসারে অভাব। কেনার উপায় নেই। তাই মাঝে মাঝেই যেতাম পায়রা ধরতে। দু'একটা ধরেও ছিলাম। কিন্তু লক্ষ্য ছিল দুটো সাদা গিরিবাজের ওপর।

আমি তখন তোর মতোই। কী কারণে যেন সেদিন স্কুল তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গিয়েছিল, বাড়ি না গিয়ে গেলাম গিরিবাজ ধরার ধান্দায়। পায়রাদুটো আমায় দেখে ছাদের ফাটলে গজানো অশ্বত্থ গাছে গিয়ে বসল, আমি কার্নিশে উঠে হাত বাড়ালাম। প্রায় ধরে ফেলেছি, এমন সময় পুরনো কার্নিশ আমার ভার সহ্য করতে না পেরে ভেঙে পড়ল। আমিও টাল সামলাতে না পেরে পড়লাম একটু নিচে বারান্দায়, একরাশ ভাঙা জানলার শার্শির ওপর।

বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলটা কাটল অনেকটা। রক্ত পড়ছে বেশ। ব্যাগ থেকে স্কুলের খাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে রক্ত মুছছি। ব্যথাও করছে। কিন্তু তার থেকেও বেশি হচ্ছে ভয়। পায়রা অভিযানের কথা কেউ জানত না বাড়িতে। জানলে মা সোজা বাবার কানে তুলবে আর কপালে জুটবে খড়মপেটা। কিন্তু রক্ত বন্ধ না হলে বাড়ি যাব কী করে?

আকাশপাতাল ভাবছি হঠাৎ কানে এল এক মধুর আওয়াজ।

- 'কতটা কাটল দেখি!'

পেছনে তাকিয়ে দেখি স্কুলড্রেস পরা একটি মেয়ে। মানে ওদেরও তাড়াতাড়ি ছুটি হয়েছে। আগে কখনো দেখিনি মেয়েটিকে। কতক্ষণ জানি না পলকহীন চোখে চেয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল মেয়েটি এই রাজবাড়ির কোন দেবী। ঘোর কাটল ঝংকারে।

- 'আঙুলটা তো ঝুলছে প্রায়! দেখি বেঁধে দিই। তার আগে এই গাঁদাপাতাগুলো ডলে রসটা লাগালে রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে।'

চুপচাপ নির্দেশ মানলাম। সে তারপর একফালি পরিষ্কার কাপড় দিয়ে বুড়ো আঙুলটা টেনে বেঁধে দিল।

কোনরকমে আস্তে আস্তে হেঁটে বাড়ি ফিরলাম। মাকে সত্যি কথা বলিনি। রাতে এল ধুম জ্বর। স্বপ্নে সেই মুখ। সারতে সময় লাগল বেশ। আঙুলটা এত জখম হয়েছিল যে চিরদিনের মতো বাঁকা হয়ে গেল।

সেরে উঠেই আবার আসা-যাওয়া শুরু হ'ল রাজবাড়িতে। পায়রা ধরার ছলে রাজকন্যা দর্শন। কেউ কারুর নাম জানতাম না। শুধু একঝলক দেখা। মুখে মৃদু হাসি। ওটুকুই পরম পাওয়া।

এরপর হঠাৎ একদিন বাবার কারখানায় লকআউট হয়ে গেল। সংসারের হাল শোচনীয়। মা আমাকে ভাগলপুরে দাদুর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।"

আমি প্রশ্ন করলাম, "আর তোমার রাজকন্যে?"

শ্রীমনদা ম্লান হাসল।

- "দেখা করিনি। আমার চলে যাওয়াটা ছিল সংসারের চরম অভাবের জন্যে। পড়তি অবস্থা হলেও সে তো আসলে রাজপরিবারের; কথাটা জানাতে আমার কেমন যেন বেধেছিল। জানিস, ভাগলপুরে আমার কিচ্ছু ভাল লাগত না, মার কথা মনে পড়ত খুব। আর মাঝে মাঝে মনে ভেসে উঠত এক ভাঙা রাজবাড়ি আর তার অলিন্দে একখানা সুন্দর মুখ। দাদু চেষ্টা করেছিলেন অনেক, কিন্তু পড়াশোনা আমার বেশিদূর হ'ল না।

মামার বাড়িতে দুর্গাপুজো হতো। ঠাকুর গড়তেন এক বয়স্ক মানুষ। আমি তার পাশে বসে কাদার তাল ঘাঁটতাম। চেষ্টা করতাম আমার মানসীর মুখের আদল ফোটাতে।

বছর কয়েক কাটতেই আমি আবার ফিরে এলাম বাড়িতে। বাবা তখন বেশ অসুস্থ। আমি নানারকম কাজের চেষ্টা করছি। বিশেষ কিছু জুটছিল না। তবে সুযোগ পেলেই বাড়িতে আমি আপনমনে ঠাকুর গড়তাম। বন্ধুবান্ধবরা সুখ্যাতি করত।"

শ্রীমনদা একটু থামল। সেই ফাঁকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, "ফিরে এসেও একবার দেখতে গেলে না রাজকন্যেকে?"

- "গেছিলাম রে। কেউ ছিল না সেখানে। দোতলাটা একেবারে

ধসে পড়েছিল।”
- “কাউকে জিজ্ঞেস করলে না?”
- “নাঃ! এ কথা তোর আগে আর কাউকে বলিনি রে!”
- “তারপর?”
- “পুজোর তখন মাসখানেক বাকি। হঠাৎ বাড়িতে দুজন ভদ্রলোক এলেন। জিজ্ঞেস করলেন রাজবাড়ির দুর্গাদালানের ঠাকুর আমি গড়তে পারব কিনা। ওঁদের পুরনো শিল্পী হঠাৎ ভাল চাকরি পেয়ে যাওয়ায় বড় মুশকিল ঘটেছে।
সেই শুরু হ'ল রাজবাড়িতে ঠাকুর গড়া। দুর্গাঠাকুরের মুখে নিপুণ করে আঁকলাম সেই চোখ, যা আমার মনের মধ্যেই শুধু বসে আছে। আর কেউ বুঝল না। লোকে মুগ্ধ হয়ে ধন্য ধন্য করল। আমিও সুযোগ বুঝে দালানে সারা বছর ঠাকুর গড়ার অনুমতি আদায় করে নিলাম। ভাঙা রাজবাড়িটাই তো শুধু জানত আমাদের রূপকথা, তাই এখানেই আমার শান্তি!”
অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম দুজনে। তারপর নৈঃশব্দ্য ভাঙলাম আমি।
- “আর কোনোদিন দেখতে পাওনি তাকে, তাই না?”
শ্রীমনদা ধীরে ধীরে উত্তর দিল, “বেশ কিছু বছর কেটে গেছে তখন। দুগ্গাপুজোর ঠিক আগে একদিন সবে চোখ আঁকা শেষ করে ঠাকুরকে গয়না পরাতে যাব, হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন বলে উঠল, ‘আহা! মনে হয় চোখদুটি যেন কত কী বলতে চায়!’
সেই মধুর স্বর! আমার হাত-পা কেমন যেন অবশ হয়ে গেল। এক ঝলক ফিরে তাকিয়ে দেখি এক জ্যান্ত দেবীমূর্তি; গয়না, শাড়ি, সিঁদুরে জ্বলজ্বলে!
এত বছর পরে একমুখ দাড়িগোঁফের জঙ্গলে ঢাকা আমাকে তার চেনা সম্ভব নয় বলে নিশ্চিন্ত হলাম। একটু হেসে উত্তর দিলাম, সব কথা কি আর মুখে বলা যায়? খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সে।
আমি এদিক ওদিক এটা সেটা করছি। মনের ভেতরে যে কী ঝড় চলছে তা শুধু আমিই জানি।
হঠাৎ সে বলে উঠল, ‘অনেক কথা এই রাজবাড়ির ভাঙা ইঁটগুলোও বুকে ধরে রেখেছে, তাই না?’
চমকে তাকিয়ে দেখি সে আমার বাঁকা বুড়ো আঙ্গুলটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আমি মুখের দিকে তাকাতেই বলল, ‘ফেলে আসা সময়কে মুছে দেওয়াই ভাল, তাই না?’
প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়েই সে পেছন ফিরে তাড়াতাড়ি চলে গেল। একবার ফিরেও তাকাল না। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম, বোধহয় অনন্তকাল।
আর কোনোদিন তাকে দেখিনি রে।”

এখনো মনে আছে শ্রীমনদার চোখের কোণে জল চিকচিক করছিল।
বছর দুয়েক আগে শ্রীমনদা চলে গেছে না ফেরার দেশে। রাজবাড়িটাও পুরো ভেঙে গেল। এক না-ফোটা ভালবাসার রূপকথা ধরা রইল শুধু আমার বুকের মাঝখানটিতে।

ছেলেবেলার ছাদ

সুমিতা বসু

ছেলেবেলা। শব্দটা শুনলেই এক ঝাঁক লাল-নীল-হলদে-সবুজ-বেগুনি ঘুড়ির ঝাঁক মনে পড়ে – উড়ছে, ভাসছে, ডিগবাজি খাচ্ছে দূর আকাশে, আবার টাল সামলে তরতর করে উঠে যাচ্ছে ওপরে। ঠিক বিশ্বকর্মা পুজোর আগে উত্তর কলকাতায় আমাদের অভয় দত্ত লেনের বিশাল বাড়িটার ছাদ-জুড়ে মাঞ্জা দেবার ধুম লাগত। কাঁচের গুঁড়ো, ডিম, সুতোর ছড়াছড়ি – ওপাশে পড়ে আছে ছোট, মেজো, বড় মাপের নানান লাটাই। দাদাদের সঙ্গে পাড়ার ছেলেদের বিরাট দল ব্যস্ত হয়ে ঘুড়ি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতিপর্বে মত্ত। তারপর আসত দিস্তে দিস্তে ঘুড়ি – পেটকাটি চাঁদিয়াল...!

ছেলেবেলা – কানে ভেসে আসে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গলা, 'উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা, সূর্যের উজ্জ্বল রৌদ্রে, চঞ্চল পাখনায় উড়ছে' – আর চোখের সামনে খোলা নীল আকাশ, সত্যিই কলকাতার বুকে ঝাঁকে ঝাঁকে ওড়া পায়রার দল। সেই সেবার 'মণিহার' সিনেমা রিলিজ হ'ল; বয়সের অনধিকার দূরত্বে সিনেমাটা দেখতে না পেলেও 'নিঝুম সন্ধ্যায় পান্থ পাখিরা বুঝিবা পথ ভুলে যায়' গানটি কতবার পথ ভুলে আমাদের কানে ঢুকে পড়েছিল, তা আর আটকাবে কী করে!

ছেলেবেলা। মনে পড়ে স্কুল থেকে ফিরে দুপুরে কোনমতে দুটো ভাত খেয়ে মা-পিসিমার গা ঘেঁষে বসে গল্প শোনার তাড়া! কখনো সুখু-দুখু, কখনো বুদ্ধু-ভুতুম, কখনো ক্ষীরের পুতুল, কখনো বা উকুনে বুড়ি পুড়ে ম'ল। পিসিমা আবার বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলতেও খুবই দড় – তাই মহাভারত, রামায়ণের ফাঁকে ফাঁকে লক্ষ্মীপেঁচার নানান উপাখ্যানও মিলেমিশে যেত মহাকাব্যের মধ্যে। নিচ থেকে ফেরিওয়ালাদের ডাক শোনা যেত, 'চাবি, অ্যাই চাবি,' 'ছাতা সারাবে গো, ছাতা?' কিংবা 'ডাব-ডাব চাই, ভাল ডাব...'। কখনো কদাচিৎ হেমলিনের বাঁশিওলার মতো শোনা যেত 'আইসক্রীম, কোয়ালিটি আইস-ক্রী-ম'। এক ছুট্টে বারান্দায় গিয়ে তাকে হাত তুলে দাঁড়াতে বলে, মার হাতেপায়ে ধরা, 'পয়সা দাও, তাড়াতাড়ি দাও।' বেশিরভাগ সময়ে জুটেও যেত। শুধু নিজেরটুকু নিলে তো হবে না, আশেপাশে যারা আছে সক্কলের চাই। কখনো সখনো পিসিমাও আঁচলের কোণে বেঁধে রাখা পয়সা দিয়ে দিতেন ঐ মুঠোতে। সে ছিল এক অন্যরকম আনন্দ! আইসক্রীম পার্টির সঙ্গে গল্প শোনা আরও জমে উঠত।

বিকেলের দিকে হরিনাথদা যখন চা দিয়ে যেত সকলকে, তখন আমরা, ছোটরা চলে যেতাম ছাদে বা রাস্তার গলিতে – কানামাছি, লুকোচুরি বা এক্কাদোক্কা খেলার নেশায়। সহজ, সরল, অনাড়ম্বর, সাধারণ খুশিতে আর আনন্দে দিনগুলো ছিল ভরপুর। ছোট ছোট ছেলেদের পায়ে পায়ে পাড়া মাতিয়ে ছুটে বেড়াত রবারের বড় বল। শীতের দিন হলে ইঁট সাজিয়ে ক্রিকেট খেলা, একটা ব্যাট আর বল জোগাড় করতে পারলেই হ'ল।

আচ্ছা, আমার ছেলেবেলা কি একলা আমারই? আমার বুকে ঘুমিয়ে থাকা দিনগুলো, আধোজাগা বা অচেতনে শুধু কি আমার ব্যক্তিগত? এ যেন চেনা-জানা-অজানা, বন্ধু-স্বজন, পড়শী, ভুলে যাওয়া কত লোকের এক আশ্চর্য মিছিল মনের মুকুরে শরৎ মেঘের মতো ভেসে যায়। এর ছন্দে, বর্ণে, গন্ধে, রঙে মিশে আছে ষাটের দশকের পুরনো কলকাতা। আরও বিশদভাবে বলতে গেলে, সাবেকি ধাঁচের উত্তর ও মধ্য কলকাতা। শীতের দুপুরে ছাদে জেঠিমা, মা, বড়দি, নতুনদি, বড়বৌদি, ন'দি, সোনাপিসি, সকলে মিলে জমিয়ে আসর বসাত। বিরাট পরিবার, হাঁড়ি আলাদা কিন্তু ছাদ এক, গোত্র এক, প্রাণের টান এক। সকলের মধ্যমণি ছিলেন পিসিমা; নিঃসন্তান কিন্তু সংসারের সর্বময় কর্ত্রী, সকলের মাতৃস্বরূপা। পিসেমশাই মানুষটা খুব চুপচাপ ধরনের, তবে গোঁফের ফাঁকে হাসিটা সারাক্ষণ মুখে লেগে থাকা বিড়ির মতোই ঝুলত।

পিসিমা যে কতরকমের বড়ি দিতে, আচার বানাতে জানতেন তার ইয়ত্তা নেই। ছাদের একপাশে বড়দি বসে বসে কখনো উল, কখনো সুতো দিয়ে চটের ওপর আসন বুনছে, তার পাশে মেজবৌদি আর ন'দি হাতে তুফান তুলে বুনে চলেছে কতরঙা নানান মাপের সোয়েটার। আমার আর ইতুদির ছিল মাথাভরা লম্বা চুল, তাই কেউ না কেউ হাতের কাছে আমাদের পেলেই নানা ধরনের বিনুনি বেঁধে রূপচর্চার শখটাও মিটিয়ে নিত। বাকিরা ছাদের ঠিক মাঝখানটায় মাদুর পেতে বসে পিসিমার নির্দেশে নানান রকম বড়ি দিয়ে চলেছে – গয়না বড়ি, চাঁদ বড়ি, ঝুরো বড়ি, ঝোলের জন্য মশলা বড়ি, মটর ডালের বড়ি।

পাশে বড় বড় ডাব্বাভরা বাটা কলাই, মটর, মুসুর ডাল। আবার কিছু গামলাভরা জলও পাশে থাকত, দক্ষহাতে ওরা টুপটাপ বড়ি ভাসিয়ে দেখে নিত, ভাসল না ডুবল, তার ওপরেই নাকি নির্ভর করত, ডাল ফেটানো। পিসিমার দেওয়া বড়িগুলোই ছিল আমার সবচেয়ে পছন্দ; সবকটা ঠিকমতো নাকতোলা, শুঁড়তোলা – কোনোটা অন্যটার থেকে কম সুন্দর নয়। একটু দূরে বড় বড় বয়ামে আচার শুকোচ্ছে। আমরা ছোটরা জুলজুল করে তাকিয়ে থাকতাম সেইদিকে। সাদা ধুতি ছেঁড়া দিয়ে সযত্নে শক্ত করে মুখটা বাঁধা, আমাদের হাতসাফাইয়ের কোনো জায়গাই নেই।

আমি ছিলাম পিসিমার বড় আদরের। পাঁচ ভাইয়ের সূত্রে সাতাশজন ভাইপো-ভাইঝির মধ্যে সবার ছোট, সেটা এক বিরাট পাওনা! তাই কখনো কখনো, 'আয় তো টুসি, একটু চেখে দেখ' শুনলে প্রাণটা ভরে যেত। আমার ছোট ছোট দুহাত ভরে আচার চাখতে দিতেন পিসিমা, আর চোখের নিমেষে কোথা থেকে বাকি ভাগিদাররাও হাজির হয়ে যেত। পাছে ছোট বলে বাদ পড়ি, তাই পিসিমার কড়া নির্দেশ, 'আগে নিজে চেখে আমায় বল্, তারপর অন্যদের দিবি।' আমার চেখে দেখা মতামতের ওপরই যেন পিসিমার দুনিয়ার ভরসা! একেই বলে ভালবাসা অন্ধ।

রাতে ন'জেঠিমা আর আমাদের খাওয়া-দাওয়া একসঙ্গে হত, পিসিমারা তো আছেনই। তা, আমরা সকলে আর কাজের লোকজন মিলিয়ে জনা তিরিশ-পয়ঁত্রিশ তো হবেই। আটা মাখার পর, বিশাল কাঠের বারকোশে লেচি কাটতে কাটতে ডাক পড়ত আমার। তখন কতই বা বয়স, পাঁচ-ছ'বছর হবে। 'বল তো, ক'গণ্ডা হল?' এই হিসেবে চারের নামতা সবার আগে শিখে গেলাম। মনটা তখন সবুজ, চোখের আকাশ উজ্জ্বল নীল, মনের মাঝে নূপুর বাজিয়ে বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর, সারা দুপুর। আর রাতে খেতে বসে ঢুলতে ঢুলতে সন্ধ্যাতারার দেশে যাওয়ার পথগুলো জোনাকির মিটিমিটি আলোয় পরিষ্কার দেখা যেত। টুপটুপ শব্দগুলোতে কেমন যেন এক মাদকতা ছিল, যা ছোটবেলা থেকেই আমায় টানত। তখন কি জানতাম ঐ টুপজলে নদীও হয়, দু'কূল ভাসায়, ঘূর্ণিঝড়ের মতো উড়িয়েও নিয়ে যায়!

দুপুরবেলা ছাদের ওপর মজলিশে বসে পিসিমা বলতেন, 'আহা, মাথার ওপর ছাদ আর পাতে ভাত থাকলে ভাবনা কী রে আর?' গুলিয়ে যেত কথাটা; ছাদের ওপর তো আমরা বসছি, হাসছি, খেলছি, ছুটছি – আবার মাথার ওপর ছাদ কী করে হয় তবে? জিজ্ঞেস করলে হাসতেন, বলতেন, 'তোর মাথার ওপর শক্ত ছাদ থাকবে রে টুসি, ভাবিস না! এমন লক্ষ্মীমন্ত মিষ্টি মেয়ে তুই, ছাদ নিজে এসে হাতজোড় করে তোকে নিয়ে যাবে।' কথাগুলো একদম না বুঝলেও, পিসিমার বলার ধরনে, গলার মধ্যে এমন এক আশ্বাস আর নিশ্চিন্ততা থাকত যে তাতে মনটা আনন্দে টইটম্বুর হয়ে উঠত। রাতে শুয়ে যখন দেখতাম জোনাকিগুলো আকাশের তারার সঙ্গে মিলেমিশে চাঁদের সঙ্গে খেলা করত, তখন আমিও 'সেখানে কখন যাব' ভাবতে ভাবতে পিসিমার আঁচল ধরে নিমেষে গভীর ঘুমে কাদা।

স্বপ্নে মাঝে মাঝে অর্জুনদার মুখটা ভেসে আসত। গগনকাকার ছেলে অর্জুনদা। মনে হতো, সে যেন আমার জন্ম-জন্মান্তরের চেনা। ঠিক পিসিমার মতো। আধো ঘুমে ভাবতাম, তাহলে কি অর্জুনদাই ছাদটা নিয়ে আসবে? তা কী করে হয়, সেও তো বেশ ছোটই, অত ভারি জিনিস বয়ে আনতে পারবে তো?

ভাবতাম, সকাল হলেই ব্যাপারটা ভাল করে বুঝতে হবে পিসিমার কাছে। কিন্তু ভোরবেলা মা'র স্কুলে পাঠানোর তাড়াতে এইসব অতি প্রয়োজনীয় কথাগুলো কোথায় হারিয়ে যেত। সমবয়সী, অসমবয়সী দাদা-দিদি, স্বজন-বন্ধু, পড়শী অনেক ছিল আশেপাশে; ছিল তপন, টুকু, মিঠু, অতসী, মান্তু, রূপাদি, ইতুদি, অনু আর অর্জুনদা। যেদিন অতসী, অনু আর অর্জুনদা আসত, সেদিন প্রাণের মধ্যে ঝিলিক লাগত।

কেন জানি না, আমার লম্বা বিনুনি টানায় সকলেরই একটা অপরিসীম আনন্দ ছিল। ব্যথা লাগলেও কক্ষনো কারো কাছে নালিশ করিনি। চোখদুটো জলে ভরে যেত এই অত্যাচারে আর পিসিমা দেখতে পেলেই সকলকে বকুনি দিয়ে আমাকে উদ্ধার করতেন। বলতেন, 'টুসি, ভারী অভিমানী তুই, অত সব চেপে রাখিস না, রাগ করতে শেখ।' আমি পিসিমার কোলে মুখ গুঁজে ভাবতাম, আর কেউ না থাক আমার, তুমি তো আছ! তবে অর্জুনদা আমায় কোনোদিন কষ্ট দেয়নি। এমনকী আমার নামে মিছে কথা বলে বকুনিও খাওয়ায়নি। অবশ্য অতসীও তেমন করেনি, তবে খুব বকত অতসী আমাকে। বলত, 'টুসি, তুই বড় বোকা। সব কথা পিসিমাকে বলবি না, একটু চেপে রাখতে শেখ।' তখনকার মতো উদ্ধার পাওয়ার জন্য আমি অতসীর সব কথাতেই মাথা নাড়তাম। ঐ বয়সে কী দেখেছিলাম অর্জুনদার মধ্যে? কী দেখা যায় সেই প্রায় কৈশোর অবস্থায়? দেখেছিলাম ঘোর বর্ষায় ময়ূরের নাচ, জ্যৈষ্ঠের দুপুরে শরতের ধানক্ষেত, শীতের শুকনো পাতায় নূপুরের রিনিঝিনি।

সেই ছেলেবেলার এক সুখস্মৃতি বারবার মনে পড়ে। সেদিন অর্জুনদার উপনয়ন। যতদূর মনে পড়ে সেটা ছিল

জ্যৈষ্ঠ মাস, রবিবার। গগনকাকা বাবার মাসতুতো ভাই নয়নকাকার সহপাঠী। তখনকার দিনে এত আপন-পর ভেদাভেদ ছিল না। সম্পর্কটা ছিল আন্তরিক, আর হৃদয়ের টানের ওপর নির্ভর করে। গগনকাকার দুই ছেলে আর এক মেয়ে – অর্জুনদা, অনু আর অতসী। অর্জুনদা অতসীর চেয়ে বছর তিনেকের বড় আর অনু মাত্র এক বছরের। অনুকে অনু বলেই ডাকত অতসী, আমিও। মেরে, ধরে, কান টেনে, চুল ছিঁড়েও আমাদের দিয়ে সে অনুদা বলাতে পারেনি। কিন্তু আশ্চর্য, অর্জুনদাকে আমরা অদ্ভুত সমীহ করতাম। হয়তো ঐ বয়সে একটু সম্ভ্রমের চোখেই দেখতাম। অপূর্ব ভাসা ভাসা চোখ ছিল অর্জুনদার। মনে আছে যেদিন প্রথম অর্জুনদাকে চশমা পরা অবস্থায় দেখেছিলাম, অজান্তে কান্না পেয়েছিল ঐ চোখ ঢাকা পড়ে যাবে এই দুর্ভাবনায়! আর ছিল সামনের দাঁতে একটু ফাঁক – হাসলে কী সুন্দর লাগত! কিন্তু অর্জুনদা হাসত কম, কথাও বলত কম, ঐ বয়সের ছেলেদের তুলনায় গম্ভীর, শান্ত যেন নিজেতেই নিজে মগ্ন। পিসিমা বলতেন, 'অর্জুনটা বড় ভাল ছেলে, অনেক উন্নতি করবে' শুনে মনটা গর্বে ভরে উঠত। পড়াশোনায় দারুণ ভাল, মোটা মোটা বই পড়ে ফেলতে পারে, চোখে মুখে বুদ্ধির ছাপ, সেখানেই কেমন যেন এক দূরত্ব আর মুগ্ধতা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। অতসীও বলত, 'দাদার মতো হলে সবাই ভালবাসবে, অনুকে আর আমাকেই শুধু বকুনি খেয়ে মরতে হয়।' 'দাদার মতো হলে' কথাটা ঐ বয়সেও অনুরণন তুলত মনের কোণায়।

উপনয়নের দিনটায় খুব গরম, দুপুরে নেমন্তন্ন। মা বলল, 'একাই ঘুরে আসি, এত করে গগনদা বাড়ি এসে বলে গেল, না গেলে খারাপ দেখায়!' ঐ ঠাঠা রোদ্দুরে, সপ্তাহান্তের রবিবারের ভাতঘুম বরবাদ করতে বাবা যেতে রাজি নয় এবং আমারও ঘর অন্ধকার করে দিবানিদ্রা দেওয়াটা জরুরি, এরকম একটা শমন সঙ্গে সঙ্গে জারি হয়ে গেল। শুনেই আমার বুক ভেঙে কান্না পেল। একে অর্জুনদার পৈতে, তায় আবার অতসীর সঙ্গে খেলা, আর আমায় কিনা জানলার সব খড়খড়ি নামিয়ে দিয়ে ভরদুপুরে ঘুমোতে বলা হচ্ছে! প্রতিবারের মতো, এবারেও পিসিমা এসে বাঁচালেন, 'ছোট বউ, টুসি যেতে চায় তো নিয়ে যাও না? ছোটদের অত গরম টরমের বাই থাকে না।' মুখের ওপর কিছু বলতে না পেরে, একটু বিরক্ত হয়েই মাকে রাজি

হতে হ'ল।

যে কোনো জায়গায় যেতে হলে কোন জামা পরব এই নিয়ে আমার সঙ্গে মা'র একটা ছোটখাটো যুদ্ধ চলে। মা সেদিন যা বার করে দিল তাই মুখ বুজে পরে, আমি নিমেষে তৈরী। তারপর মা'র হাত ধরে রওনা হলাম। কত বয়স হবে তখন আমার? বড়জোর নয় কিংবা দশ! পরিষ্কার মনে আছে, জ্যৈষ্ঠের ঐ কাঠফাটা রোদ্দুর আমার দেহে মনে আনন্দের ঝিলিক তুলেছিল। আগুন হলকা হাওয়ায় অনুভব করেছিলাম আগুনের পরশমণি। বাড়ি থেকে বেরিয়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর দেরিটুকুও আর সইছিল না।

বাস থেকে নেমে একটু হাঁটাপথের পর গগনকাকা-নয়নকাকাদের বাড়ি। অতসী ছুটে এসে দরজা থেকেই আমাকে নিয়ে ভেতরে চলে গেল। এখনো মনে আছে, হালকা গোলাপী রঙের একটা শাড়ি গাছকোমর করে পরেছিল সে। চুলটা ঝুঁটি করে বাঁধা, তাতে বোধহয় জুঁই-এর মালা। আর সেখানে আমি সাধারণ একটা ফ্রক পরে অতসীর পাশে নিতান্তই বেমানান। ওদের বাড়িটা ছিল বিশাল, উত্তর কলকাতার আর পাঁচটা বনেদী বাড়ির মতোই। বাড়ির অনেক শরিক বলে মালিক-ভাড়াটের ভেদাভেদ ছিল না। তবে যৌথ পরিবারের ভগ্নাংশের ছাপ প্রতিটি ইঁটের গায়ে গাঁথা। অথচ কী অদম্য আকর্ষণ ছিল আমার ঐ বাড়িটার প্রতি; যেন কোনো রোমহর্ষক, রহস্যময় জাদু চুম্বকের মতো টানত। এখানে একটা দালান, তার ওপাশে দু-চারটে সিঁড়ি, তার একদিকে শ্যাওলা-পড়া কলতলা, উঠোনে একটা ভাঙা বালতিতে বেড়ে ওঠা তুলসীগাছ, চৌবাচ্চা, আবার হয়তো কোনো শরিকের রান্নাঘর – এক কথায় কোনো ছিরিছাঁদই নেই। অথচ আমার চোখে ওটাই ছিল অপূর্ব। ওদের বাড়ি গেলে এ-সিঁড়ি ও-সিঁড়ি দিয়ে লুকোচুরি খেলতে খেলতে আমরা যেন মায়াপুরীর স্বর্গদ্বারে ঢুকে পড়তাম। এর তুলনায় আমাদের বাড়িটা বাঁধা গতে ফেলা, আয়তনে বড় কিন্তু কোনো মজা নেই, ঐ বিশাল ছাদটুকু ছাড়া।

অতসীরা থাকত তিনতলার ছাদের ওপর কোনো একটা বড় ঘরে। কিন্তু সেদিন আমাকে টেনে নিয়ে দোতলার দিকে চলল। মনে হ'ল, এদিকটায় একেবারেই আসিনি। জিজ্ঞেস করায় আমার কানের কাছে মুখটা এনে এদিক ওদিক চেয়ে ফিসফিস করে অতসী বলল, 'শোন টুসি, এদিকটায় এখন কেউ নেই, কিছুক্ষণ কেউ আসবেও না। দাদা বলেছে, 'টুসি এলেই চুপিচুপি আমার কাছে নিয়ে আসবি। চল চল, আগে দেখা করে নে!' আমি আকাশ থেকে পড়লাম। এত গন্যিমান্যি নিমন্ত্রিত অতিথি, গুরুজন থাকতে যার নিজের উপনয়ন, অর্থাৎ নাটকের স্বয়ং নায়ক, আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে? এ তো ঈশ্বরকে পাওয়ার থেকেও বড় পাওনা! মনটা নিমেষে আনন্দে আটখানা। তাও আবার নায়ক আর কেউ না, আমার অর্জুনদা! এমন অসাধারণ প্রাধান্য পেয়ে বারবার মনে হ'ল, ভাগ্যিস মার সঙ্গে এসেছিলাম। কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয়েও বুকটা ভয়ে ঢিপঢিপ করছে। অতসীকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন রে, কী হয়েছে? আর এখানে কেউ নেইই বা কেন?' অতসী আমার কথায় হেসেই সারা, 'তোরা তো ব্রাহ্মণ নোস, তাই জানিস না; এই সময় তিনদিন একা একা অন্ধকার ঘরে থাকতে হয়, কারো যাওয়া বারণ, মুখ দেখাও।'

- 'তবে?' আমি ভয়ে ভয়ে বলি, 'মুখ দেখা বারণ?'

- 'ভাবিস না, আমি ঠিক ব্যবস্থা করব।' অতসীর বয়স আমার সমান হলেও, ওর মধ্যে একটা গিন্নিবান্নি ব্যাপার আছে, বেশ ভরসা করা যায়। আমি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ওর পিছু পিছু যেতে লাগলাম। দোতলার জাফরির পাঁচিল তোলা লম্বা বারান্দা, তাতে আবার রোদ্দুর তেরচাভাবে পড়ে কত রকম নকশা কেটেছে মাটিতে। অন্যদিন হলে ঐ নকশা দেখে আমি নতুন

আলপনার কথা ভাবতাম, কিন্তু সেদিন আমার মনে অজানা আশঙ্কা। বারান্দার শেষ প্রান্তে একটা বড় সবুজ দরজাওলা ঘরের সামনে অতসী থামল। আমাকে ইশারায় একটু দূরে দাঁড়াতে বলে, দরজায় টুকটুক করে ধাক্কা দিল। আমি নিরাপদ দূরত্ব রেখে দুরুদুরু বুকে বারান্দার জাফরি ধরে দাঁড়িয়ে

রইলাম| গনগনে রোদ্দুরের মধ্যেও আনন্দে, উৎকণ্ঠায় পায়ের কাঁপুনির সঙ্গে হঠাৎ ইতুদির গাওয়া প্রিয় গানটা মনে পড়ে গেল, 'তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ, মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে!'

অতসী দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় কী সব কথা বলে এসে আমায় বলল, 'চল চল, দাদা ডাকছে, ভেতরে যা|'

- 'তুইও চল| আমার ভয় করছে|'

- 'দূর বোকা, তোকে একা ডাকছে, আমি গেলে রাগ করবে|'

- 'আমি একা? কেন?' আমি ঢোঁক গিলে বললাম, 'অতসী, অর্জুনদাকে বলে দে পরে একদিন আসব|'

অতসী শুনে আর্তনাদ করে উঠল, 'খেপেছিস নাকি? দুদিন ধরে আমাকে আর অনুকে শুধু তোর কথা বলছে; বলেছে, টুসি এলেই চুপিচুপি এখানে নিয়ে আসবি, খুব দরকার| এখন তুই না গেলে, আমাকে পরে মার খেতে হবে না!'

অতসী আমাকে টেনে দরজার সামনে এনে দাঁড় করাল| গলা নামিয়ে বাইরে থেকে বলল, 'দাদা, টুসি এসেছে, ও কি ঘরে ঢুকবে?'

- 'হ্যাঁ, পাঠিয়ে দে| তুই বাইরে থাক, কেউ এদিকে এলেই আওয়াজ করবি| টুসিকে আসতে বল|'

ভয়ে ভয়ে এক পা এক পা করে এগোলাম| পা দুটো কাঁপছে, অর্জুনদাকে দেখতে ইচ্ছে করছে খুব; আর এই লুকিয়ে চুপিচুপি দেখার উত্তেজনা ভয়কেও ছাপিয়ে যাচ্ছে|

আমি দরজার ঠিক কাছটায় এসে, বাইরে থেকে ঢোঁক গিলে বললাম, 'আমায় ডেকেছ তুমি, অর্জুনদা?'

- 'হ্যাঁ, ভেতরে আয় টুসি, একা আসবি| অতসীকে বল বাইরে কাছাকাছি থাকতে|'

চোখের আড়ে অতসী বেশ বিরক্তি দেখাল| আমি এগিয়ে গেলাম ভেতরে; অন্ধকার ঘর, সব জানলা বন্ধ, এমনকী খড়খড়িগুলোও নামানো| দরজাটা বাইরে থেকে হালকা করে টেনে দিল অতসী| অন্ধকারে চোখটা একটু সইতেই দেখলাম সেই বড় বড় বিস্ময়মাখা চোখ, মুণ্ডিত মস্তক, পরনে ধুতি আর চাদর জড়ানো| সারামুখ ভাসানো হাসি, ঠিক মাঝখানের দাঁত দুটোয় একটু ফাঁক| সেই মুহূর্তে সেখানে আর কেউ ছিল না| ঠিক ঘরের মাঝখানে আমি একা অর্জুনদার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে| এগিয়ে এসে অর্জুনদা আমার দুটো হাত ধরল, তারপর ধুতির কোণা থেকে বার করল গরমে ভিজে যাওয়া, গলে যাওয়া একটা চকলেট| আমার হাতে সেটা দিয়ে অন্য হাতটা আমার মাথায় বুলিয়ে বলল, 'টুসি, রাগ করিসনি তো আমার ওপর?'

- 'রাগ কেন করব?' আমি হতবাক|

- 'সেই যে সেদিন সকলের সঙ্গে তোর বিনুনি ধরে টানলাম, তোর চোখদুটো ছলছল করে উঠেছিল| তোকে দেখে আমার খুব কষ্ট হয়েছিল, জানিস|'

- 'সে কী, আমার তো মনেই নেই, কতজনই তো সবসময় আমার চুল ধরে টানে| চিমটি কাটে, মারে – কী আর করি!'

- 'না রে টুসি, আমার সত্যিই ভারী কষ্ট হয়েছে; আর নিজের ওপর রাগও হয়েছে| তাই তো উপনয়নের চুল ফেলার সময় প্রথম প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তুই এলেই তোর কাছে আগে ক্ষমা চেয়ে নেব| এই চকলেটটা আমি দুদিন ধরে শুধু তোর জন্যই বাঁচিয়ে রেখেছি| তুই খা, একটু হাস, তাহলেই আমার মন ভাল হয়ে যাবে|'

আমি গলে যাওয়া চকলেটের দিকে বিস্ময় নিয়ে তাকালাম; হাসব কী, এবার আমার চোখে বর্ষা নামল|

অর্জুনদা তখনও বলে চলেছে, 'আর কোনোদিন তোকে কষ্ট দেব না| পিসিমা ঠিকই বলেন, তুই সত্যিই খুব লক্ষ্মী মেয়ে!'

হঠাৎ এই সময় আমাকে হাসার বদলে কাঁদতে দেখে অর্জুনদা ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'যা যা পালা, খেয়ে নিস চকলেটটা, চোখ মোছ, পালা, পালা|'

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো বেরিয়ে এলাম| কী পেলাম সেদিন? পেলাম এক আকাশ, পেলাম পায়ের তলার মাটি, গাছ, নীলদিগন্ত, জীবনের সব থেকে বড় ভরসা| পিসিমার বয়ানে, পেলাম জীবনের ছাদ| সেদিন নিজের করে, বড় আপনার করে পেলাম অর্জুনদাকে আর মনে প্রাণে বিশ্বাস করলাম, লক্ষ্মীমন্ত হলেই বুঝি জীবনটা হয় ভারী সরল, সুন্দর, ছাদঢাকা|

যুগের আর বয়সের সাথে সাথে সেদিনের ছেলেবেলার কত পরিবর্তন এসেছে| সেদিনের মধ্য-উত্তর কলকাতার মধ্যবিত্ত জীবনও আমূল পালটে গেছে| আর অর্জুনদারা গেছে কোথায় হারিয়ে| শুধু চুল টানার অপরাধে যে মানুষের অনুতাপের শেষ থাকত না, সেই মানুষগুলো কী জল দিয়ে আকাঁ ছবি? ধুয়ে, মুছে একেবারে নিশ্চিহ্ন আজকের

দুনিয়ায়? ছেলেবেলার ঘুম ভেঙে বড় হওয়ার বাস্তবে দেখি, কত সত্যবতী এসে বলছে, 'বংশ রক্ষা করতে হবে, হোক না ক্ষেত্রজ, মিলিত তোমায় হতেই হবে।' কত কুন্তী এসে বলছে, 'যা এনেছ ভাগ করে নাও' তাতে নারীর নারীত্ব থাকল না গেল কী যায় আসে? কত যুধিষ্ঠিরের দল, নিজের অক্ষমতা ঢাকতে অথচ লালসার লোভে চট করে হাত ধরে টান মারে নিজের পয়লা অধিকার জাহিরে, কত দুর্যোধন প্রকাশ্যে রজস্বলা তোমাকে-আমাকে টেনে এনে কাপড় খুলে দেয়। আর আমরা মেয়েরা আজও ভোগীর ভোজ্য হয়ে রই। লিঙ্গসাম্য, শ্রেণীসাম্য শব্দগুলো শুধু বইয়ের পাতায় ভূতের রাজার সঙ্গে নাচতে থাকে আপন উল্লাসে। দ্রৌপদী বা টুসি যদি উঁকি দিয়ে যায়, বাস্তবের অর্জুনেরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধতায় মুখ ঘুরিয়ে নেয়। অথবা মেতে ওঠে উলুপী, চিত্রাঙ্গদা বা সুভদ্রার বাহুবন্ধনে।

দুড়দাড় করে ভেঙে পড়ে যায় ছেলেবেলার ছাদ। একটা সমঝোতায় আসতে হয় জীবনে, বাস্তবে যার নাম আপোস। আর সেই আপোসকে জাপটে ধরে কোনোমতে চারটে খুঁটি বেঁধে আরেকটা ছাদ তৈরি করে নিতে হয় জীবনধারণের জন্য। সে এক অন্য রকম ছাদ!

Calcutta Then

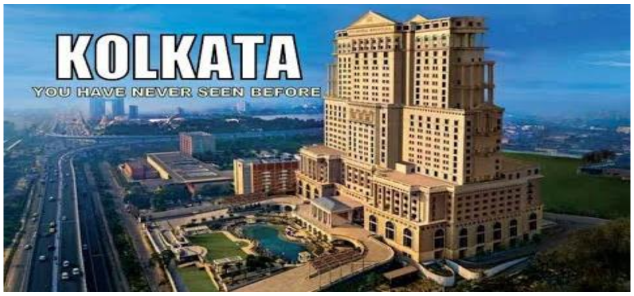

Kolkata Now

শালিনী আন্টির গল্প

বীরেশ্বর মিত্র

রবিবার বেলা দশটা। আমার কাছে অবশ্য সপ্তাহের সব দিনই রবিবার। রিটায়ার করেছি বছর সাতেক আগে। এখন এই কাগজ পড়াটাই সারাদিনের প্রধান কাজ। আজকে আবার স্পেশাল দিন। কলকাতার এক বন্ধু এক বান্ডিল বাংলা খবরের কাগজ পাঠিয়েছে। শীতকালে সকালের রোদ্দুরে আরাম কেদারায় বসে চা খেতে খেতে আনন্দবাজার পড়া। এর চার্মই আলাদা। ছয়ের পাতার নিচের দিকে একটা ছোট্ট খবরের শিরোনামের ওপর চোখ আটকে গেল – "বৃদ্ধাশ্রমে আবাসিকের মৃত্যু"। ঠাকুরপুকুরের একটি বৃদ্ধাশ্রমে পরিবার পরিত্যক্ত এক অশীতিপর মহিলা হঠাৎ মারা গেছেন। বাড়ির লোকেরা পাশেই বেহালা নিবাসী। তারা এতই নীচ যে মৃত্যুসংবাদ পেয়েও কেউ আসেনি। শুধু তাই নয়, তাঁর শেষকৃত্যের খরচ পর্যন্ত পাড়ার লোকেরা চাঁদা তুলে বন্দোবস্ত করেছে।

পড়ে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। বহু বছর আগেকার প্রায়-বিস্মৃত এক ঘটনা – শালিনী আন্টির গল্প, আবার ফিরে এসে আমার চোখের সামনে দাঁড়াল।

* * * * * * * * * *

পুনা শহরের জনবহুল পূর্ব উপপ্রান্ত ওয়াঘোলিতে অবস্থিত "ডাঃ আম্বেদকর বৃদ্ধাবাস"। নগর রোড থেকে একটি সরু রাস্তা দিয়ে ঢুকে প্রায় দু'কিলোমিটার যেতে হয়। জায়গাটার চারিদিকে একটু গ্রাম্য ভাব। রাস্তায় চার-চাকাওলা গাড়ির থেকে সাইকেল আর গরু-ছাগলের সংখ্যাই বেশি। অঞ্চলের প্রায় শেষপ্রান্তে একটি বিশাল দিগন্ত বিস্তৃত গমের ক্ষেত। সেই ক্ষেতেরই লাগোয়া ডাঃ আম্বেদকর বৃদ্ধাবাস।

পশ্চিমবঙ্গে যেমন অনেক রাস্তা, বসতি, স্টেশন, বাস স্ট্যান্ড ইত্যাদির নাম রাখা হয় রবীন্দ্রনাথ, নেতাজি, সুভাষ, রামকৃষ্ণ, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহাপুরুষদের নামে; মহারাষ্ট্রে তেমনি ছত্রপতি শিবাজী, ডাঃ আম্বেদকর, সেনাপতি বাপট প্রভৃতি নাম দিয়ে সাধারণত নামকরণ করার প্রথা বহুল প্রচলিত।

দু'তলা বাড়ি। তিরিশটা ছয় বাই আট-এর ঘর। কিছু

ঘরে দুজন, কিছু ঘরে একজন করে থাকার ব্যবস্থা। প্রত্যেক তলায় পাঁচটা কমন বাথরুম। তাছাড়া একতলায় আছে একটি বড় পনেরো বাই কুড়ির হলঘর। সেখানে একটি বড় টিভি ও পাশে খানদশ-বারো প্লাস্টিকের চেয়ার। কোনায় একটা টেবিলে কিছু স্থানীয় খবরের কাগজ। হলঘরের একপাশে ডাইনিং রুম ও কিচেন। অন্যপাশে একটি ছোট ঘরে অফিস। সেখানে বসেন মালিক, তথা ম্যানেজার, তথা করণিক মিসেস ভান্ডারকর। সাকুল্যে এই হ'ল সেই বৃদ্ধাবাস।

সঞ্জয় আমার অনেক দিনের বন্ধু। সঞ্জয় গোগাটে। তখন আমরা একসাথে এঞ্জিনিয়ারিং পড়তাম। মারাঠি ছেলে, কিন্তু আমার সাথেই বেশি ভাব। সঞ্জয়ের একটা খুব বড় গুণ হ'ল মানুষের প্রতি ওর ভালবাসা। সেই কলেজ জীবন থেকেই ও অনেক রকমের সমাজসেবামূলক কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেলত। আর ওর পাল্লায় পড়ে আমাকেও যেতে হতো ওর সঙ্গে। ভালই লাগত। কখনো আমরা খরা-কবলিত অঞ্চলে ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দিতাম। কখনো কোন অনাথ আশ্রমে গিয়ে সেখানকার ছোট ছেলেমেয়েদের অঙ্ক শেখাতাম। কখনো বা কোন গরীব স্কুলে গিয়ে সেখানকার উঁচু ক্লাসের ছেলেদের এঞ্জিনিয়ারিং এন্ট্রান্স পরীক্ষার ট্রেনিং দিতাম। মোট কথা কিছু না কিছুতে জড়িয়ে থাকতাম।

আমাদের অন্যান্য সহপাঠীদের সকলেরই কিছু না কিছু হবি ছিল। কেউ গানবাজনা বা কুইজ নিয়ে মেতে থাকত, কেউ বা ফুটবল, কেউ সিনেমা থিয়েটার। নিদেন পক্ষে একটা দুটো প্রেম। সঞ্জয় বা আমার সেরকম কোন হবি ছিল না। আমরা ওই সমাজ সেবার মধ্যে দিয়েই একটা পরিপূর্ণতা খুঁজতাম।

সেদিনটা আমার খুব মনে আছে। জুলাই মাস। আমাদের সেমিস্টারের পরীক্ষা সবে শেষ হয়েছে। সঞ্জয় বলল, একটা ভাল জায়গায় যাবি? অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ হবে। এরা সব পরিবার পরিত্যক্ত অথবা নিজের বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে। সমাজে এরা সবাই অপাঙক্তেয়। একেবারে একা। কথা বলার লোক পায় না। আমরা গেলে খুব খুশি হবে।

আমি বললাম, ঠিক আছে। তবে চল।

সেই দিনই বিকেলে আমরা দুজন পুনার বিখ্যাত ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে সঞ্জয়ের মোটর বাইক চড়ে গেলাম ওয়াঘোলিতে, ডাঃ আম্বেদকর বৃদ্ধাবাসে।

মিসেস ভান্ডারকরের সঙ্গে আলাপ হ'ল। সঞ্জয় অবশ্য আগে থেকেই চিনত। আমার সঙ্গে প্রথম আলাপ। মহিলার পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়স। কাঁচা পাকা চুল, একটু মোটাসোটা কিন্তু শক্ত সমর্থ চেহারা। স্বামী গত হয়েছেন অনেকদিন হ'ল। ছেলেপুলে নেই। এই বুড়ো বুড়িদের নিয়েই ওঁর সংসার। আলাপ করে ভালই লাগল। উনি বললেন পরের রোববার আসুন, সব আবাসিকদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।

পরের রোববার বিকেল চারটে নাগাদ আবার গেলাম। এবারে চার গায়ক বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে গেলাম। মিসেস ভান্ডারকরের সঙ্গে আগে থেকেই কথা হয়েছিল। উনি সবাইকে একতলার হলঘরে জড়ো করেছিলেন। সবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। বললেন, দেখুন এখানে যাঁরা থাকেন তাঁরা সকলেই আর্থিকভাবে মোটামুটি সচ্ছল। সবারই হয় পরিবার পরিজন নেই, কিংবা থেকেও নেই। তাই কেবল একটু লোকজনের সান্নিধ্য পেলেই এঁরা খুশি।

আমাদের গায়ক বন্ধুরা সব গান গাইল। অনেক হাততালি পড়ল। আমরা একসঙ্গে চা আর বড়াপাও খেলাম। আমরাই নিয়ে গিয়েছিলাম। ঘন্টা দুয়েক এইভাবে বেশ কেটে গেল।

দু'সপ্তাহ পরে মিসেস ভান্ডারকরের কাছ থেকে একটা ফোন এল – শুনুন ভাই, আমার আবাসিকরা তো একেবারে যাকে বলে আপ্লুত। আপনাদের সকলকে ওঁদের খুব ভাল লেগেছে। আসলে ওঁদের জীবনটা খুব ফাঁকা ফাঁকা লাগে। খুবই বোরিং। টিভি দেখে আর কাগজ পড়ে কত আর সময় কাটান যায় বলুন? ওরা অনুরোধ করছে আপনারা আবার আসুন। এবার ওরাও কিছু প্রোগ্রাম করবে।

গেলাম তার পরের রোববার। এবারে সঙ্গে সঞ্জয় ছাড়া আর দুই বন্ধু। তাদের মধ্যে একজন কুইজ করে আর একজন মাউথ অর্গান বাজায়। এবারের অনুষ্ঠানে আবাসিকরাও সক্রিয়ভাবে যোগদান করলেন। অন্যান্যদের মধ্যে মিসেস শালিনী ভোঁসলে বলে একজন সত্তরোর্ধ্ব মহিলা হারমোনিয়াম নিয়ে অসাধারণ দুটি হিন্দি ভজন গান গেয়ে আসর মাতিয়ে দিলেন। পরে শুনলাম এককালে আকাশবাণী রেডিওতে নাকি তিনি বহুদিন ধরে গান গেয়েছেন।

আমার বন্ধু বিকাশ মাউথ অর্গানে "ইয়ে আপনা দিল" আর

সাউন্ড অফ মিউজিকের "ডোরেমি" বাজিয়ে সবাইকে বেশ জমিয়ে দিল, আর ছিল কুইজ প্রোগ্রাম। প্রাইজ দেওয়া হ'ল ক্যাডবেরির এক লেয়ার, প্রাইজ পেয়ে সবাই খুশি। পরিশেষে বড়াপাও আর চা দিয়ে আসরের পরিসমাপ্তি হ'ল।

মিসেস ভান্ডারকর হাতজোড় করে বললেন আবার আসবেন। মিসেস ভোঁসলে সোজাসুজি এসে আমার হাত ধরে বললেন, শীগগিরই আবার এসো কিন্তু।

সঞ্জয় গোগাটে বলল, আসলে আমরা কাল সবাই মিলে দু'সপ্তাহের জন্য দিল্লি বেড়াতে যাচ্ছি। ফিরে এসে আবার দেখা হবে। সেই কথাই রইল।

আমরা বুঝলাম আমরা যেরকম ভেবেছিলাম এ জায়গাটা আসলে সে রকম মোটেই নয়। এখানে দু-তিন ধরনের মানুষ থাকেন। এক হচ্ছেন যাঁরা শারীরিকভাবে শক্ত সমর্থ এবং স্বামী-স্ত্রী মিলে ডবল রুমে থাকেন। শেষ বয়সে তাঁদের দেখভাল করার কেউ নেই। হয়তো ছেলে মেয়েরা বিদেশে থাকে কিংবা হয়তো পুত্রবধূর সঙ্গে বনিবনা হয় না।

আর একজনেরা আছেন যাঁরা পৃথিবীতে একদম একা। নিঃসন্তান, বিধবা কিংবা বিপত্নীক। শুধুমাত্র একাকীত্বের কষ্ট মেটাতে নিজের ইচ্ছায় এখানে থাকতে এসেছেন।

আর কিছু আছেন যাঁরা শারীরিকভাবে কিছুটা অক্ষম, বিষয় সম্পত্তি বিশেষ নেই, সংসারে যাঁদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। অতএব তাঁদের ছেলেমেয়েরা নিজেদের দায়িত্ব এড়াতে বৃদ্ধাশ্রমে চালান করে দিয়ে নিজেদের বিবেকের প্রতি দায়িত্ব পালন করে খালাস হয়েছে।

আগে এই বৃদ্ধাবাস ব্যাপারটার সম্পর্কে আমার কোন সম্যক ধারনাই ছিল না। দু-তিনবার যাতায়াত করে একটু আঁচ পাওয়া গেল। হয়তো সব বৃদ্ধাবাস এক রকম হয় না। খবর নিয়ে জানলাম সরকারী আশ্রমে সাধারণত অত্যন্ত গরীব ঘরের মানুষরাই আসেন। সমাজের নিম্নবিত্ত কিছু লোকেরা নাকি বুড়ো কিংবা অথর্ব বাপ-মাকে এই সরকারী আশ্রমে ফেলে দিয়ে যায়। তারপর তারা আর দেখতে আসে না। তবে এই ডাঃ আম্বেদকর বৃদ্ধাবাস কিন্তু মোটেও সেরকম নয়। প্রথমত এখানকার আবাসিকদের সকলেরই মোটামুটি সচ্ছল অবস্থা। তাঁদের আর যাই হোক পয়সার অভাব নেই। অনেকেই শারীরিকভাবেও সক্ষম। মাঝে মধ্যেই তাঁরা ইচ্ছে করলে অনায়াসে বাইরে ঘুরতে, বেড়াতে কিংবা সিনেমা দেখতে যেতে পারেন।

এক মহিলা তাঁর ঘরে আচার তৈরি করেন এবং সেগুলি একটি এন জিও-র মাধ্যমে বিক্রি করেন। কেউ কেউ বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজ বা সেলাইও করেন। সারা আবহাওয়াটাই একটু বয়স্কদের হস্টেলের মতো। সবাই মোটামুটি স্বচ্ছন্দে থাকেন।

দু'সপ্তাহ পরে দিল্লি থেকে ফিরে সঞ্জয় আর আমি আবার একদিন সেখানে গেলাম। আজকে কোনও গানবাজনা বা অন্যরকম অবসর বিনোদনের আসর ছিল না। কেবলমাত্র গল্প আর আড্ডা। হিসেবমতো আমরা বড়াপাও নিয়ে গিয়েছিলাম। চা-এর বন্দোবস্ত ওঁরাই করেছিলেন। মিসেস ভোঁসলে আমাকে দেখে খুব খুশি। প্রথমে একটু কিন্তু কিন্তু মনে হলেও সহজ হতে সময় লাগল না। পরে তিনি আমাকে আলাদা করে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। বসালেন। স্বামী গত হয়েছেন দশ বছর আগে। ছেলের তখন উনিশ-কুড়ি বছর বয়স। ওঁর একমাত্র ছেলে। আমার থেকে পাঁচ-সাত বছরের বড়। বউকে নিয়ে আমেরিকায় থাকে। ওঁকেও নিয়ে যেতে চেয়েছিল। খুব জোরাজুরি করেছিল। উনি যাননি। পুনা ছেড়ে উনি কোথাও যাবেন না। শেষমেষ এখানেই স্থিতি হয়েছে। ছেলে মাঝে মাঝে ফোন করে। কিন্তু আসতে আর পারে না। আমি অল্পবিস্তর মারাঠি ভাষা বুঝি, কিন্ত ভাল বলতে পারি না। উনি হিন্দি বোঝেন, কিন্তু খুব ভাল বলতে পারেন না। কাজেই সবরকম মিলিয়ে মিশিয়ে আমাদের গল্প হচ্ছিল। এককালে রেডিওতে গান করতেন। আমাকে একটা ভজন শোনালেন। আমার বাড়ির কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানলেন। শীগগিরই আবার আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেদিন বিদায় নিলাম।

তারপর থেকে আমাদের সম্পর্কটা বেশ স্বচ্ছন্দ হয়ে গেল। আমি মাঝে মাঝেই ওঁকে দেখতে যেতাম; কখনো কিছু ফলটল নিয়ে কখনো বা খালি হাতে। উনি আমাকে 'বেটা' বলে ডাকতে আরম্ভ করলেন। সেই ডাকটা বোধহয় আমার প্রাণেও অনুরণন তুলতে লাগল। বছর পাঁচেক আগে নিজের মাকে হারিয়েছি। ভোঁসলে আন্টি আমার মনের সেই খালি জায়গাটায় নিজের স্থান করে নিলেন।

সেই ঘটনার বেশ কিছুদিন পরে, আমার তখন সবে সিক্সথ সেমিস্টার শেষ হয়েছে, এক সন্ধ্যেবেলায় মিসেস

ভান্ডারকরের ফোন। আন্টির খুব শরীর খারাপ। খুব কাশি, জ্বর, গায়ে ব্যথা ইত্যাদি। সঞ্জয়ের মোটর বাইকটা নিয়ে ছুটলাম। গিয়ে দেখি আন্টি বিছানায় কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার এক ডাক্তারকে ডাকা হ'ল। উনি এক নজর দেখেই বললেন এক্ষুণি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। তখনই অ্যাম্বুলেন্স ডেকে, কাছাকাছির মধ্যে সবচেয়ে বড় হাসপাতাল, কলম্বিয়া এশিয়াতে ভর্তি করা হ'ল। ইনসিওরেন্স ছিল। অসুবিধা হ'ল না। মিসেস ভান্ডারকর আন্টির ছেলে শেখরকে আমেরিকাতে ফোন করে তৎক্ষণাৎ পুনায় আসতে বললেন। চারদিন আই সি ইউ-তে যমে মানুষে টানাটানির পরে আন্টির জ্ঞান ফিরল। পাঁচদিনের মাথায় শেখর এসে পৌঁছাল। ঘটনাচক্রে সেই দিনই ওঁকে প্রাইভেট বেডে দেওয়া হ'ল। ওঁর ছেলে এসে পড়ায় আমরা একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। আরো দিনকয়েক পরে আন্টি সুস্থ হয়ে উঠলে ওঁকে বৃদ্ধাবাসে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'ল।

ইতিমধ্যে আন্টি আমাকে ওঁর 'বেটা-সমান' বলে শেখরের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছেন। আমারও ছেলেটির সঙ্গে বেশ ভাল ভাব হয়েছে। দু'চার দিন পরে আমেরিকা ফিরে যাওয়ার সময় শেখর আমাকে অনেক ধন্যবাদ দিল। বলল আমি আন্টির পাশে থাকায় মাকে একা ফেলে যাওয়ার টেনশন এবং অপরাধবোধ দুটোই ওর লাঘব হয়েছে। শুনে খুব ভাল লাগল।

দিন কাটে। আমি আন্টির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখি, খবরাখবর নিই। আমাকে ছেলের মতোই দেখেন। একবার আমার জন্মদিনে ডেকে পাঠালেন। গিয়ে দেখি একেবারে কেক-টেক আনিয়ে অন্যান্য আবাসিকদের নিয়ে উনি একটা পার্টির আয়োজন করেছেন। সে এক ভীষণ হৃদয়ছোঁয়া অভিজ্ঞতা। নিজের মাকে হারিয়ে যে দুঃখটা পেয়েছিলাম সেটা অনেকাংশেই লাঘব হ'ল। এত আনন্দ আমি বহুদিন পাইনি।

মাস কাটে। ঋতু বদলায়। বছর ঘোরে। আমি চাকানে এক বিদেশী কম্পানিতে ট্রেনি এঞ্জিনিয়ার হয়ে ঢুকলাম। প্রথম বছর; কাজের ভীষণ চাপ। বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে যায়। অনেকদিন আর আন্টির সঙ্গে দেখা হয় না। অবশ্য ফোনে প্রায়ই কথা হয়।

এরই মধ্যে ডিসেম্বর মাসের এক শনিবার অনেক রাতে মিসেস ভান্ডারকরের কাছ থেকে একটা ফোন এল – তাড়াতাড়ি আসুন। মিসেস ভোঁসলের বুকে ভীষণ ব্যথা। আমরা অ্যাম্বুলেন্স ডেকেছি। কলম্বিয়া এশিয়া হাসপাতালে নিয়ে যাব। আপনি সোজা হাসপাতালে আসুন।

আমার নতুন কেনা মোটরবাইক নিয়ে সোজা হাসপাতালে পৌঁছালাম। তখন রাত সাড়ে বারোটা। এমার্জেন্সির ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার বললেন ম্যাসিভ হার্ট অ্যাট্যাক। আমরা চেষ্টা করছি; ওঁর যা বয়স তাতে কোনরকম অপারেশনের ঝুঁকি নেওয়া যাবে না। আপনারা বরং ওঁর বাড়ির লোকজনকে খবর দিন। আমার মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল। বাড়ির লোকজন মানে তো একমাত্র ছেলে। সে তো আমেরিকায়। খবর দিন বললেই হ'ল নাকি?

যাই হোক, ফোন করলাম। শুনে শেখর খুব উৎকণ্ঠা প্রকাশ করল। বলল একটু সবুর করো। দেখছি কী করা যায়।

ঘন্টাদুয়েক বাদে শেখরের ফোন এল। ক্রিসমাস সিজন চলছে, আগামী পনের দিনের মধ্যে কোনমতেই টিকিট পাওয়া সম্ভব নয়। তুমিও তো ওঁর ছেলেই প্রায়। তুমি যা ভাল বোঝ সেইমতো সিদ্ধান্ত নাও।

আন্টি আমাদের সিদ্ধান্ত নেবার সময় বা সুযোগ দিলেন না। হাসপাতালে ভর্তি করার পাঁচ ঘন্টা পরে উনি ইহলোকের মায়া ত্যাগ করে আমাদের সবাইকে কাঁদিয়ে চলে গেলেন।

শেখরকে খবরটা দিলাম। কান্নাকাটি করল। শেষমেষ বলল, দেখো যা হবার তা তো হয়ে গেছে। আমার পক্ষে আসা এখন কোনমতেই সম্ভব নয়। প্লিজ তুমি নিজের মা মনে করে ওঁর শেষ কাজগুলো করে দাও।

তাই করলাম। একহাতে চোখের জল মুছতে মুছতে অন্যহাতে ওঁর মুখাগ্নি করলাম। তুলাপুরের সঙ্গমে গিয়ে ওঁর অস্থি বিসর্জন দিলাম। তার পরের সপ্তাহে দিনকাল দেখে নাসিকে গিয়ে শ্রাদ্ধশান্তি করে মাথা নেড়া করে বাড়ি ফিরলাম। শেখরের কথামতো বৃদ্ধাবাসে গিয়ে সকলকে নিয়ে একটি শোকসভা করা হ'ল, এবং আন্টির আত্মার শান্তি কামনা করে সব আবাসিকদের খাওয়ানো হ'ল।

আর আমি, জীবনে দ্বিতীয়বার আরেক মাকে হারালাম।

রোমন্থন

সুজয় দত্ত

“উপস্থিত দর্শকমন্ডলীকে অনুরোধ, আপনারা সবাই আসন গ্রহণ করুন, আমাদের অনুষ্ঠান আর কিছুক্ষণের মধ্যেই...”
চুঁই-ই-ই... এক তীক্ষ্ণ, ধাতব কান-ফুটো-করা শব্দে ঘোষকের কণ্ঠস্বর ডুবে যায়। মাইকটা মাঝে মাঝেই গন্ডগোল করছে আজ।
“আর কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু করতে চলেছি আমরা। এখনো যাঁরা গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন...”
আবার চুঁই-ই-ই-ই চোঁয়াও। ঘোষক এবার বেশ বিরক্ত। মাইক হাতে নিয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে যদি সাউন্ড সিস্টেমের দায়িত্বে থাকা লোকগুলোর কাউকে দেখতে পাওয়া যায়। মঞ্চের আশপাশে কারুর টিকিটিও দেখতে না পেয়ে তার অসহিষ্ণু স্বগতোক্তি, “ধ্যাত্তেরিকা! কোত্থেকে কোন ছাতার মাথা ডেকরেটার ধরে এনেছে... ” সজাগ মাইকের সৌজন্যে তা মাঠের চেয়ারগুলোয় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে থাকা সকলেরই কানে যায়। আমারও। আমি অবশ্য মাঠে নেই। দোতলার বারান্দা থেকে দেখছি সবকিছু। সঙ্গে আরো কয়েকজন। তারা অনর্গল গল্প করে চলেছে। ওদের ঠাট্টা-ইয়ার্কি, চুটকি-খুনসুটি শুনছি চুপচাপ আর মাঠের মাঝখানের সুসজ্জিত মঞ্চটার দিকে তাকিয়ে আছি অনুষ্ঠান শুরুর প্রতীক্ষায়।
অনুষ্ঠান মানে হীরক জয়ন্তী, আমার হাইস্কুলের। জীবনের দীর্ঘ এগারোটা বছর যে ‘L’ আকৃতির চারতলা বাড়ীটার করিডোরে, ক্লাসঘরে, ল্যাবে, লাইব্রেরীতে ছিল নিত্য যাতায়াত, তার গায়ে আজ নতুন রঙের প্রলেপ, পাঁচিলের লোহার গেটে ঝকঝকে নতুন সাইনবোর্ড, একতলায় নতুন তৈরী মাঝারি মাপের অডিটোরিয়ামে আমন্ত্রিত অভ্যাগতদের ভীড়। সারাদিন বক্তৃতা-টক্তৃতা সব সেখানেই, কিন্তু সন্ধ্যের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটা হবে মাঠের মঞ্চে, খোলা আকাশের নীচে সারি সারি চেয়ার পেতে। সংগঠক কমিটির সদস্যরা বুকে সবুজ-সাদা ব্যাজ এঁটে ব্যস্ত পদচারণায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। অবসরপ্রাপ্ত আর বর্তমান শিক্ষক শিক্ষিকাদের সবার গলায় জড়ানো সবুজ-সাদা উত্তরীয়। সকালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তাঁদের একে একে মঞ্চে ডেকে পুষ্পস্তবক আর বিশেষ স্মারক হাতে ধরিয়ে দেবার সময় গলায় পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল ওটা। স্কুলের এখনকার ছাত্ররা ইতিউতি জটলা পাকিয়ে গল্পগুজব করছে। তাদেরও পরনে সবুজ-সাদা ইউনিফর্ম। আর আছি আমরা – প্রাক্তনীরা। জন্মলগ্ন থেকে সুবর্ণ জয়ন্তী অবধি যত ছাত্র পাস করে বেরিয়েছে এই স্কুলের গেট দিয়ে, তাদের অনেকেই আজকের অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি। খুঁজে খুঁজে যোগাযোগ করে আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়েছিল আমাদের। আসতেই হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে সবুজ-সাদা সুতোয় বোনা সুদৃশ্য ঝোলাব্যাগ। গায়ে তার বড়বড় হরফে স্কুলের নাম, ভেতরে হীরক জয়ন্তীর স্যুভেনির আর খাবারের প্যাকেট। সব মিলিয়ে এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে স্কুল-কর্তৃপক্ষের আন্তরিক প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।
মাইকের টুকটাক গন্ডগোল সত্ত্বেও একসময় শুরু হ’ল সান্ধ্য-অনুষ্ঠান। প্রথমেই অবশ্য গানবাজনা নয় – একটি উদ্বোধনী ঘোষণা। স্কুলের প্রাক্তনীদের সংগঠন “বিগত ও বর্তমান” আন্তর্জালে জন্ম নেয় অল্প কয়েক বছর আগে। এর মধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে কলেবর বৃদ্ধি হতে হতে তার সদস্য সংখ্যা চার অংকে পৌঁছেছে। এই হীরক জয়ন্তী উদযাপনের মঞ্চ থেকে তাই তাকে সরকারীভাবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়া হ’ল। সেই উপলক্ষ্যে হেডস্যার প্রদ্যুম্নবাবুর নাতিদীর্ঘ ভাষণ, তারপর সংগঠনের তরফ থেকে সভাপতি আর সহসভাপতির ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচী নিয়ে দুচার কথা। আমি আরো অনেকের মতোই এই প্রাক্তনী সংগঠনের সাধারণ সদস্য। কোনো কমিটিতে বা দায়িত্বে নেই, তাই ভেতরের খুঁটিনাটি খবর সবসময় পাই না। শুনেছিলাম বটে এবছর নতুন সভাপতি আর সহসভাপতি বাছা হবে। আজ এখানে এসেই প্রথম চেহারা দেখলাম তাদের। কুশল ঘোষ আর চিরঞ্জিত রায়। কোষাধ্যক্ষও নতুন – বিশ্বদীপ সাহা। কী আশ্চর্য – তিনজনই আমার ব্যাচের! যদিও বহু দশক কোনো যোগাযোগ বা দেখা-সাক্ষাৎ নেই।
ঘোষকের ডাক শুনে সামনের সারির চেয়ার থেকে যে তিনটে চেহারা মঞ্চের দিকে এগিয়ে এল, তার প্রথমটা অবশ্য না চেনার কোনো কারণ নেই। বিরলকেশ, গোলগাল এই মুখটি প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো টিভি চ্যানেল বা খবরের কাগজে দেখা যায়। কখনো সাক্ষাৎকার, কখনো ভাষণ,

কখনো বা ভালমন্দ নানা খবরের শিরোনাম | ইদানীং মন্দই বেশী, বিশেষতঃ বছর পনেরো আগে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার পর থেকে নানা কেলেঙ্কারিতে বারবার নাম উঠে এসেছে গণমাধ্যমে | একবার স্বল্পমেয়াদী হাজতবাসও হয়েছে; আর মামলা-মকদ্দমা তো লেগেই আছে | কিন্তু কোনো কিছুতেই কুশল ঘোষকে ভাঙাও যায়নি, মচকানোও যায়নি | যাবে কী করে? গোড়া থেকেই রাজ্যের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের শীর্ষনেতৃত্বের সুনজরে | দফায় দফায় সেই দলের বিধায়ক-সাংসদ হওয়ার পর এবং মাঝে কিছুদিন পার্টির সঙ্গে মান-অভিমান-ছাড়াছাড়ির নাটকের পর এখন আবার দলে ফিরে রাজ্যকমিটির একজন কেউকেটা | সুতরাং মাথায় সুরক্ষার ছাতাটি বেশ মজবুত | দাপটও মানানসই | তাছাড়া নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি আর জনসংযোগ ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে সবসময় প্রচারের আলোয় থাকতে জানে, তাই জনপ্রিয়তাও কম নয় | অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে, বাবা ছিলেন ডাক্তার | প্রথম জীবনে সাংবাদিক হিসেবে ভালই নাম করেছিল ও | লেখার হাত মন্দ নয়, পারিবারিক সূত্রে জানাশোনার পরিধিটাও বেশ বড় | কিন্তু ওই – উচ্চাকাঙ্ক্ষীরা সবসময়েই আরো ওপরে ওঠার মই খোঁজে | ও-ও রাজনৈতিক মইটা পেয়েই সবকিছু ফেলে ঝুলে পড়ল | আর উঠলও তরতরিয়ে | কারণ নাচতে নেমে ঘোমটা টানায় কোনোদিনই বিশ্বাসী নয় কুশল ঘোষ |

কুশলের পিছুপিছু ওই যে আরেকজন মঞ্চে উঠল, বয়সের দরুণ এখন একটু মুটিয়ে গেলেও তার চেহারা দেখলে বোঝা যায় যৌবনকালে পেটা শরীর ছিল | ঋজুদেহ ঈষৎ ন্যুব্জ, একটু খুঁড়িয়ে হাঁটছে, কানে ওটা কী? হিয়ারিং এইড নাকি? এই দোতলার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ঠাহর করা মুশকিল | পাশে দাঁড়ানো সুশান্তকে জিজ্ঞেস করে জানলাম রেলওয়েতে চাকরি করে চিরঞ্জিত রায় | আগে খড়্গপুরে অফিস ছিল, এখন কলকাতায় বদলি হয়ে এসেছে | একসময় কলকাতার দ্বিতীয় ডিভিশন লীগে চুটিয়ে ফুটবল খেলত | চাকরিটা সেই খেলার সূত্রেই পাওয়া | সম্প্রতি বিরাটিতে ফ্ল্যাট কিনেছে, সেখানেই বৌ-ছেলেমেয়ে নিয়ে ছাপোষা সংসার |

মঞ্চের উল্টোদিক দিয়ে যে বেঁটেখাটো মানুষটি একমাথা সাদা চুল আর চোপসানো চোয়াল নিয়ে সন্তর্পণে উঠে ধারের দিকের একটা চেয়ারে আস্তে আস্তে বসল, তাকে আমার সমসাময়িক প্রাক্তনীদের তুলনায় বেশ বুড়োটেমার্কা আর জীবন-বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে | কেউ না বলে দিলে আমি তাকে বিশ্বদীপ সাহা বলে চিনতে পারতাম কিনা সন্দেহ | শুনলাম একটা সরকারী চাকরি করে, কিন্তু অবস্থা খুব ভাল নয় | হাতিবাগানে পৈতৃক ব্যবসাটায় লালবাতি জ্বলল যখন, সেই বিপুল আর্থিক ক্ষতি সামলাতে নাকি প্রচুর ধারদেনা করতে হয়েছিল | তাই সংসার চালাতে একসময় দুটো চাকরিও করেছে | তবে শরীর ভেঙে যাওয়ার মূল কারণ ওটা নয়, সিগারেট আর মদ | ডাক্তারের হাজার বারণ সত্ত্বেও কোনোটাই যে ছাড়েনি, সেটা ওর ডাক্তারের মুখ থেকেই শুনলাম | স্কুলে এককালে আমাদের দু'বছরের জুনিয়র দেবমাল্য এখন ফ্যামিলি মেডিসিনের এম ডি, প্রাইভেট প্র্যাকটিস করে, পসার বেশ ভাল | ও-ই বিশ্বদীপের ডাক্তার, তাই এত হাঁড়ির খবর জানে | অনেক, অনেক বছর বাদে আমার দেখা পেয়ে দেদার বকবক করছিল | কথাপ্রসঙ্গে এগুলোও বেরিয়ে এল পেট থেকে |

মঞ্চে ওদের বক্তৃতা চলছিল | ব্যালকনিতে আমার ডানপাশে দেবমাল্য, আর বাঁ পাশে অরুণাভ নীচুস্বরে গল্প করেই যাচ্ছিল | কিন্তু সেসব কিছুই আর আমার কানে ঢুকছিল না | কারণ আমি তখন সেখানে নেই; মনের টাইম মেশিনে চড়ে পৌঁছে গেছি সাড়ে চার দশক আগের এক জুন মাসে | এই বাড়ীর চারতলাটা তখনও তৈরী হয়নি, নির্মীয়মাণ | চারদিকে পাঁচিলের ঘেরাটোপ নেই, খেলার মাঠটা আরও বড় | শহরের ব্যস্ত বড় রাস্তার ধারে হলেও টিয়াপাখি-সবুজ রঙের সেই স্কুলবাড়ীকে ঘিরে প্রচুর গাছপালা | একতলার এক্কেবারে কোণের ঘরটা ক্লাস টু | তার খয়েরী-রঙা কাঠের বেঞ্চিগুলোয় একপাল কচি কচি ছেলে সাদা জামা আর সাদা হাফপ্যান্ট পরে চুপচাপ বসে আছে (হ্যাঁ, তখন ইউনিফর্ম ছিল পুরো সাদা, সবুজের অনুপ্রবেশ অনেক পরে)| বিরাট বিরাট জানলা দিয়ে সকালের রোদ এসে পড়েছে তাদের মুখে | সকলের উদ্বিগ্ন দৃষ্টি ব্ল্যাকবোর্ডের সামনের টেবিলটার ওপর | সেখানে ক্লাস-টিচার আরতিদি হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষার ফলাফল লেখা কাগজগুলো গোছাচ্ছেন | একটু পরেই আমাদের দোর্দণ্ড প্রতাপ বড়দি প্রতি ক্লাসঘরে এসে ঘোষণা করবেন কারা কারা প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় হয়েছে |

ক্লাসে আমি একমাত্র নবাগত, ছ-মাস আগে এই ক্লাসেই ভর্তি হয়েছি সরাসরি। বাকিরা ক্লাস ওয়ান থেকে পাস করে আসা। তাদের বেশীরভাগের সঙ্গেই বন্ধুত্ব তো দূরের কথা, ভাল করে আলাপও হয়নি এখনো আমার। ওরা জানে না আমি এর আগে মন্টেসরি স্কুলের লোয়ার, মিডল আর আপার – তিনটে নার্সারীতেই খুব ভাল রেজাল্ট করে এসেছি। দিদিমণিরাও অনেকেই জানেন না সম্ভবতঃ, তাই আমার ওপর কারো কোনো প্রত্যাশা নেই। সুতরাং মিনিট পনেরো বাদে যেটা ঘটল, তাতে ক্লাসশুদ্ধ সবাই চমকে গেল। বড়দি জলদগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করে গেলেন এবার ফার্স্ট হয়েছি আমি। সেকেন্ড শৌভিক গুহ আর থার্ড অরিজিৎ বড়াল। আমার পাশে বসা ইন্দ্রনীল ফিসফিস করে জানাল গত বছর ক্লাস ওয়ানের ষান্মাসিক আর বার্ষিক দুটো পরীক্ষাতেই ওরা দুজন ফার্স্ট আর সেকেন্ড হয়েছিল। আমি জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম, তাহলে থার্ড হয়েছিল কে? কিন্তু তার আগেই সেই পিরিয়ড শেষের ঘন্টা বেজে গেল আর আমাদের সকলকে পিটি ক্লাসের জন্য মাঠে ছুটতে হ'ল, তাই আর জানা হ'ল না সেটা।

তবে সে-প্রশ্নের উত্তর পেতে খুব বেশী দেরী হ'ল না। পিটি ক্লাসের পর অংক, তারপরেই টিফিনের ছুটি। আমার তখনও বন্ধুবান্ধব তেমন জোটেনি বলে টিফিনের সময় কেউ খেলতে ডাকে না, তাই একা একা ক্লাসে বসেই টিফিন খাই। সেদিনও তাই করতে যাব, এমন সময় দরজা দিয়ে একটা ছেলে ঢুকে সটান আমার ডেস্কের সামনে দাঁড়াল। এর নামটা যেন কী? ঠিক মনে পড়ছে না, কারণ এর আগে মুখোমুখি আলাপ হয়নি, আর ও বসে আমার থেকে অনেকগুলো বেঞ্চি দূরে। তবে এটা লক্ষ্য করেছি যে ক্লাসে ও অন্যদের তুলনায় বেশী সরব আর সহপাঠীদের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলে যেন ও কোনো উঁচু ক্লাসের দাদা।

- "তুই কোত্থেকে আসিস রে?" আমার চোখে চোখ রেখে জানতে চাইল।

- "কেন?"

- "আরে, জিজ্ঞেস করছি, বলতে কী হয়েছে? বল।" গলায় কিঞ্চিৎ আদেশের সুর।

- "ফুলবাগান।"

- "সে আবার কোথায়? কোন কিন্ডারগার্টেনে পড়তিস আগে?"

কিন্ডারগার্টেন শব্দটার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। তাই চুপ করে রইলাম।

- "ধুত্তেরি, আগে কোনো একটা ইস্কুলে পড়তিস তো, না কী?"

- "ও, হ্যাঁ, মন্টেসরি শিশুনিকেতন।"

- "বাঃ! তা ক্লাসে শিশু হয়ে থাকলেই হয়। এরকম উড়ে এসে জুড়ে বসে মাথায় চড়ার কী দরকার?"

- "মানে? আমি তো..."

- "তোর জন্য – হ্যাঁ, তোর জন্য আমি এবার স্ট্যান্ড করতে পারলাম না, বুঝেছিস? আগের ক্লাসে দু-দুবার থার্ড হয়েছি। এবার তুই না থাকলে..."

- "সে আমি কী করব?"

- "অ্যামি কী ক্যারব্যা? কেন? তুমি গোল্লায় যাবে, গিয়ে আমায় উদ্ধার করবে। যত্তোসব... । যাকগে, হাফ-ইয়ার্লিতে যা হয়েছে হয়েছে, অ্যানুয়ালে আর কিছুতেই হতে দেব না।"

এই দাবড়ানি আরো কতক্ষণ চলত কে জানে, যদি না ঠিক এইসময় একদল ছেলে করিডোর থেকে হৈহৈ করে ঢুকে ওকে খেলায় টেনে নিয়ে যেত। যেতে যেতে বলে গেল, "আমার নাম কুশল ঘোষ। মনে থাকে যেন, কু-শ-ল-ঘো-ষ।" প্রতিটা শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে ডেস্কে একটা করে চাপড়।

সেদিন আমার টিফিন টিফিন-বক্সেই রয়ে গিয়েছিল। কারণ বাড়ীতে গুরুজনেরা আর স্কুলে দিদিমণিরা ছাড়া আমার সঙ্গে যে কেউ ঐভাবে কথা বলতে পারে – এই ব্যাপারটাই এত অভিনব আর অপ্রত্যাশিত যে সেটা হজম করতে করতে পরের ক্লাসের ঘন্টা পড়ে গেল। ক্লাসের মধ্যেও বারবার মনে প্রশ্ন জাগছিল, ও কোন বাড়ীর ছেলে? ওর বাড়ীতে আর কারা থাকেন? ও এরকম করে কথা বলা শিখল কার কাছে? ওকে কি যতদিন এই স্কুলে থাকব ভয় করে চলতে হবে? প্রথম তিনটে প্রশ্নের উত্তর আমি পরে একে একে পেয়েছিলাম। বড় হয়ে জেনেছিলাম ও কলকাতার এক বিত্তশালী এবং ক্ষমতাশালী পরিবারে মানুষ, দাদু কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি, বাবা নামকরা ডাক্তার। স্বাধীনতার পর থেকেই বঙ্গীয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকার ঐতিহ্য ওদের পরিবারের। বাড়ীতে প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাদের আর

অন্য সেলিব্রিটিদের নিত্য আনাগোনা। বুঝেছিলাম কেন আমাদের কাছে ধরাছোঁয়ার অনেক বাইরে হলেও সেই সেলিব্রিটিরা ওর কাছে নিছকই অমুক মামা বা তমুক মাসী। এমন পরিবেশে ছোটবেলা কাটালে নিজেকে সব ব্যাপারে বস্ বা নেতা ভাবতে শুরু করাটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু আমার চার নম্বর প্রশ্নটার ফয়সালা হয়ে গিয়েছিল অনেক তাড়াতাড়ি – সেই বছরেই অ্যানুয়াল পরীক্ষায়। সেই পরীক্ষা থেকেই আমি পাকাপাকিভাবে আমাদের ব্যাচের ফার্স্ট বয়ের তকমাটা দখল করে নিলাম; আর ও নানা কারণে ক্রমশঃ তলিয়ে গেল পড়াশোনায়। সুতরাং বলাই বাহুল্য, পরবর্তী দশ বছর ওকে ভয় করে চলার ব্যাপারটা আর ছিল না। এটাও সত্যি যে একদম ছোট থেকেই ওর রাজনীতি সচেতনতা, সব ব্যাপারে নেতৃত্ব দেবার প্রবণতা, তর্ক করে বা গলার জোরে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করার ক্ষমতা – এসব দেখে আন্দাজ করা শক্ত ছিল না বড় হয়ে ও কী হতে চলেছে। কাদার দাগ আর পাঁকের দুর্গন্ধ আখেরে কার গায়ে কতটা লাগবে, সেটা অবশ্য কৈশোরে বা বয়ঃসন্ধিতে পুরোপুরি বোঝা নাও যেতে পারে। নির্ভর করে পরবর্তী জীবনের ওপর।

স্কুলজীবনে আমরা প্রায় সবাই-ই একটুআধটু খেলাধুলো করেছি। টিফিনের সময় বা ছুটির পরে স্কুলের মাঠে রবারের ফুটবলে লাথি মারা, ক্যাম্বিসের বলে ক্রিকেট খেলা আর অ্যানুয়াল স্পোর্টস মীটে টুকটাক পুরস্কার পাওয়া – আমাদের বেশীরভাগের দৌড় ছিল এই অবধি। কিন্তু সেই দলে মোটেই পড়ত না পাইকপাড়ার চিরঞ্জিত রায়। খেলা পাগল পরিবারের ছেলে, একদম ছোট বয়স থেকে বাড়ীর বড়দের সঙ্গে ময়দানে ফুটবল দেখতে যেত, উঁচু ক্লাসের ছেলেদের সঙ্গে ক্রিকেট ম্যাচে একার বিক্রমে দলকে জেতাত, ক্লাস সিক্স থেকেই আমাদের ক্লাসের ফুটবল দলের অধিনায়ক। একবার এক ছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যুতে তার নামে স্মৃতি-টুর্নামেন্ট চালু করল স্কুল। ব্যস, প্রথমবারেই ওর নেতৃত্বে আমরা রানার্স। শুধু তাই নয়, পরের বছর অর্থাৎ ক্লাস নাইনে একেবারে চ্যাম্পিয়ন, আর ও টপ স্কোরার। স্কুলের সিলেবাসের বাইরে আলাদা করে যোগব্যায়াম বা শরীরচর্চা ওকে কোনোদিন করতে দেখিনি, কিন্তু সহপাঠীদের তুলনায় অসম্ভব ফিট চেহারা ছিল আর চোট-আঘাত সইতে পারত খুব। তুমুল বর্ষায় স্কুলের কাদা-প্যাচপ্যাচে মাঠে ওর বল কন্ট্রোল আর গতি দেখে আমাদের পিটি টিচার একবার নিজে উদ্যোগ নিয়ে ওকে পাঠিয়েছিলেন কলকাতা ময়দানের কিংবদন্তী কোচ প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে অনূর্ধ্ব-পনেরো প্রশিক্ষণ শিবিরে।

এহেন চিরঞ্জিতের সঙ্গে আমার প্রথম মুখোমুখি আলাপ একটা মজার ঘটনার মধ্যে দিয়ে। ক্লাস ফাইভে। তার আগে অবধি আলাপ-পরিচয় না হওয়ার কারণ আমাদের প্রত্যেক ক্লাসে দুটো করে বিভাগ থাকত, যারা আলাদা আলাদা ক্লাসঘরে বসত, আর ঘটনাচক্রে ও সবসময়েই ছিল আমার উল্টো বিভাগে। একদিন দুপুরবেলা ছুটির পর স্কুলের মাঠের একদিকে গোলপোস্টের পিছনে দাঁড়িয়ে এগারো আর বারো ক্লাসের ফুটবল ম্যাচ দেখছি। হঠাৎ একটা দুরন্ত গতির শট গোলকিপারের নাগাল এড়িয়ে সোজা আমার দিকে ধেয়ে এল। আমার অল্প বয়স থেকেই চোখে চশমা, সেটা বাঁচাতে তাৎক্ষণিক প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় দুহাতের চেটো দিয়ে প্রাণপণে ফিস্ট করলাম বলটাকে। কিন্তু শটে এত জোর ছিল যে তার অভিঘাতে ছিটকে পড়লাম মাটিতে। সাদা ইউনিফর্মে জলকাদা লেগে একাকার। কে যেন এসে টেনে তুলল আমায়। মুখ তুলে দেখি আমাদেরই ক্লাসের সেই সুন্দর চেহারার ছেলেটা, যে স্পোর্টসে অনেক প্রাইজ পায়।

- "আরেঃ, কী দিলি একখানা! তুই গোলে খেলিস নাকি? দেখিনি তো কখনো।"

- "না না, আমি ওসব..."

- "এদেরটা শেষ হলেই আমরা ম্যাচ খেলব। গোলকিপার হবি তুই?"

- "কিন্তু আমার যে..."

- "কাদা তো মেখেই আছিস। অসুবিধেটা কী? পায়ের জুতো-মোজাটা খুলে নিস্ শুধু।"

এইভাবেই ওর দৌলতে আমার জীবনে প্রথম ফুটবল খেলতে নামা। এরপর ডে সেকশনে, মানে ক্লাস সিক্সে ওঠার সময় থেকে আর কখনো মাঠে নামার সুযোগ পাইনি ঠিকই (কারণ পিটি টিচার ট্রায়াল দিয়ে বেছে বেছে টিম করতেন), কিন্তু সেই থেকে ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। খেলাধুলোয় নিবেদিতপ্রাণ, পড়াশোনাটা তেমন মন দিয়ে করত না কখনোই, কিন্তু বছর বছর ভালভাবেই পাস করে যেত। আমার আবার, সত্যি বলতে

কী, খেলাধুলোটা কোনোদিনই ঠিক আন্তরিক আগ্রহের বা স্বাচ্ছন্দ্যের জায়গা ছিল না। এজন্য ও মাঝেমাঝে আমার ওপর হতাশ হয়ে বিজ্ঞ জ্যাঠামশাইয়ের মতো বলত, "এখন এরকম কুঁড়েমি করছিস তো, বুড়ো হলে বুঝবি। বাতের ব্যথায় খোঁড়াবি, শরীর রোগের ডিপো হবে।"

এমনি করেই আমরা একদিন বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছালাম। গাল, থুতনি আর ঠোঁটের ওপরের জমি উর্বর হয়ে উঠল। সহপাঠীদের কারো কারো আচার-আচরণে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এল। অর্থাৎ স্কুলের পাঁচিলের উত্তরপূর্ব ধারে নবনির্মিত হলুদ রঙের বিল্ডিংটার প্রতি নজর ও মনোযোগ হঠাৎই খুব বেড়ে গেল। কারণ ওটা গার্লস স্কুল। সরস্বতী পুজোর দিন ঠাকুর দেখার অজুহাতে বা রবীন্দ্রজয়ন্তীর আগে নেমন্তন্ন করতে যাওয়ার অজুহাতে ওখানে ঢুঁ মারা চাইই চাই। তাছাড়া অনেকেই দেখলাম তামাকু সেবনের "উপকারিতা" বুঝে ফেলেছে, আর বাজারচলতি বাণিজ্যিক হিন্দী সিনেমার নায়িকাদের নিয়ে উৎসুক আলোচনাটা একটু বেশী গভীরতায় চলে যাচ্ছে মাঝেমাঝে। চিরঞ্জিত অবশ্য কোনো ব্যাপারেই ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করার পাত্র নয়। ওর লক্ষ্য উঁচুতে। হ্যান্ডসাম চেহারা, খেলাধুলো করে, দারুণ মিশুকে আর হাসিখুশী – এমন "এলিজিবল" ভ্রমরের মধু খুঁজে পেতে আর কতক্ষণ? ক্লাস টেন তখন আমাদের। সরস্বতী পুজোর সমস্ত আয়োজন আর সাজানো-গোজানোর ভার আমাদের ব্যাচের ওপর। সেইজন্য পুজোর আগের দিন বিকেলে আমরা দল বেঁধে স্কুল প্রাঙ্গণে গিয়ে জোগাড়যন্ত্র করছি। এমন সময় সুরজিৎ এসে উত্তেজিত স্বরে আমায় বলল, "বৃষ্টি এসেছে।"

- "সেকি? একটু আগেই তো দেখলাম পরিষ্কার ঝকঝকে আকাশ – "

- "আরে দূর! ওই বৃষ্টি নয়।"

বৃষ্টি যে অনেক রকম হয় সেটা আমি জানি; পুষ্পবৃষ্টি, উল্কাবৃষ্টি, করুণাবৃষ্টি, বোমাবৃষ্টি ইত্যাদি... কিন্তু সেগুলোই বা এখন হবে কী করে? আমাকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চুপ করে থাকতে দেখে ও বলল, "চিরুর গার্লফ্রেন্ডের নাম বৃষ্টি, তুই জানিস না?"

- "চিরু? মানে চিরঞ্জিত? গার্লফ্রেন্ড? কই, না তো!"

ওর পিছুপিছু গিয়ে দোতলার বারান্দা থেকে উঁকি মেরে দেখি স্কুলের গেটের কাছটায় একটা ছিপছিপে চেহারার মেয়ে হাতে ব্যাগ নিয়ে দাঁড়িয়ে। আধুনিক পোশাকআশাক, স্মার্ট দেখতে। পরে শুনেছিলাম চিরঞ্জিতের বাড়ীর কাছেই থাকে, পাঠভবনে পড়ে। ব্যাপারটা জানার পরে আমাদের বন্ধুমহলে বেশ হৈচৈ পড়ে গেল, কারণ আর কারুর এই সৌভাগ্য তখনও হয়নি। এর মাস তিনেক পরে এক রবিবার বিকেলে কৌশিক এল সাইকেল নিয়ে আমাদের বাড়ী, আমার কয়েকটা নোটখাতা নিতে। এসেই বলল, "জানিস, আজ একটু আগে ত্রিকোণ পার্কের মোড়ে সেই গাছতলাটায় দেখি শিউলি।"

- "চ্যাংড়ামি হচ্ছে? এই চৈত্রমাসের ভরদুপুরে একটা বটগাছ তলায় তুই শিউলিফুল পড়ে থাকতে দেখলি?"

- "পড়ে থাকবে কেন? দেখলাম দাঁড়িয়ে আছে।"

- "মানে?"

- "মানে খুব সিম্পল। নিবেদিতা স্কুলের ক্লাস টেনের শিউলি সরকার দাঁড়িয়ে আছে বাসের জন্য। ২২১ নম্বর ধরবে বোধহয়, মৌলালিতে যাবে। রোববার চিরু ওখানেই কোচিং-এ পড়তে যায়।"

আবার চিরু! আমি তো শুনে থ! এই সেদিন না বৃষ্টিতে ভিজছিল? এখন আবার শিউলি? এ যে দেখি ট্রাপিজ মাস্টার; ধরছে আর ছাড়ছে। নাকি ছাড়ছে না, সবকটাকেই একসঙ্গে ধরে রেখেছে? তাও আবার ঋতু মিলিয়ে মিলিয়ে। প্রথমে বর্ষা, তারপর শরৎ। এর পরের জন কি তাহলে হবে হৈমন্তী?

যাইহোক, অতটা কাব্যিক না হলেও টেন থেকে টুয়েলভ – এই দুবছরে অন্ততঃ আধ ডজন বান্ধবীকে ধরা-ছাড়ার পর শুনেছিলাম কলেজে গিয়ে "চেতনা" হয়েছে ওর। মানে চেতনা চৌধুরী আর কি! ওর সপ্তম। জানি না তার কাছেই শেষ অবধি বাঁধা পড়েছিল কিনা। ওকে কোনোদিনই কোথাও বাঁধা পড়ার ছেলে বলে মনে হয়নি আমার। স্কুলে সবাই যখন জিজ্ঞেস করত, "কিরে, বিয়ের নেমন্তন্ন পাব কবে?" ও নির্বিকার মুখে বলত, "বিয়ে আবার কী? আমি শুধু পাস্ খেলে যাব, ওয়াল পাস্, ব্যাকপাস, থ্রু পাস্... ।" সেই চিরঞ্জিত নাকি এখন তিন ছেলেমেয়ের বাবা! বিরাটির ফ্ল্যাটে তার নাকি ছাপোষা সংসার! ভাবা যায়?

আমাদের স্কুলে কখনোই কোনো নির্দিষ্ট নিয়মনীতি মানা হতো না ক্লাসে কে কোথায় বসবে সে-ব্যাপারে। ক্লাস শুরুর আগে যে যখন আসবে, সে তার পছন্দমতো কোনো একটা খালি

জায়গা বেছে নেবে। ফলে আমার মতো যারা প্রতিদিন অনেক আগেই হাজির হতো স্কুলে, তাদের পোয়াবারো। অবাধ বাছাবাছির সুযোগ। আমি অবশ্য রোজ একটা নির্দিষ্ট জায়গাই বাছতাম – প্রথম সারির বেঞ্চের একটা নিভৃত কোণ। কিন্তু আমার পাশে কে বসবে সেটা আদৌ আমার ইচ্ছের ওপর নির্ভর করত না। একদিন হয়তো এমন কাউকে পেলাম যে সারাক্ষণ অনর্গল কথা বলে, আর তার প্রগলভতায় জন্য টিচারের বকুনি খেতে হয় আমাকেও। অন্যদিন হয়তো ক্লাসের সবচেয়ে শান্তশিষ্ট, নিশ্চুপ ছেলেটাকে। আমার প্রথম বছরে, অর্থাৎ ক্লাস টু-তে, একদিন একটা বেঁটেখাটো ছেলে শেষ মুহূর্তে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে ধপাস করে পাশের ডেস্কটায় বসেই আঁতকে উঠল, "ইসস, কী ধুলো! প্যান্টটা নষ্ট হয়ে গেল।" তারপর দাঁড়িয়ে উঠে পকেট থেকে একটা রুমাল বার করে বেঞ্চের ধুলো ঝাড়তে লাগল। কয়েক মুহূর্ত পরে আমার দিকে চোখ পড়ায় বলল, "তোমার প্যান্টেও লেগেছে। দেখবে বাড়ী গিয়ে।" আমার একটু অদ্ভুত লাগল, কারণ প্রথমতঃ ক্লাসের আর কেউ আমাকে "তুমি" করে কথা বলে না, আর দ্বিতীয়তঃ জামাপ্যান্টে ধুলো লাগা নিয়ে এত বিব্রত হতে আমার বয়সী কাউকে এর আগে দেখিনি। বললাম, "ও ঠিক আছে। কেচে নিলে কালকেই পরিষ্কার হয়ে যাবে।" "অত সোজা না। টেরিকট-এর প্যান্টে ধুলোময়লা চট করে উঠতে চায় না। লন্ড্রিতে দিতে হবে।"

'লন্ড্রি' বস্তুটা কী, সেটা আমার কাছে তখন অজানা ছিল, তাই আর কথা বাড়ালাম না। ও-ই আবার বলল, "তাতেও না হলে কোনো ভিখিরি-টিখিরিকে দিয়ে দিতে হবে। আমি এমনিতেই সপ্তাহে এক প্যান্ট দুবার পরি না।"

এই সময় ক্লাসটিচার এসে রোলকল করতে শুরু করায় কথোপকথনে ইতি পড়লেও আমার মাথার মধ্যে চিন্তাটা ঘুরপাক খেতে থাকল। খেলতে গিয়ে কাদা লেগেছে বলে বা কোনো অপরিচ্ছন্ন জায়গায় বসায় একটু নোংরা হয়েছে বলে আমার কটা প্যান্ট ভিখারীদের দিয়ে দিয়েছি, সেটা কিছুতেই মনে করতে পারলাম না। আর সপ্তাহের ছ'দিন ছ'টা আলাদা আলাদা প্যান্ট? আমার সাকুল্যে দু-সেট ইউনিফর্ম। একটা দুদিন পরলে যখন কাচতে যায়, তখন অন্যটা পরি, এইভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। যাইহোক, রোলকলের সময় জানলাম ছেলেটার নাম বিশ্বদীপ সাহা। তারপর থেকে স্কুল শুরুর আগে বা ছুটির সময় ওর বাড়ীর লোকেদের যে এক ঝলক দেখতে পেতাম, তাতে একটা জিনিস সেই কচি বয়সের কাঁচা বুদ্ধিতেও পরিষ্কার বুঝতে পারলাম। ওর আর আমার জীবনযাত্রা অনেক আলাদা। ওকে রোজ সকালে ওর বাবা গাড়ী করে নামিয়ে দিয়ে যান। দুপুরে মা নিতে আসেন গাড়ী করে, এবং বেশীরভাগ দিনই সে দুটো গাড়ী এক নয়। ক্লাসে ও দামী দামী খাতা, পেন্সিল, রুলার, ইরেজার ব্যবহার করে, আমার মতো মুদির দোকানের 'বঙ্গলিপি' খাতা আর 'নটরাজ' পেন্সিল নয়। টিফিনে ও সাধারণতঃ যা নিয়ে আসে, সেসব জিনিসের সঙ্গে আমার কোনো পরিচিতিই নেই। তবে টিফিনের ব্যাপারে ওর একটা মজার অভ্যেস ছিল, বদলাবদলির। কোনোদিন হয়তো আমার পাশে বসেছে, টিফিনের সময় আমার বাক্সের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি এই অরেঞ্জ স্পঞ্জকেকটা তোমাকে দিয়ে দিলে তোমার ওই নারকোল নাড়ুদুটো নিতে দেবে?" শুধু আমার সঙ্গে না, অন্যদের সঙ্গেও করত এই বিনিময়। সত্যি বলতে কি, এমন করত বলেই ওকে কিছুটা ধরাছোঁয়ার মধ্যে মনে হতো; ওর সঙ্গে দূরত্বটা যেন একটু কমে যেত। আস্তে আস্তে জানলাম ওদের পারিবারিক ব্যবসাটা ওষুধের। কলকাতার কয়েক জায়গায় বড় দোকান আছে, নাম 'সাহা মেডিকো'। বাবা-কাকা ছাড়াও দুই জ্যাঠতুতো দাদা দেখা-শোনা করে সবকিছু। পরে উঁচু ক্লাসে উঠে বলত ওর নাকি ইচ্ছে নয় তাদের মতো ব্যবসায়ী হবার। ও চায় জাহাজে চাকরি করতে। কত জায়গায় ঘোরা যায়। বিদেশী ব্র্যান্ডের জিনিস কেনা যায়। অবশ্য খুব বেশী বছর পাইনি ওকে আমাদের সঙ্গে। পড়াশোনায় মন ছিল না একেবারেই। খালি বলত, "জাহাজের লোকেদের আবার ডিগ্রী-ফিগ্রী লাগে নাকি?" এই করে করে একদিন ডুবল ওর জাহাজ। আজও মনে পড়ে ক্লাস সেভেনের বার্ষিক পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোবার সেই দিনটা। ডিসেম্বরের সেই কুয়াশা-কুয়াশা ঠান্ডা সকালে ক্লাসে বসে আছি আমরা রিপোর্টকার্ড হাতে। সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের টিচার, সঙ্গে হেডস্যার। ফল ঘোষণা চলছিল, কিন্তু এখন থেমে আছে। শোনা যাচ্ছে কান্নাভাঙা গলায় একজনের কাতর মিনতি, "স্যার, আমাকে এই একটিবার পাস করিয়ে দিন স্যার। আমি এই রেজাল্ট নিয়ে কী করে বাড়ী ঢুকব স্যার?" মনখারাপ

লাগছিল আমাদের, নীরবে মুখ চাওয়াচাওয়ি করছিলাম। বলে উঠতে ইচ্ছে করছিল, দিন না স্যার এবারের মতো ওকে ক্লাসে উঠিয়ে, ওই কটা নম্বরের জন্য কী এমন আসে যায়? মনে মনে অবশ্য জানতাম সেটা হবার নয়। যাইহোক, সেবারে ও পিছিয়ে পড়ে আগের ক্লাসেই থেকে যাওয়ায় ওর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ অনেক কমে গেল। ওর খবরটবরও তেমন পেতাম না। তবে শুনেছিলাম ওই ধাক্কাটা কাজে দিয়েছে, জাহাজের ভূত নেমেছে ওর ঘাড় থেকে।

কিন্তু ওই ঘটনার আগে ও যখন আমাদের সহপাঠী ছিল আর মাঝেমধ্যে আমার পাশে বসত, ওর টুকরোটাকরা কথাবার্তায় আর অন্য ছেলেদের কানাঘুষোয় একটা জিনিসের আভাস পেয়েছিলাম। তার তাৎপর্য অবশ্য সেই মুহূর্তে ঠিক উপলব্ধি করতে পারিনি। মাঝেমাঝে দেখতাম ওর চোখদুটো লাল, একটু পরে-পরেই ঝিমিয়ে পড়ছে। কয়েকদিন তো ক্লাস চলাকালীন ঘুমোনোর জন্য শাস্তিই পেল, ক্লাসঘরের বাইরে নীলডাউন হতে হ'ল। আমি কারণ জিজ্ঞেস করলে বলত আগের রাতে কারেন্ট চলে গিয়েছিল, পাখা-টাখা চলছিল না, তাই ঘুম হয়নি। সম্ভবতঃ ও যে গৃহশিক্ষকের কাছে পড়ত তাঁর অন্য ছাত্রদের মাধ্যমেই ক্লাসে ছড়িয়ে গিয়েছিল সত্যিটা শেষ অবধি। ওদের যৌথ পরিবারে নেশাজনিত সমস্যা আছে, সে-নিয়ে প্রায়ই নাকি রাতে অশান্তি হয়। নেশা বলতে ওই বয়সে বুঝতাম রেডিওর কৌতুক নকশায় বা নাটকে জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলা কিংবা মজার সিনেমায় টলোমলো পায়ে অসংলগ্ন আচরণ করে লোক হাসানো। সে তো বেশ উপভোগ্য ব্যাপার। তা নিয়ে অশান্তি? এমন অশান্তি যে বাড়ীর ছোটরাও ঘুমোতে পারে না? ঠিক পরিষ্কার হতো না ব্যাপারটা। সাহস করে আমার বাড়ীতে বড়দের জিজ্ঞেস করলে শুনতাম বলাবলি হচ্ছে, "ছেলেকে ভাল ইস্কুলে দিলাম এইসব শেখার জন্য?" যাইহোক, বয়ঃসন্ধিতে এসে যখন এই বিষয়টা নিয়ে মনের ধোঁয়াশা কাটল, তখন ও আর আমাদের ক্লাসে নেই। আজ এত বছর পর যখন দেবমাল্যর কাছে শুনলাম ও অ্যালকহলিক, অবাক হলাম না। বাড়ীতে ছোটবেলা থেকে যা দেখেছে তার দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবই পরবর্তীকালে পড়েছে ওর জীবনে। তবে খারাপ লাগল ওর চেহারা দেখে আর ভগ্নস্বাস্থ্যের কথা জেনে। অনেক সংকট আর উত্থান পতনের মধ্যে দিয়ে যে গেছে, তা ওর দিকে তাকালেই বোঝা যায়।

পিঠে দুটো মৃদু টোকায় স্মৃতির সরণি থেকে এক ঝটকায় বর্তমানে ফিরলাম। মাঠের মঞ্চে ইতিমধ্যে অনেক গান-টানের পর একটা আবৃত্তির অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। পিছনে ঘুরে দেখি শতরূপা। আজ আমাদের বাইশতম বিবাহবার্ষিকী, তাই কিছু আত্মীয়স্বজনকে পার্ক স্ট্রীটের একটা জনপ্রিয় রেঁস্তোরায় নেমন্তন্ন করেছি সন্ধ্যেবেলা। এখান থেকে বেরোতে দেরী করলে অতিথিদের আগে পৌঁছতে পারব না। তাই ও একটু অসহিষ্ণু হয়ে আমাকে ডাকতে এসেছে। এতক্ষণ অবশ্য নিজেই গল্পে মশগুল ছিল। আমার প্রাক্তন সহপাঠীদের অনেকেই দেখলাম সপরিবারে হাজির। তাদেরই কারো কারো সহধর্মিণীদের সঙ্গে বেশ জমে গেছে ওর, প্রথম আলাপেই। সকলের কাছ থেকে বিদায়-টিদায় নিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম আমরা রংবেরঙের এল-ই-ডি বাল্বের আলোয় সুসজ্জিত স্কুলবাড়ীটার গেটের দিকে। গেট পেরোতে গিয়ে ক্ষণিকের জন্য মনে হ'ল, এইখানে, ঠিক এইখানেই তো রোজ হজমিওয়ালা আর ঝালমুড়িওয়ালা বসত টিফিনের সময়! এইখানেই তো ইয়া গোঁফওয়ালা খটুয়া দারোয়ান রামরূপ সিং লাঠি নিয়ে পাহারা দিত যাতে আমরা কমপাউন্ডের বাইরে না বেরোই। আর এইখানেই তো তিন দশক আগে শেষবার দেখা আমার প্রিয় অংকের টিচার প্রভাসবাবু আর ইংরেজির টিচার নবীনবাবুর সঙ্গে, যখন আমার উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ পাড়ি দেওয়ার খবরটা দিতে এসেছিলাম ওঁদের সবাইকে। হ্যাঁ, কর্মসূত্রে আমার ঠিকানা এখন বিদেশ। তরশু সকালেই এই সংক্ষিপ্ত সফর-শেষে আবার উড়ে যাব সেই পরিচিত কর্মক্ষেত্রে।

অবশ্য তাতে একটা জিনিস বদলাবে না। আমার কাছে জীবনের ঠিকানার প্রথম লাইন সবসময়েই এই ষাট বছরের পুরনো সবুজ মাঠঘেরা স্কুলবাড়ীটা। ছিল, আছে, থাকবে।...

অব্যক্ত

শেলী শাহাবুদ্দিন

যারে চাই মহা-জীবনের মাঝে,
আমারে চেনে সে মিছে সব সাজে।

হৃদয়ের সাথে হৃদয় বারতা,
নিষিদ্ধ হ’ল, না শুনে সে কথা।

অনাদি কালের জীবনের গান,
শোনে নাই কেহ, নিভে গেছে প্রাণ।

না বলা কথারা বুকের খাঁচায়,
তুষানলসম আগুন জ্বালায়।

যুগ যুগ ধরে করেছি বহন,
যে দেহে বুকের সে মহা দহন,
যে দিন এ প্রাণ ছেড়ে যাবে তারে,
অপ্রকাশের অন্ধকারে,
কী হবে সেদিন, কেউ কি তা জানে?
অঙ্গার হেন বিদাহী এ প্রাণে?

মনসঙ্গীত ১

অচিন্ত্য কুমার ঘোষ

আকাশ, বাতাস, ভূমি ও নীরমাঝে
বাজছে মধুর বীণ,
বিশ্ব-নিখিলে আজকে তোমার
আবির্ভাবের দিন।

পাখির কলতানে আজি মাতে বিশ্বরাজি,
পুষ্প-সুবাস ভরল গৃহের আরাধনার সাজি।
রবির কিরণ আশিস ছটায়
আহ্বানে নবীন,
বিশ্ব-নিখিলে আজকে তোমার
আবির্ভাবের দিন।

সুস্থ সবল দেহে-মনে শতায়ু হও জ্ঞানে,
জগৎমাঝে মঙ্গলকাজ আসুক তোমার ধ্যানে।
চন্দ্রশোভার পবিত্রতায় আহ্বানে নবীন,
বিশ্ব-নিখিলে আজকে তোমার
আবির্ভাবের দিন।

উন্মুক্ত আশ্চর্য

অমিত চক্রবর্তী

আজ সারাটা বিকেল আমরা বসেছিলাম প্রান্তরের মাঝে
ওই ম্যাগনোলিয়া গাছটির নীচে
জাহাজডুবি জোড়ের মতো। এ দিকে আলো রয়েছে এখনো
স্মিত, সাদা, সমুদ্রদ্বীপের তুলো –
পরিষ্কার দেখতে পাই চাঁদমনের এ পিঠটা,
ওদিকে গোধূলির বিদায়ী ঝালর, মনের ও পিঠটা
ঢেকেছে যেন নিজের জিনিস।
এইভাবে পুরোটা বিকেল কাটে আমাদের।
এর পর সন্ধ্যে এসে যাবে, ঈগলের ডানায় চেপে ঝুপ
করে নেমে পড়বে অন্ধকার –
চকমকি পাহাড়, বিস্তৃত প্রেইরি প্রান্তর
ঢুকে পড়বে কুয়াশায়, লেপের নীচে। আমি তোমার মনের
এ পিঠটা চিনি, ও পিঠ আড়ালে, সামনে প্রান্তর,
হয়তো ভালবাসবে, হয়তো অবহেলা –
এই বিস্ময় নিয়ে গড়ে ওঠা উন্মুক্ত আশ্চর্য,
এই অনিশ্চিত প্রান্তর
এ আর পৃথিবীতে কোথাও নেই।
এখানেও আর বেশিদিন থাকবে না।

উপহার

মিশা চক্রবর্তী

উপহার দেবে? দাও উর্বর এক জমি,
আবাদ জমি, তাতে চাষ করব ‘মানুষ’!
লক্ষ লক্ষ মান আর হুঁশ সম্পন্ন
প্রকৃত মানুষ ফলাব আমি!

ইষ্ট দেবতার কাছে বর চাইব খাঁটি মনুষ্যত্বের,
অনেক যত্নে সেচন করব, বানাব নিখাদ নিটোল মানুষ!
রং বেরঙের মানুষ, কেউ সবুজ, কেউ লাল,
নানান রঙের দেখতে হলেও ভিতর থাকবে স্বচ্ছ সাদা।

এমন মানুষ, যারা কারণ ছাড়াই ভালবাসতে জানে,
স্বার্থ ছাড়াই পাশে দাঁড়াতে জানে, অন্যের জন্য কাঁদতে জানে,
এমন মানুষ বানাব আমি, যাদের সত্যিকারের মন আছে, আর
আছে প্রাণশক্তি, যা সব ক্লান্তিকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে!

উপহার দেবে? দাও উর্বর এক জমি,
আবাদ জমি, তাতে চাষ করব ‘মানুষ’!
লক্ষ লক্ষ মান আর হুঁশ সম্পন্ন
প্রকৃত মানুষ ফলাব আমি!

আরণ্যক

উদ্দালক ভরদ্বাজ

আজ জঙ্গল বৃষ্টি মেখেছে গায়ে
চুঁইয়ে পড়ছে ভালবাসা, তার নগ্ন শরীর বেয়ে।
জলের গন্ধের মতো মন,
এসেছে সেও আজ মৃত্যুর মোড়কে।

ভালবাসলে স্বপ্নও গন্ধ ছড়ায়
কস্তূরী আবেশে কাঁপে ভিজে পাতা,
গাছের ক্ষুধার্ত বাকলে
ঘুরে ফেরে জলের ওষধি নিঃশ্বাস...

জলের গোপন গন্ধ
উঠেছে আজ, আমারও নির্বীজ মনে
আমি কি অরণ্য হব?
যদি তুমি বৃষ্টি হও, রিনি?

আমি যদি অরণ্য হই
তুমি আজ বৃষ্টি হবে, রিনি?

অমলতাস

নমিতা রায়চৌধুরী

ঠিক যখন সন্ধ্যে হ'ল,
ক্লান্ত শ্রান্ত আহত বিকেল,
আঁচল পেতেছে সবে রাতের আকাশে।
ফিরে দেখি, অসংখ্য জোনাকবাতি
বাগান আলো করে!

মুহূর্তেই মনে পড়ে, শত সহস্র উল্কা,
একদিন ছুটে এসেছিল ধ্বংসের স্রোতে।
একগুচ্ছ সোনালী অমলতাস,
নির্মমভাবে পদপিষ্ট হয়েছিল রাজপথে।
তারপর সবটুকু নিকষ কালো অন্ধকার!

বিধাতা স্বয়ং সভায়।
সত্যের একচ্ছত্র আধিপত্য,
লিপিবদ্ধ হয় শেষ উপাখ্যান!
আহত নিষ্প্রভ প্রজাপতি,
তখনও বিরামহীন –
লিখে যায় উত্তর ফোটা ফুলের ইতিহাসে!

কুঁড়ি অশ্রু মুছে,
প্রস্তুতি চলে আরও একটি নতুন অপেক্ষার!

ইতিহাস না বর্তমান

বৈশাখী চক্কোত্তি

গান্ধার বা গান্ধাহার
সময় কালে কান্দাহার।

রাজা সুবল ও রানী সুধর্মা
ওঁদের জ্যেষ্ঠ পুত্র শকুনি
রূপসী, বিদুষী ও ধর্মনিষ্ঠা
সহোদরা গান্ধারী জ্ঞানী।

গান্ধারীর অকাল বৈধব্য,
রাজ জ্যোতিষীর ভবিষ্যবাণী
ছাগ সহিত বিবাহ ও ছাগনিধন
বৈধব্যযোগ খন্ডন মানি।

হস্তিনাপুরের জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র ধৃতরাষ্ট্র
জন্মান্ধ, তাই পাত্রী দুরূহ মনোনীতা
সুদূর গান্ধার রাজকন্যা হলেন আদৃতা
অভিভাবক পিতামহ ভীষ্মের নির্বাচিতা।

রক্তক্ষরণ অবশ্যম্ভাবী, প্রবল পরাক্রমশালী
ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্র, বিবাহের অসম্মতিতে,
অনিচ্ছার বিবাহ মেনে রূপ, শিক্ষা, বুদ্ধি
ও জ্ঞানচক্ষু ঢাকিলেন শান্তির পরশ পেতে।

অচিরেই রাজ জ্যোতিষীর ভবিষ্যবাণী,
ছাগবিবাহ ও বৈধব্য হ'ল হস্তিনাপুরে জ্ঞাত
ভীষণ ক্রোধে ভীষ্ম করলেন আক্রমণ,
পুত্র, মিত্র, অমর্ত্যসহ গান্ধাররাজ হলেন ধৃত।

শুধুই শকুনি, অগ্রসন্তান, রইলেন জীবিত
একে একে নিভিল সবকটি দেউটি
পিতার পদঅস্হি দিয়ে তিনি
বানালেন প্রতিশোধের পাশার ঘুঁটি।

পরের ইতিহাস সবার জ্ঞাত, গান্ধারীর
প্রচন্ড অভিশাপে যদুবংশ হল ধ্বংস।
এই সেই গান্ধার অধুনা আফগানিস্তান
যেথায় অস্থায়ী বৌদ্ধধর্মী ও মৌর্য বংশ।

আলেকজান্ডারের জয়পতাকা ক্ষণস্থায়ী
ইংরেজরা অসফল তার সাথে পাকিস্তান।
রাশিয়া পিছায় আর আমেরিকাও চালে
নিতান্তই ভ্রান্তিপূর্ণ হ'ল পাশার দান।

মহিলাদের উপর অমানবিক অত্যাচার,
নির্বিচারে গণহত্যা,পাশবিক আচরণ।
ইতর বিশেষের শাসনে অনাবশ্যক রক্তক্ষয়,
অধিকাংশ প্রাণীই হ'ল দুঃশাসন।

সময় আসছে ঘনিয়ে, ওহে অত্যাচারী
এখনো হও সচেতন, হও সাবধান।
নারীর শোণিত, অস্থি, অশ্রু, আর্তনাদ
হবে না বিফল, বিদ্রোহ হচ্ছে আগুয়ান।

এ এক অভিশপ্ত দেশ আফগানিস্তান,
গান্ধারী ও শকুনির অভিশাপ, আক্রোশ
পাহাড়ের গায়ে খোদিত, সময় আসন্ন নরাধম,
হও সাবধান, দ্রত বাড়ছে জনরোষ।

কিছু এলোমেলো কথা

গৌতম তালুকদার

যখন কেউ প্রশ্ন করে কেমন আছ? আর উত্তরটা যদি হয় 'ভাল আছি',
সেক্ষেত্রে সম্ভবত 'ভাল নেই' সে কথাটাই প্রকাশ পায় বেশী।

নব রসের সমাহারে মানুষের জীবন। আর তাই আজ যেখানে আলো, কাল সেখানে ছায়া, পরশু তার খোঁজ পাওয়াই যায় না। এ যেন সেই শরতের আকাশে মেঘের লুকোচুরি। এই লুকোচুরি নিয়ে যে জীবন, তাকে আমরা ভালবাসি।
তাই শুনতে পাই:

"ভালবাসি ভালবাসি সুখে দুখে।"

শুনতে পাই:

"দোস্ত দোস্ত না রহা, পেয়ার পেয়ার না রহা।"

শুনতে পাই:

"এই কথাটি মনে রেখো আমি যে গান গেয়েছিলেম।"

আমি বলি ...

গ্রীষ্ম তোমার তাপস মূর্তিখানি
নিয়ে গেল সকল কোমলতা,
নিষ্ঠুর তুমি, কঠিন তুমি
কঠোর তোমার কঠোরতা।

বর্ষা এসেছে ভেসেছে কূল
ময়ূর নেচেছে ভরেছে দেউল।
শিউলি পড়েছে মাটির 'পরে
শিশির দিয়েছে চুম্বন তারে।
তব শুভ্র আঁচলখানি
সিঁথির সীমান্ত 'পরে
হেমন্তের এই বাণী
শীতের আগমনের পরে।
ওগো ঝরাপাতা
কার তরে এ ব্যাকুল ব্যাকুলতা।

বসন্ত তোমার মধুরতা
মুছে দিল সকল মলিনতা।

রাগের সাধনা করিনি। ফলে শুদ্ধ 'নি' বা কোমল 'নি'-র সঠিক সন্ধান জানা নেই।
এ আর কিছু নয়, আমার বেহিসাবী মনের এলোমেলো কিছু কথা।

অপেক্ষা

সফিক আহমেদ

শাওন,
জ্বালিয়ে রাখো আগুন তোমার
আসব আমি শীতের রাতে,
মনখারাপি সন্ধ্যাবেলায়
আসব আমি ওম ছড়াতে।

হারিয়ে যদি যাও কখনো
ঠিক বাড়াব আঙ্গুলটাকে,
চিনিয়ে নিয়ে যাবই যাব
পুরনো সেই আস্তানাতে।

হাসবে যখন লাগামছাড়া
জমে থাকা কান্না নিয়ে,
চিনব ঠিকই দুঃখ তোমার
হাসির আড়াল সরিয়ে দিয়ে।

চলার পথে হোঁচট খেয়ে
ধুলায় যদি যাও লুটিয়ে,
তুলব তোমায় হাত বাড়িয়ে
পথের ধুলো মুছিয়ে দিয়ে।

কান্না তোমার দুচোখ বেয়ে
ভাসাই যদি নদীর দুকূল,
থাকব আমি নদীর পাড়ে
তোমার আশায় পা ডুবিয়ে।

খসে গেছে অনেক তারাই
আকাশগঙ্গা ছায়াপথে,
বয়ে গেছে অনেকটা জল
জীবন-নদীর স্রোতের সাথে।

তবু একলা বসে খুঁজবে যখন
হারিয়ে যাওয়া সুরগুলোকে,
সময় স্রোতের উল্টোপথে
আসব আমি উজান বেয়ে।

রাতের রেলগাড়ি

শঙ্কর তালুকদার

রাতের রেলগাড়ি
স্টেশনে দাঁড়িয়ে
চারিদিকে রেললাইনের সারি।
এসেছে কচিকাঁচা বড়
অনেকক্ষণ হয়েছে তারা জড়ো।
কিছু গল্প, কিছু হাসিঠাট্টা
কেউ আবার বড়ই আনমনা
অবশেষে এসেছে সময়
রেলগাড়ি যাবে ছেড়ে
তড়িঘড়ি নিচে নেমে
টা-টা বাই-বাই।

ধীরে ধীরে আলোর রোশনাই
যায় কমে
রাতের বুক চিরে
রেলগাড়ি চলেছে সমরে।
কথা যায় কমে
কেউ করে বেশ পরিবর্তন
কিছু আলো গেল নিভে
নিদ্রার ব্যবস্থা এখন।
তবু জানালার ধারে ক'জনা
যদিও কিছুই দেখা যায় না।

আছি শুয়ে, ঘুম নেই চোখে
রেলগাড়ি তাই দুলিয়ে দুলিয়ে
ঘুম-পাড়ানি গান গেয়ে চলে।
মাঝে মাঝে আলোর ঝলক
আর একটা স্টেশন গেল পেরিয়ে।
তারই মাঝে, মাঝে মাঝে হুইসিল
আর অন্ধকারে ঝমাঝম ঝমাঝম।

পথের মাঝে এল বৃষ্টি
এলোমেলো হওয়ার সৃষ্টি,
আকাশের তারাগুলি
ছুটি নিয়ে গেল চলে,
রাতের রেলগাড়ি চলে,
চলে দুলে দুলে
নির্ভীক সৈন্য যেন।
এমনি করেই নিত্য দেয় পাড়ি
রেলগাড়ি দেশ বিদেশের তরে।

বন্ধু মানে

জয়া ঘোষ

বন্ধু মানে নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা
বন্ধু মানে যখন খুশি মনের কথা বলা।
বন্ধু মানে সমান সমান, নয় উঁচু নয় নিচু
ক্ষমা করে দিস্ অভিমানে যদি বলে থাকি কিছু।
বন্ধু মানে দূরে গেলেও কাছেই আছি তোর
একটি টেক্সট বা ফোনকলেতেই জমবে গল্প জোর।
বন্ধু মানে অকারণে অনেক কথা বলা
বন্ধু মানে উদাস বিকেলে অনেকটা পথ চলা।
বন্ধু মানে পাশে ছিলি, আছিস আজও মনে
বন্ধু মানে ঘুরতে যাওয়া হঠাৎ বাদাবনে।
বন্ধু মানে অকারণে গল্প আর হাসি
তোকে দিলাম ভালবাসা আর
শুভেচ্ছা রাশি রাশি।

যুদ্ধ শেষে ফিরছি ঘরে

রঙ্গনাথ

মুক্তিযুদ্ধের লড়াই করে
যুদ্ধ শেষে ফিরছি ঘরে –

মুক্ত দেশ, মুক্ত আকাশ
মুক্ত হাওয়ায় কাটছে দিন –
সাতকোটি লোক গর্ব নিয়ে
বিশ্বে শুধাই মোরা স্বাধীন!

স্বাধীন বলে স্ফীত বুক,
উচ্চ শির মোরা সবাই;
লড়াই করে স্বাধীন হেতু
অহঙ্কারের সীমা নাই!

পোড়া বাড়ি   – ধ্বংসকান্ডে
হয়েছে দেশটা ছারখার;
ভেঙ্গে গেছে তিস্তা সেতু
নৌকা দিয়ে হয় পারাপার।

মুক্ত তিস্তা নদীর জল
মুক্ত তার উত্তাল ঢেউ;
গাছ-গাছালির হাসি-খুশী
এমনতর দেখিনি কেউ!

লাল-সবুজ নতুন পতাকা
উড়ছে আজ সবার ঘরে;
নাচছে মোর উচ্ছল প্রাণ
দেশ-মাতৃকা স্বাধীন করে।

মুক্তিযুদ্ধের লড়াই করে
বুক ফুলিয়ে ফিরছি ঘরে।

(২২ ডিসেম্বর, ১৯৭১-এ গ্রামে ফেরার দিন)

কবিতার পাতা

কৃষ্ণা গুহ রায়

তোমার কবিতার পাতাটা আজও যত্ন করে রাখা আছে আমার প্লাস পাওয়ারের চশমার বাক্সে,
আমার তোমার জন্য জানো খুব কষ্ট হয়,
দিনের পর দিন তোমার মেনে নেওয়া আর মানিয়ে নেওয়া যখন এক সময় দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার অবস্থায় ঠেকল,
সেদিন তোমার মতন আমিও বুঝেছিলাম,
এভাবে আর মানানো সম্ভব নয়,
আসলে জীবন্ত শব খোঁজে অস্থি বিসর্জনের পুণ্য জল,
ভালবাসার মঙ্গলঘট কবে যে তার ভাঙা মনের কোণে দু'টুকরো হয়ে পড়ে আছে,
তা সে নিজে
ই জানে না।
আঠালো তরলের টিউবে জিনিস জোড়া লাগলেও,
তাতে মন জোড়া লাগে না।
তাই তোমার মানিয়ে নেওয়ার বাঁধনটা ছিঁড়ে গেলেও সময়টা এখনও আঠালো হয়েই আছে।
বোধহয় সেজন্যই আজও তোমার কবিতার পাতাটা যত্ন করে রাখা
আছে আমার প্লাস পাওয়ারের চশমার বাক্সে।

আকাশ ভর্তি মেঘ

নার্গিস পারভিন

মনে আকাশ ভর্তি মেঘ,
খুব ভারি মেঘ।
এখন ছুঁয়ে দিলেই বৃষ্টি হতে পারে।
পায়ের নিচে তখন মেঘফাটা বৃষ্টির জলোচ্ছ্বাস!
ভেসে যেতে পারে সবকিছু,
ভেসে যেতে পারি আমিও।
ছুঁয়ে দিলেই...

উড়ে যাক না এই মেঘ তৃষ্ণার্ত সেই মরুভূমিতে, চুপিচুপি!
সব বৃষ্টি শুষে নিতে পারে সে।
নিঃশব্দে, চুপিসারে।
সেখানে নেই জলোচ্ছ্বাসের ভয়ডর।

মনের ভিতর আকাশ ভর্তি মেঘ!

উৎসব

সুস্মিতা রায়

বেদনা মথিত ব্যথিত মন
দূরে থাক সরে কর আয়োজন
এসেছে দোলের উৎসব
আনন্দে মেতেছে আজি সব
রকমারি রঙের খেলা
চারিদিকে আনন্দমেলা
তারি মাঝে বসে এক কোণে
ছোট এক শিশু আকুল নয়নে
খোঁজে চারিধার প্রাণে হাহাকার
আজও বুঝি তার জোটেনি আহার
সেই কতক্ষণ মা গেছে যখন
জুটাতে দু'মুঠো ভাত আর লবণ
চারিদিকে কত সাজানো খাবার
নানা আয়োজন কত সম্ভার
কত লোক যায় কত লোক আসে
উছল খুশীতে ছলছল হাসে
ফিরে না তাকায় ছোট শিশু পানে
কেহ বা চকিত ঘৃণা বিজড়িত তুচ্ছ দৃষ্টি হানে
সহসা সেথায় ধনীর দুলাল
মা'র হাত ধরি আনন্দে মাতাল
হাতে আছে তার রঙ পিচকিরি
ছুটে আসে কাছে মা'র হাত ছাড়ি
শুধায় শিশুরে অবুঝ মনেতে,
'তোমার কি আড়ি সকলের সাথে?
রঙ কেন কেউ দেয়নি তোমাকে?
কেন বসে আছ রাস্তার বাঁকে?
উঠে এসো মোরা দুজনায় খেলি
রঙ মাখামাখি আনন্দ হোলি'
ছোট শিশু সব শোনে নির্বাক
পেটের জ্বালায় চাহনি অবাক
ধীরে ধীরে বলে, 'খিদে পেটে মোর
খাবার আনতে সেই কোন ভোর
মা গেছে আমার, বসে আছি তাই
রঙ খেলবার শক্তি যে নাই
দুই মুঠো ভাত আগে আমি খাই
পেটের জ্বালাটা একটু মেটাই
তারপরে ভাই খেলব যে হোলি
রাঙাব সকলি দুজনায় মিলি'
ধনীর দুলাল হাহা হাহা হাসে,
'ভাত কেন খাবে? কেক খাও বসে'
শুধু এই কথাক'টি বলে
মা'র কাছে সে ছুটে যায় চলে
ছোট শিশু ভাবে এ কোন যাদু
ভাতের থেকেও কেক বেশি স্বাদু
মা এলেই আজ শুধাতে যে হবে
রোজ কেন ভাত খোঁজো মাগো তবে?
এমন সময় মা আসে সেথায়
হাতে তার ভাত কাগজ ঠোঙায়
দু'গরাস তুলি দেয় শিশু মুখে
কেঁদে বলে মাতা বুক ভরা দুখে
আহারে বাছা রোদ্দুরে বসে
দুটি আঁখি মা'র জলেতে ভাসে
পরম তৃপ্তিতে ঢেঁকুর তুলে
ছোট শিশু হেসে মাকে শুধু বলে,
'কী যে বলি মাগো, কী বোকা বন্ধু,
বলে কিনা কেক বেশি সুস্বাদু
আহা রে বন্ধু হয়তো কখনো
মায়ের হাতের আদরে মাখানো
পায়নিকো এই ভাতের সোয়াদ
পেলে দেবে জানি সবকিছু বাদ
দাও না গো মা ছুটে দিয়ে আসি
একমুঠো ভাত' – বলে শিশু হাসি
মা শুধু বলে, 'ওরে মোর খোকা
বড় ছোট তুই তাই এত বোকা
কষ্টের ভাত অতি সুস্বাদু
বড় মানুষের হেলাফেলা শুধু

যাহা কিছু সব কষ্টেতে জোটে
সে জিনিস বড় দামী হয় বটে
ভগবান যাকে যতটুকু দেন
তাই নিয়ে সুখী হোক মনপ্রাণ
মঙ্গলময়ের অসীম করুণা
আজীবন করি এই প্রার্থনা
এভাবেই যেন সন্তান মোর
হেসে খেলে থাকে খুশিতে বিভোর
এটুকুই চাওয়া জগতের পিতা
কোরো গো আশিস নোয়াই মাথা।'

সুখ

গৌতম সমাজদার

আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ
তোমার মনের মতন,
ঝরেপড়া বৃষ্টিগুলো
কখনও ঝমঝম, কখনও রিমঝিম,
ছন্দময় অপূর্ব তাল,
কখনও মনে হয় তোমার হেঁটে যাওয়া
পেছন ফিরে তাকানোর মতন
এক অনিন্দ্য সুন্দর বেঁচে থাকা,
তবুও অপেক্ষায় থাকি,
স্বপ্ন দেখি নীলাকাশে বলাকা,
লাল শিমুল পলাশে বসন্তের আগমন বার্তা,
তোমাকে ছুঁয়ে শেষ দিন পর্যন্ত
বেঁচে থাকার সুখ।

প্রাণের বাণী

কমলপ্রিয়া রায়

প্রাণের বাণী মনের মাঝে
করে আনাগোনা
ধরব বলেই বসে আছি
ধরতে তো নেই মানা।
কান পেতেছি মন পেতেছি
হৃদয় দুয়ার খুলে
হৃদ-কমলে প্রাণ ভোমরা
যায় না যেন ভুলে।
হাজার ভিড়ের সরণি বেয়ে
কখন যে সে আসে
একটু দেরি হলেও যেন
দাঁড়ায় আমার পাশে।
প্রাণের বাণীর পরশ পেয়ে
মন মাধুরী জাগে
উজল তারার আলোর ছটায়
অরুণ রবির রাগে।
প্রাণেশ, তোমার দ্বারেই দাঁড়াই এসে
তোমার তরে গাওয়া
প্রাণের বাণীর পরশ নিয়ে
আমার এ পথ চাওয়া।
জানি আমি প্রাণের বাণী
ভরাবে মন আজ
পূর্ণ হব পুণ্য দিনে
হে রাজাধিরাজ।

কে রবে

শঙ্কর তালুকদার

যা যাবার তা যাবে
অসীমের ইতিহাসে
জেনেছি তা বারে বারে।
যারা এসেছিল
সুর আর ঝংকারে
নৃত্য-নূপুরে জমিয়েছে আসর
দখিন হাওয়ায়
মিশে গেছে অন্যলোকে।

যা যাবার তা যাবে
পুঞ্জীভূত ধন
থাকবে না সাথে সাথে।
তবু যত হয় পরিচয়
ভাবি মনে তত জয়
পাষাণে খোদাই হয়ে
রবে নাম নিশ্চয়।

যা যাবার তা যাবে
খেলা শেষে
ফিরে যাবে অগোচরে।
ধূলিতলে যা রবে
সে রবে আর কারো তরে,
একদা যে তারে ছিল সুর
তার ছিঁড়ে সে
হয়েছে বেসুর।

যা যাবার তা যাবে
রবে ধরণীতে মাটির গন্ধ
রাতের জোছনা ঘিরে
ছায়া-মায়া-কায়া-মন
সবুজের সারি বন
নীল আকাশের ভেলা
নদীর জলের কলতান।

মন পুড়ে

নমিতা রায়চৌধুরী

বৃষ্টির মতো মনে পড়ে
মনে পড়ে কালবৈশাখী ঝড়ে...
শিশিরে সকাল, ক্লান্ত সেঁজুতি,
বৃষ্টিভেজা সাতরঙ মনে পড়ে!

মনে পড়ে নিষিদ্ধ প্রেম!
চিলেকোঠায় মন পুড়ে!

বোবাকান্না মনে পড়ে,
রক্তাক্ত আঁচল, নখের আঁচড়,
নৈঃশব্দ্যের লাশঘর মনে পড়ে।
দাউ দাউ জ্বলে মন,
মণিকর্ণিকা মনে পড়ে...

কিছুই থাকে না হাতে,
বকুল পিসির আজও হয়নি ঘরে ফেরা,
বকুলপিসিরা ফেরে না কোনদিন।
রাতের আঁধারে চড়া রঙ লিপস্টিক,
ছিঁড়েখুঁড়ে খায় যে পুরুষ –
তার ঘরেও সীমন্তিনী পিদিম জ্বলে!

কিছুই রয় না হাতে,
তবুও পুড়ে মন, মনে পড়ে!
এলোমেলো চুল এক কিশোর,
নীলরঙ চুড়ি মনে পড়ে!
মনে পড়ে কাছেই, তবু দূরে কোথাও
পুড়ে মন, মনে পড়ে...

কিছুই থাকে না হাতে,
কিছুতেই হাত রয় না হাতে...

ভুখ আর এক ভিখারি কবি

পিয়াংকী মুখার্জী

কিছুটা কিছুটা করে কেটে যাচ্ছে দিন
নিভে আসছে বাধ্যতামূলক বেড়ে ওঠা অভ্যেসরা,
তোমার সাথে সম্পর্কের সূত্রগুলো এখন অনেক স্বাধীনচেতা অনেক বেপরোয়া।
নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ার মানুষ যেমন ফুরফুরে হয় ঠিক হয়তো বা তেমনই।

তবুও ব্যস্ততার ফাঁকে আদিম অনুপ্রাসের মতো ঘিরে ধরো তুমি।
উত্তাপে গলতে থাকে মোম আর থার্মোমিটারে বাড়তে থাকে প্রদাহের ডিগ্রি।

চুপ থাকো তুমি
আমিও বন্ধ থাকি
সরে সরে যায় ‘আপ কী আদালত’
আর স্ক্রিনে আবছা হয় বিগত যত হাল হকীকৎ

শিরদাঁড়া ধরে পেঁচিয়ে ওঠা ময়াল সাপ কোন কোন সময় উর্ধ্বক্রমের বদলে হাঁটু-গোড়ালি বেয়ে
নিচে নেমে শুয়ে থাকে পা-পাতার ওপর,
যেন ঘুমন্ত নিষ্পাপ।
আমি এগিয়ে যাই। ভয়ের বদলে ওর সরীসৃপ শরীরে আমার মাতৃত্ব ভর করে।

কার নিঃশ্বাসে বিষ আর কারই বা নিঃশ্বাসে প্রসাদ এটুকু উত্তর খুঁজতে গিয়েই পার করে ফেলি খোলা মাঠ।
গোধূলি এলে বুঝি “এগোচ্ছে জীবন ম্যাহেতরমা”

এত শেড একসাথে কোনো কারখানায়ও দেখিনি...
নিভন্ত পূর্ণিমার লিকলিকে আলোতেও দেখি জীবনের গায়ে “তেত্রিশ কোটি” রঙ আর প্রতিটা পর্যায় শেষ হয়েছে এক একটা বহুমাত্রিক ভিবজিওর-এ।

কোথাও বসে অলক্ষ্মীটা কবিতা লেখে
“অগর এক আঁসু ছুপাকে তুমহারা মুসকুরাহট দিখনে কো মিল যায়ে তব তো হাম হাররোজ আঁসু পিকে হি অপনা ভুখ খা যায়েঙ্গে”।

সূর্যাস্তের শেষে

সৌমি জানা

অনেকগুলো সূর্যাস্তের পর আবার হাঁটছি এই রাস্তায়
এক সময়ের হাতের আঙুলের মতো চেনা অলিগলি
কেমন যেন অচেনা মনে হচ্ছে আজ
বুকের মধ্যে একটা কিন্তু কিন্তু ধুকপুকুনি
পেট চেপে থেমে থেমে ছাড়া নিঃশ্বাস
কী যেন একটা সংকোচ, একটা চাপা ভয়
চেনা মানুষ হঠাৎ অচেনা হয়ে গেলে যেমন আতঙ্ক হয়
ঠিক সেইরকম!

তবু সাহস জুগিয়ে ফিরে এলাম
এ ক'বছরে যতবার সূর্য ডুবেছে পশ্চিমে
আমিও ডুবেছি ততবার দিগন্তের নীচে অন্ধকারে
দিনভ'র কর্মব্যস্ততার অছিলায় নিজেকে ভুলিয়ে রেখেও
গোধূলির কনেদেখা আলোর তীব্রতায়
এক ঝটকায় খসে পড়েছে আমার যত্নে ধরা রঙ তুলির মুখোশ
ওই আলোই যে গায়ে মেখে দাঁড়াতাম সামনে গিয়ে
দিনান্তে সূর্যাস্তের কালে!

এই পথ, সেই আলো আজ এক উপহাস
ওদের থেকে নিরন্তর বিস্মৃতির ভিক্ষে চায় আমার অস্তিত্ব
ওসবের থেকে মুখ ঢাকতে অনেক চড়িয়েছি
আমার রঙ-তুলির প্রলেপ
নিজেকে ভেঙেচুরে পুরেছি নতুন ছাঁচে
নিজের কাছে নিজেই অচেনা আমি আজ!

নিজেকে রীতিমতো ভয় পাই এখন
কি জানি কখন কী ভেবে ফেলি
এই যেমন আজ ভেবে ফেললাম
ফিরে আসব এই রাস্তায়, দাঁড়াব এসে অতীতের মুখোমুখি
ফেলে আসা দিন আর কীই বা করতে পারে ক্ষতি
পরোয়া নেই আর দু'চারটে দীর্ঘশ্বাস ফেলার!

কিন্তু কী আশ্চর্য
সন্ধ্যে ঘনানোর রঙটা আজ আর উপহাস করছে না আমায়
কনেদেখা আলোয় আমি আজ উদাসীন
বুকের মধ্যে আর হচ্ছে না তোলপাড়
বেশ শীতল সাবলীল হাঁটছি আমি সেই রাস্তায়
একদিন যে পথে পাশাপাশি পা ফেলে ঝড় তুলতাম
প্রতি পদে, প্রতিবার!

ফেলে আসাকে আঁকড়ে বিলাপের অবসর আর নেই
নেই তার আর অধিকার
সময় শুধু সামনে ঠেলে
তৈরী হয় নিত্য নতুন হাহাকার
সূর্যাস্তের প্রতীক্ষায় আর থাকি না
গোধূলিলগ্ন বড়ই অর্থহীন
এখন দিন থেকে রাত হয় বিনা আড়ম্বরে
আবার রাত কাটলে নিরাভরণে ফেরে গতানুগতিক দিন।

আলোর সন্ধানে

সুব্রত ভট্টাচার্য

নিঃশব্দে কেটে যায় কতগুলো নৈঃশব্দ্যে ডুবে যাওয়া বোবা সময়।
পাথর কঠিন হৃদয়ে তখনও হয়নি কবিতার পরিচয়।
তবুও ক্ষত-বিক্ষত অনুভূতির বেনোজলে...
ভেসে যায় রক্তাক্ত পঙক্তিমালা,
কে রাখে খোঁজ! ভাবনার জগতে,
হারিয়ে যেতে বসেছে আছো-আছি শব্দগুলো –
আর নিত্যদিন হাঁকে বঞ্চিত কবিতার ফেরিওয়ালা!
সভ্যতার আড়ালে অভিশপ্ত আলোর নিচে নিকষ কালো অন্ধকার
অক্টোপাসের মতো জড়িয়ে আছে মিথ্যে অহংকার।
কালান্তে শতাব্দীর কৃষ্ণ-গহ্বরে হারিয়ে যায়
অনেক পথের নিশানা,
অজানা পথে চলেছে এলোমেলো দিশাহীন বেদুইনের ভাবনা
পাবে কী শেষের ঠিকানা...!
ক্লান্ত পায়ের ছাপ এলোমেলো চিহ্ন এঁকে যায় পথের মলিন ধূলায়
হারিয়েও খোঁজে পান্থজনে শুধু পথে পথে ওগো সুন্দর বন্ধু তোমায়।

নিরাশায় ডুবে যাওয়া বিশ্বাস করে রাখবে ভরসার কাঁধে নির্ভরতার হাত!

আজও বন্ধু তোমায় খোঁজে উৎসুক দুটি চোখ... নির্ঘুম কেটে যায় বিষণ্ন রাত।

মনসঙ্গীত ২

অচিন্ত্য কুমার ঘোষ

পিছন পানে তাকিয়ে দেখি
সাতাশ হ'ল পার,
দুঃখ-সুখে বইছি দোঁহে
প্রেমের গুরুভার।

চন্দ্র-রবি সাক্ষী রেখে
মাগি এমন বর,
জগৎবাসী আপন মোদের
পৃথ্বী মোদের ঘর।

প্রেম যা ছিল তেমনি আছে
রইবে চিরকাল,
কান্না-হাসির স্পর্শে দোঁহে
বুনব প্রেমের জাল!

বাইশে শ্রাবণ

অঞ্জনা দাস

প্রয়াণ দিবস বাইশে শ্রাবণ
শ্রাবণ-ধারা ঝরে সারাক্ষণ।

রবির উদয় আজ নাহি হয়
ঝলমলে আলো এ কী বিস্ময়!

আস   লেই তুমি অন্তরে মোর
বিশ্বভুবন হয়েছে বিভোর।
জীবনের যত ব্যথা যন্ত্রণা
তোমারই গানে পায় সান্ত্বনা।

শক্তি সাহস ভয়কে জয়
গানে কবিতায় তুমি অক্ষয়।

পথ যতই না কঠিন হোক
যতই দুঃখ আসুক শোক
কোন কিছুতেই হবে না ভয়
তোমার মন্ত্রে জয় নিশ্চয়।

আমার আমি

মিশা চক্রবর্তী

তুমি আমার আকাশ রঙা –
নীলচে আভার তুলি!
না ফুরানো রূপকথা আর –
গল্পকথার ঝুলি!

মনকেমনের রাত্রি শেষে,
যেমন ভোরের আলো!
আমার কাছে তোমার থাকা,
তেমন করে ভালো!

আর কি আছে আকাশকুসুম,
না ফুরোনো কথা!
আবোল তাবোল উল্টো পুরান,
পাগলামিতে বাঁধা!

তোমার কাছে আগলছাড়া,
বোকা অবুঝ মন;
কেমন করে সামলে রাখো,
যেমন গুপ্তধন!

কোথায় খুঁজি এদিক সেদিক,
জলে স্থলে বনে,
বাইরে তো নয় মনেই আছো,
আমার আমি হয়ে।

আমি আসব আবার

সফিক আহমেদ

প্রেম ছিল কাঁচামাটি
পালকের পরশেও
থেকে যেত আঁচড়ের ছাপ,

আজ অন্তর অনলে পোড়া
ঝামা হওয়া পাষাণ হৃদয়ে
ঝরেও পড়ে না কোনো দাগ

শাওন,
আমি আসব আবার
ভালবাসব আবার
ভেজাব তোমায়
অবিরাম ঝর্ণা-ধারাতে

পাথর গলাতে না পারি
নাও যদি পারি দিতে আঁচড়ের দাগ
তবু অবিরাম সুধা বর্ষণে
বাজবে আবার মধুবন্তী রাগ

হৃদয়ে আসীন হয়ে
রাঙাতে না পারি যদি লালে
পরাশ্রয়ী শ্যাওলা হয়ে
ঢেকে দেব সবুজে সবুজে

যদি সুপ্ত আগ্নেয়গিরি জেগে উঠে
উদ্গারণ করে জমে থাকা ক্ষোভ
সেই লাভাতেই হবে
লুপ্ত প্রেমের সাগ্নিক সমাধি
শান্ত হবে তোমার অন্তর্দহন

শাওন,
তবু
আমি আসব আবার
ভালবাসব আবার

মনসঙ্গীত ৩

অচিন্ত্য কুমার ঘোষ

মনের মাঝে তুমিই রাজা
হৃদয়ে তোমার সিংহাসন,
আসবে যাবে যেমন খুশি
বলার কীইবা প্রয়োজন।

যখন থাকো সিংহাসনে
তখন মনে খুশির রাজ,
শূন্য যবে আসন তোমার
হৃদয় জুড়ে দুঃখের সাজ।
সুখের হাসি দেখুক সবাই
দুঃখ আমার সংগোপন।
আসবে যাবে যেমন খুশি
বলার কীইবা প্রয়োজন।

যেমন করে রাখবে তুমি
আশিস মেনেই থাকবে যে,
পরখ তোমার নিত্য জানি,
নিরীখ করো অলক্ষ্যে।

শাস্তি পাবার যোগ্য বলেই
সময় খুঁজে শাস্তি দাও,
রবে তুমিই মনের রাজা
যতই বুঝে পরখ নাও।
সাধ্য কী মোর তোমায় ছাড়ি,
তুমিই প্রিয় আপনজন।
আসবে যাবে যেমন খুশি
বলার কীইবা প্রয়োজন।

হরিণ গোলাপ বৃত্তান্ত ২

উদ্দালক ভরদ্বাজ

বুড়ো হরিণটার ঘর পুড়ে গেছে দাবানলে,
পুড়েছে চামড়াও তার; ব্যথার শরীরে, শুয়েছে সে
রাত্রির চাদর জড়িয়ে।

অজস্র জোনাকি ঝাঁক বেঁধে উড়ছে
ভাঙা বাঁশের শরীরের খাঁজে উঁকি দেওয়া
সবুজ পাতার চারপাশে।
জ্যোৎস্নার ধারায় ভেসে যাচ্ছে
হরিণের পোড়া ঘর। আর অনেক দূরের
গোলাপ বনের গন্ধ ভেসে আসছে রাত্রির বাতাসে...
সেই ঘ্রাণ মিশে যায় হরিণের ক্লান্ত শরীরে
ভগ্নমন, স্বপ্ন দেখে হরিণ, যেন সে পৌঁছেছে আবার
নতুন ঘাসের সন্ধানে, ভুল করে, গোলাপ বাগানে

গোলাপের কাঁটায় রক্ত ঝরছে রেশমি শরীরে তার
তবু এক উদগ্রীব চোখে ছুঁয়ে আছে ঠোঁট
গোলাপ পাতার আড়ালে, গোলাপের নরম পাপড়ি,
চোখে মুখে সেই নরম তাপ, সতেজ ঘ্রাণের ঝাপটা,
ঘোর লেগে যায় তার, অবশ, মাতাল,
আসন্ন মৃত্যুর ইশারায় উদাসী হরিণ
একটু একটু করে ডুবে যায় আর ভাবে –
এল কি গোলাপ, আবার?
দিল কি, রক্তের ছোঁয়া, মৃত্যুন্মূখ অবসন্ন ঠোঁটে,
দেবে কি কখনো, আবার,
মৃত্যুর আগে?

অয়ন-অন্ত পত্র

শেলী শাহাবুদ্দিন

ফুরায়ে এসেছে প্রদীপের তেল, জীবনের শেষ সাধ,
মেনে নিও, নয় ক্ষমা করে দিও, হয় যদি অপরাধ।
থাকি যদি আরো কিছুদিন বেঁচে, তোমার স্মৃতির বরে,
এই জীবনের বোঝা কি পাপের বেড়ে যাবে তার ভারে?

মনে পড়ে সেই প্রথম দিনের প্রথম আলোর মতো,
ঝর্ণার মতো হেসেছিলে তুমি, শিঞ্জন সঞ্জাত।
মনে পড়ে সেই প্রমূর্ত দিন, গৃহ তব আলোকিত,
ধন্য আমার মানব জীবন, সমিদ্ধ প্রাণ প্রীত।
কেটেছে সে গৃহে বিষণ্ণ রাত, কেটেছে সুখের দিন,
তোমার সুচির স্মৃতির মিশেলে, বুক করে চিনচিন।
মন্দিরগৃহ বানালাম তারে, পূজেছি উষসী মুরতি,
বুকের গহনে বাঁধিলাম গান, গোপনে করেছি আরতি।

মনে পড়ে সেই শোকার্ত স্মৃতি, হারায়েছ প্রিয়জন,
সেই শোকে তুমি ভূমিতে লুটায়ে কাড়িলে আমার মন।
সেই খন থেকে যা কিছু আমার, হয়ে গেল তব ধন,
ছুঁড়ে ফেলে দিলে কোথা সেই ধন, খুঁজি আমি প্রতিক্ষণ।
এইসব স্মৃতি বুকের গভীরে, গোপন গহীন তলে,
কতকাল ধরে রয়েছে লুকায়ে, হারিয়ে যাওয়ার ছলে।
নিভে আশা এই আহত জীবন, ফুরায়ে যাবার আগে,
মণিময় সেই স্মৃতির ভাঁড়ার হঠাৎ কেন যে জাগে?

নিভু নিভু এই জীবন প্রদীপ, স্মৃতির জ্বালানি জ্বেলে,
পুনরায় যেন ক্ষীণ শিখায়, জাগে হৃদয়ের তলে।
হারানো স্মৃতির অমৃত জ্বালি, বাঁচি যদি ক্ষণকাল,
কী মহাপাপ হবে আর মোর, অয়ন-অন্ত কাল?
এই সংসারে, মানব জীবনে, কার তাতে কিবা ক্ষতি?
তাই এই চিঠি, স্মৃতির ভিখিরি, মাগি তব সম্মতি।

হাজারো নিকোলাস

নিবেদিতা গাঙ্গুলী

দেখতে সে বেশ ছিল। কিন্তু মুখে কোনদিনই তার হাসি ছিল না। আমাদের হাসপাতালেই কাজ করত সে। এই আসতে যেতে দেখা হতো, কথাও হতো মাঝে মধ্যে। নার্সিং স্কুল থেকে বছর তিন চার আগে পাস করে এখন সে নার্সেরই কাজ করে এখানে। নাম ছিল তার লাইলনী, তবে সবাই তাকে লনী বলেই ডাকত। একদিন কাজের ফাঁকে ব্রেকরুমে এসে বসেছি, তখন লনী হঠাৎ বলল, “আমি শুনেছি তোমাদের ইন্ডিয়ানদের প্রত্যেক নামের নাকি একটা মানে থাকে?” আমি বললাম, “সব নামের না, তবে হ্যাঁ বেশীরভাগ নামেরই থাকে। তবে লনী, তোমার নামটি কিন্তু আমার ভারী সুন্দর লাগে।” সেইদিন প্রথম তার মুখে হাসি দেখেছিলাম। সেই হাসিটুকু তার ঠোঁট গড়িয়ে একেবারে সারা মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল। সে হাসতে হাসতে বলেছিল, “জানো তো, আমার নামেরও কিন্তু একটা মানে আছে। এটি একটি হাওয়াইন ফুলের নাম। আমার জন্ম হয়েছিল হাওয়াইতে। মায়ের মুখে শুনেছি আমাদের বাড়ীর সামনে পিছনে অনেক ফুলের গাছ ছিল, তারই মধ্যে একটির নাম ছিল লাইলনী। মা বলেছিল আমি যেদিন জন্মেছিলাম সেইদিনটা নাকি খুব ঝকঝকে সুন্দর ছিল আর তেমনি আকাশ বাতাসের সাথে তাল মিলিয়ে ফুটেছিল অনেক অনেক লাইলনী। আমার বাবা খুশীতে আপ্লুত হয়ে সেই ফুল তুলে নিজে হাতে গুচ্ছ বানিয়ে এনে দিয়েছিল আমার মাকে।” আমি বললাম, “তাই? পুরো ব্যাপারটা কী সুন্দর বলো তো লনী?” সে মুখে কিছু বলল না। একটু মুচকি হেসে হাতে কিছু ওষুধপত্তর আর ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। পেশেন্টদের ওষুধ দেবার সময় হয়েছে।

এইভাবে কাজের সূত্র ধরেই প্রথমে তার সঙ্গে আলাপ, আর তারপর বন্ধুত্ব। এমনিতে লনী একটু চাপা ধরনের মানুষ কিন্তু কাজেকর্মে সে অত্যন্ত পারদর্শী এবং খুব দায়িত্বশীল। তাই নার্স হিসেবে হাসপাতালে তার খুবই সুনাম ছিল।

সেই দিনটাতে পেশেন্ট রাউণ্ড শেষ করে সবে এসে বসেছি ব্রেকরুমে। তখন ঘড়িতে বাজে প্রায় বেলা দুটো। দেখলাম বাইরে বৃষ্টি নেমেছে। জানালার কাঁচ দিয়ে যতটুকু আকাশ নজরে এল দেখলাম বেশ মেঘ জমেছে আর দিনের আলোও বেশ কমে এসেছে। জানালার একটু দূরে প্যান্সী আর অ্যাজেলিয়া ফুলের ঝাড়। যথেষ্ট যত্ন করে, অনেক খরচপত্তর করে আর অনেক পরিকল্পনা করেই এসব লাগানো হয়েছে হাসপাতালের চারিদিকে। কোনো সুগন্ধ নেই বটে, তবে ভারী চমৎকার পরিপাটি লাগে দেখতে। হাসপাতালের চারপাশে আরো অনেক বড় বড় নানান রকমের গাছ ছিল। তখন সেই সব গাছের ডালে, পাতায় লেগেছে বৃষ্টিভেজা এলোমেলো হাওয়া। সেদিন মেডিক্যাল ওয়ার্ডে এমনিতেই পেশেন্টের সংখ্যাটা একটু কম ছিল। গতকাল অনেক পেশেন্ট একসাথে ডিসচার্জ হয়েছে। সেদিন সকালে দুজনের শারীরিক অবস্থা হঠাৎই খুব খারাপ হয়ে পড়ায় তখনই ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে ট্র্যান্সফার করে দেওয়া হয়। আর বাকিদের অবস্থা মোটামুটি এক রকম। এমন সময় হঠাৎ লনী ঘরে ঢুকল। সামনের চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে পড়ল। মনে হ’ল আজ যেন ও বড়ই ক্লান্ত। বসে পড়ে কেমন একটা লম্বা শ্বাস নিল। তারপর সোজা কাঁচের জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে বাইরের বৃষ্টি দেখতে লাগল। তখন আকাশ ভেঙে মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে। কোনকিছু তেমন নজরে আসছিল না, সবই কেমন ধোঁয়াটে। হঠাৎ বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে কানে এল একটা অ্যাম্বুলেন্স ঢোকার শব্দ। এই শব্দ আমাদের অতি পরিচিত হলেও শব্দটা শুনলেই বুকটা কেমন ছ্যাঁৎ করে ওঠে কোন এক অজানা আশঙ্কায়। লনী আনমনে বলে উঠল ‘হবে কোনও ট্রমা পেশেন্ট’। তারপর ঘুরে সোজা তাকাল আমার দিকে। তার দুটি কাজলবিহীন গভীর চোখের তলায় ক্লান্তির কালিমা স্পষ্ট নজরে এল। ব্রেকরুমে তখন আমি আর লনী, আর কেউ ছিল না। লনী বলল, “জানো তো আজকের দিনটা আমাকে ঠিক দশ বছর আগের একটি দিনের কথা মনে করিয়ে দেয়। ঠিক এমনি একটি দিন, কেবল বৃষ্টি আর বৃষ্টি। সেদিন ডেভিড আর আমার ডিভোর্স হয়ে গেল। তখন আমার বয়স পঁচিশ কি ছাব্বিশ। বরাবরই আমি একটা ভীষণ জেদী, একগুঁয়ে আর স্বাধীনচেতা মেয়ে ছিলাম। একা একা স্বপ্ন দেখতে ভালবাসতাম। ভয়ডর বলতে কিছুই ছিল না। আমার মা বাবার কোনদিনই ডেভিডকে পছন্দ ছিল না। বলতে পারো আমি

একরকম মা বাবার অমতে জোর করে ডেভিডকে বিয়ে করি। ওদিক থেকে ডেভিডের পরিবারে কেবল ডেভিডের মা ছিলেন । সিঙ্গল মাদার । খুব কষ্ট করে একা হাতে তিনি ছেলেকে মানুষ করেছিলেন । ওঁরও আমাকে ঠিক তেমন পছন্দ হয়নি। তাই সেই বিয়ের দিন থেকেই ডেভিড আর আমি কেবল দুজন দুজনের। সময়ে অসময়ে সাথে কিছু বন্ধু-বান্ধব, এছাড়া আর নিজের বলতে আমাদের তেমন কেউ ছিল না । যেদিন আমাদের ডিভোর্স হয়ে গেল সেদিনও তাই । সেদিন আমার পাশে ডেভিডই দাঁড়িয়েছিল; তবে সে আর আমার নিজের ছিল না। কোর্টের বাইরে আমি একা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেবল ভিজে চলেছি বৃষ্টির অঝোর ধারায়। সেদিন আমার ভিতর আর বাইরে ছিল কেবল মেঘ আর বৃষ্টি, বৃষ্টি আর মেঘ।"

আগে এক-আধ দিন যখন লনীর সাথে একটু গল্পগুজব হয়েছিল, লনী কোনদিনই তার নিজের পরিবারের কথা বলেনি। আর এই ব্যাপারগুলো নিতান্তই ব্যক্তিগত, তাই এসব কথা তাকে কোনদিন জিজ্ঞাসাও করিনি। তবে মাঝে মধ্যে একটি নাম ওর মুখে শুনতাম – কখনো নিক্ কখনও বা নিকোলাস। লনী একবার বলেছিল নিকোলাস ওরফে নিক তার একটি মাত্র ছেলে। এর বেশী আর কিছু আমায় বলেনি। কিন্তু সেইদিন যেন ভরা বাদল সবকিছু ধুয়ে ফেলে সামনে এনে দিল লনীর জীবনের এক বৃষ্টিভেজা অজ্ঞাত ইতিহাস । আমি জিজ্ঞেস করলাম, "লনী, ডিভোর্স করতে গেলে কেন?" লনী উদাস কণ্ঠে বলল, "ওই যে, আমি মা হতে চাইলাম, আর ডেভিড বলল 'না'! আজ না, কাল না, কোনদিনই না। শুধু তাই নয়, পরে ধীরে ধীরে আমি বুঝতে পেরেছিলাম ডেভিড আমার জীবনের সাময়িক এক মোহ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। হি ওয়াস অ্যান অ্যাবুউসিভ ম্যান, মানসিক এবং শারীরিক দু'ভাবেই। দিনের পর দিন তারই অত্যাচারে জীবনটা ভেঙে তছনছ হয়ে গেল। দশ বছর আগের সেই একটা বৃষ্টির দিন, সেই যে আনল ঘন কালো মেঘ... সে মেঘ আমার জীবন থেকে আর কোনদিনই সরলো না।" এই বলে লনী থামল। আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, "তবে তোমার ছেলে নিকোলাস? তাহলে ডেভিড তার বাবা নয়?" এইবার লনী ধীরে ধীরে মুখ তুলল, মনে হ'ল তার কালশিটে পড়া দুই চোখে জলের আলতো রেখা। তবে মুহূর্তের মধ্যে সেই জল কোথায় যেন মিলিয়ে গেল, আর সেইখানেই দেখলাম আগুন। ধীরে ধীরে তার দুই চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। আমার চোখে চোখ রেখে এবার সে বলল, "না, ডেভিড নিকের বাবা নয়।" আমি বললাম, "তাহলে? তুমি কি পরে অন্য কাউকে... ভালবাসলে?" এবার সে কেমন যেন হেসেই উঠল। বলল, "আমি তো বললাম, আমি একা। না, আর কাউকে কোনদিন বিশ্বাসই করতে পারলাম না, তো ভালবাসব কী করে?"

- "তাহলে নিক তোমার ছেলে নয়?"

লনী বলল, "না না, নিকোলাস আমারই ছেলে, বলতে পারো হি ইস এ প্রোডাক্ট অফ রিভেঞ্জ।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "মানে?"

মনে হ'ল লনী তখন যেন এক অন্য মানুষ। বলল, "হি ইস আর্টিফিশিয়ালি ইনসেমিনেটেড।" বাইরে তখনও ঝমঝম করে একনাগাড়ে বৃষ্টি পড়ে চলেছে। লনী আবার বলতে শুরু করল, "যবে থেকে নিকের একটু বোধ হয়েছে রোজ সে ওই এক প্রশ্ন করে আমাকে; রোজ করে, দিনে করে, রাতে করে, বলে মা, হু ইস মাই ফাদার? কী বলব তাকে? আমি কি নিজেই জানি? স্পার্ম ব্যাঙ্ক। অজানা ডোনর। জানোই তো সব!

নিক খুব ভিড় ভালবাসে, ভিড় দেখলেই ছুটতে থাকে, যেখানে গ্যাদারিং সেখানেই আমাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে যায়। প্রত্যেক রবিবার চার্চে যেতে চায়। কেন জানো? বলে যদি ভিড়ের মধ্যে বাবাকে পেয়ে যাই?" লনী এক নাগাড়ে আপন মনে বলে চলেছে, "ঠিকই তো, সে কেউ তো! হয়তো আছে, এই ভিড়ের মধ্যেই আছে, হয়তো পাশ দিয়ে হেঁটে গেছে বহুবার; হয়তো বা নেই আর, কী জানি!" লনীর মুখের কথাগুলো যেন বাঁধভাঙা জলের স্রোতের মতো বইতে বইতে মুষলধারে ঝরে পড়া বৃষ্টির শব্দের সাথে মিলিয়ে যাচ্ছে। আর আমার মনের মধ্যে লনীর মুখের সেই কথাগুলো একভাবে পাক খেতে খেতে ঘুরে চলেছে "হি ইজ আ প্রোডাক্ট অফ রিভেঞ্জ" – "হি ইজ আ প্রোডাক্ট অফ রিভেঞ্জ"। এই প্রতিটি শব্দ আর বিবেকের ঘর্ষণে আমার মনের মধ্যে এক অদ্ভুত অনুভূতির জন্ম হ'ল। এই কী মাতৃত্ব? কিন্তু মুখ ফুটে লনীকে কিছু বলতে পারলাম না। লনী আর কিছু না বলে চুপ করে বৃষ্টি দেখতে থাকল কিছুক্ষণ । তারপর যখন আবার সে ফিরে

আমার দিকে তাকাল, তখন সে যেন এক অন্য মানুষ| কোমল মুখ| চোখের নরম দৃষ্টি| বলল, "দেখতে দেখতে দশ দশটি বছর পার হয়ে গেল| নিকোলাসের মধ্যে দিয়ে আমি আমাকে চিনেছি| আমার অক্ষমতা নয় আমার ক্ষমতাকে চিনেছি| প্রথম প্রথম খুব রাগ হতো নিজের উপর, ডেভিডের উপর, সবকিছুর উপর| আমার এই রাগ আর ডেভিডের উপর প্রতিশোধ নেবার তীব্র ইচ্ছায় আমি স্পার্ম ব্যাঙ্কে যোগাযোগ করি| এইভাবে জন্ম নিল আমার ছেলে নিকোলাস| পরে ধীরে ধীরে আমি বুঝেছি মাতৃত্ব কোন প্রতিশোধ, প্রতিহিংসা, প্রতিবাদ বা প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু নয়| মাতৃত্ব স্বার্থহীন, সে শিশিরের মতো স্নিগ্ধ, রোদের মতো উষ্ণ, আকাশের মতো অন্তহীন, সমুদ্রের মতো তলহীন; সে কেবল শিশুর গন্ধে সুগন্ধা, সে এক অপরিসীম মমতায় সমৃদ্ধা|"

আজ সারা বিশ্বজুড়ে মাতৃহীন নিরুপায় শিশুদল পথ চেয়ে বসে আছে একটু মাতৃস্নেহের ছোঁয়া পাওয়ার আশায়| আজ লনী শুধু নিকোলাস কেন – আরও অনেক শিশুকে মাতৃস্নেহে ভিজিয়ে তাদেরকে এক সবুজ পৃথিবী দিতে পারে| তার জীবনে ডেভিড এক নিমিত্তমাত্র হয়ে এসেছিল, কারণ তার যাবার মধ্যেই লুকিয়ে ছিল এই বৃহত্তর অনুভব| ডেভিডের উপর লনীর আর কোন রাগ নেই| যে ডেভিডকে সে একদিন ভালবেসে সব ছেড়ে চলে এসেছিল, আজ তার জন্য লনীর মনে কোন আকুলতা নেই|

লনী বলল, "জানোই তো আজকাল শহরে গঞ্জে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে নামী অনামী স্পার্ম ব্যাঙ্ক, যেখানে জন্ম দিতে পারে হাজারো পরিচয়হীন দায়মুক্ত পিতা, কিন্তু সেখানেই আবার জন্ম নিতে পারে এমন হাজারো নিকোলাস যারা দিতে পারে আমাদের মতো নিরুপায় নারীকে অজানা মাতৃত্বের স্বর্গ-সুখ| যেখানে অত্যাচারী দায়িত্বহীন স্বামী ছাড়াই এক নারী হতে পারে স্বয়ংসম্পূর্ণা মা| আজ আমি জানি, নিকোলাস ইজ আ পিওর প্রডাক্ট ওফ মাদারলি লাভ| আমি এও জানি হয়তো নিকোলাস চিরকাল ওর বাবাকে এইভাবে পাগলের মতো খুঁজে বেড়াবে; আর ওর সেই প্রশ্নের উত্তর আমি কোনদিনও ওকে দিতে পারব না| কিন্তু বলো তো, পাশে থেকেও সব পিতা কি সব দায় সামলাচ্ছে? তাহলে আজ আমাদের এই সভ্য দেশেও এত পুরুষদ্বারা অত্যাচারিত নারী আর শিশু আছে কেন? বলতে পারো? আমার তো তার থেকে চিরকালের মুক্তি!" এই বলে লনী থামল|

ঘর নিস্তব্ধ| শুধু অজস্র বৃষ্টির জলের ফোঁটা তখনও জানালার কাঁচে আছড়ে পড়ে আবার মিশে যাচ্ছে সেই একই বৃষ্টির জলধারায়| মনে মনে ভাবলাম লনীর কথাগুলো একেবারেই মিথ্যে নয়| তবু আমার কেমন যেন মনে হ'ল এই বিরাট ধোঁয়াটে অস্পষ্টতা ভেদ করে হাজারো নিকোলাস ছুটে আসছে এই হাজার বৃষ্টির ফোঁটা হয়ে... এরা চিরকাল এইভাবে মাথা কুটে চলবে; চিরকাল খুঁজে চলবে তাদের অজানা পিতাকে| তারপর?...

শিল্পী: রিতিকা নন্দী (বয়স ১৫)

যত কান্ড ক্যালকুলেটরে

সংগ্রামী লাহিড়ী

"ধুৎ পাগলি, কাঁদছিস কেন, এই তো আমি কয়েকমাস বাদেই নিউইয়র্কে গিয়ে হাজির হব।"
বলাকা কেঁদেই আকুল। সদ্য বিয়ে হয়েছে। বিয়ের পর পরই পরিযায়ী পাখীর মতো অ্যাটল্যান্টিক পেরিয়ে সুদূর নিউইয়র্কে নতুন নীড় বেঁধেছে রণজয়ের সঙ্গে। সদ্য বিবাহিত শিকদার কত্তা-গিন্নি – রণজয় আর বলাকা। একবছর নিউইয়র্ক-বাসের পর আবার কলকাতায় আসা, সবার সঙ্গে দেখা। ছেড়ে যেতে মন খারাপ হবে না?
যদিও বলাকার বাবা প্রায়ই আমেরিকায় আসেন, নিজের অফিসের কাজে। দেখা হবে খুব শীগগির। কিন্তু মন কি মানে? বাবার গলায় আবার স্নেহের সুর বাজে, "আমার জন্যে একটা ভাল ক্যালকুলেটর দেখে রাখিস তো! কাজে ভারি সুবিধে হয় এই যন্ত্রটি থাকলে। দাম নিয়ে ভাবার দরকার নেই – যা লাগে লাগবে।"
এ হ'ল আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগের কথা যখন ক্যালকুলেটর ছিল পৃথিবীর অষ্টমাশ্চর্য। কাগজ পেন্সিলে আঁক কষার বদলে বোতাম টিপেই তাড়াতাড়ি, নির্ভুল হিসেব নিকেশ বেরিয়ে আসত। যদিও তার ক্ষমতা সে যুগে মাত্র যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগেই সীমাবদ্ধ ছিল। বলাকার বাবা উচ্চপদের অফিসার, ক্যালকুলেটরের ব্যবহার দেখেছেন। নিজেরও একটা থাকলে কাজের বড়ই সুবিধে। দেশে ক্যালকুলেটর খুব একটা পাওয়া যায় না। তাই আমেরিকায় ফেরবার সময় বলাকাকে বলে দিলেন তাঁর জন্যে একটা ক্যালকুলেটর দেখে রাখতে। বলাকা খুবই উৎসাহিত, বাবা তার ওপর ভরসা করে এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দিয়েছেন!

দেশ থেকে ফেরার পথে প্লেনের উড়ানে পাশের সহযাত্রীটির সঙ্গে দিব্যি ভাব হয়ে গেল। খানিক একথা সেকথার পর ভদ্রলোক ধীরেসুস্থে নিজের ব্যাগটি খুললেন। বলাকা চোখ গোল গোল করে দেখছে, ব্যাগ থেকে বেরোল একটি ক্যালকুলেটর! কী আশ্চর্য যোগাযোগ!
- "আমার বাবার একটা ক্যালকুলেটর লাগবে। আমাকেই বলেছেন, দেখেশুনে কিনে দিতে।" বলাকা তার উৎসাহ সামলাতে পারে না।
সহযাত্রী ভারী অমায়িক, "তা বেশ তো, তুমি যদি কেনার আগে ক্যালকুলেটরের সঙ্গে একটু দেখাশোনা করে নিতে চাও, গো অ্যাহেড, আমারটাই তো আছে।"
বলাকা এক পায়ে খাড়া, এর থেকে ভাল প্রস্তাব আর কীই বা হতে পারে।
সহযাত্রী বোতাম টিপে টিপে দেখালেন কেমন করে যন্ত্রগণক সংখ্যা নিয়ে ভেলকি দেখায়। বলাকা অসীম মনোযোগে চেয়ে চেয়ে দেখল। হাত দিতে সাহস করেনি অবশ্য, যদি খারাপ হয়ে যায়? হাজার হলেও অন্যের জিনিস।

ক্লান্তিকর দীর্ঘ উড়ান একসময় শেষ হয়, বলাকা এসে নিউ ইয়র্কে নামে। রণজয় দাঁড়িয়ে আছে। তাকে এয়ারপোর্ট থেকে বাড়ি নিয়ে যাবে। বলাকার সব মনখারাপ নিমেষে উধাও! এই তো তার নিজের জায়গা, নিজের সংসার। দিন আবার চলে অভ্যস্ত ছন্দে। বাবার জন্যে ক্যালকুলেটর খোঁজা চলছে। রণজয়ের সকাল-বিকেল দুখানা চাকরিও চলছে। শুধু দিনের চাকরিতে সংসার চলে না। সপ্তাহের কয়েকদিন রাতেও আরেকটা কাজ করতে হয়।

বলাকা ভাবে, সেও একটা কাজ খুঁজবে, তাতে সংসারেরও সুরাহা হয়, আবার বলাকার একটা এনগেজমেন্টও হয়। তখনকার দিনে কাজ পাওয়া মোটেই শক্ত ছিল না। বলাকার প্রথম চাকরির খোঁজ মিলল ডাইমলার নামে এক কম্পানিতে। বেশ নামীদামী সংস্থা, এরা সিকিউরিটি ডিভাইস, বার্গলার অ্যালার্ম সিস্টেম তৈরী করে। এসব যন্ত্রের যথেষ্ট চাহিদা আছে বাজারে। লং আইল্যান্ডে বেশ বড় অফিস আর কারখানা। সেই কারখানার ম্যানেজার হ'ল ইভার – ইভার সেগলোউইৎজ। পূর্ব ইউরোপের মানুষ, অতি ভদ্রলোক, কাউকে কড়া কথা বলতে পারে বলে মনে হয় না।
বলাকার ইন্টারভিউ নিতে গিয়ে ইভার ঠিক দুটি প্রশ্ন করেছিল। এক – "মিসেস বলাকা শিকদার কি ফাইল করতে পারে?"
বলাকা চিরকাল তার বাবার সঙ্গে ছায়ার মতো আর্দালিকে ঘুরতে দেখেছে, তার হাতে ধরা থাকত ফাইলের গোছা।

ফাইলের সঙ্গে বলাকার পরিচয় কি আজকের? অতএব পূর্ণ আত্মবিশ্বাসে বলাকার উত্তর – "হ্যাঁ"|

দ্বিতীয় প্রশ্ন – "মিসেস শিকদারের কি ক্যালকুলেটরের ব্যবহার জানা আছে?"

বলাকা রোমাঞ্চিত হ'ল | একেই বলে যোগাযোগ! এই তো সেদিনই প্লেনের সহযাত্রীর কাছে ক্যালকুলেটরের ব্যবহার দেখে এল সে| অতএব আবারও একই উত্তর – "হ্যাঁ"|

চাকরি হয়ে গেল| ইনভেন্টরি কন্ট্রোলাররের কাজ| মানে ওই ফ্যাক্টরিতে দৈনন্দিন যতগুলো বিভিন্ন ধরনের যন্ত্র তৈরী হচ্ছে তার স্টক বা খাতা তৈরী করা| সেই সঙ্গে যা যা কিছু বিক্রি হয়ে ফ্যাক্টরি থেকে বেরিয়ে গেল, তাদের হিসেবও গুছিয়ে-গাছিয়ে ফাইল করে রাখা | সেই ফ্যাক্টরির ইনভেন্টরি ম্যানেজারের নাম হ'ল কার্ল| বলাকাকে কার্লের সঙ্গে কাজ করতে হবে| মাইনে ঠিক হ'ল সপ্তাহে পঁচানব্বই ডলার| সে তো অনেক টাকা! বলাকার আনন্দের সীমা নেই, রণজয়ও খুব খুশি|

ইভার বলল, "কাল থেকেই কাজে লেগে যাও তাহলে|"

নিশ্চয়, নিশ্চয়, শুভ কাজে বিলম্ব কীসের?

ততদিনে বলাকার দুয়েকটি প্যান্ট ও শার্ট কেনা হয়েছে | শাড়ি-ব্লাউজের পরিচিত আঙিনা ছেড়ে সে সবে প্যান্টে অভ্যস্ত হচ্ছে | ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিল কালো রঙের এক প্যান্ট পরে| সেই একই প্যান্ট পরে বলাকা পরের দিন কাজে যোগ দিতে গেল|

ইভার খানিকক্ষণ চোখ পিটপিট করে দেখে বলল, "তোমার দেশের মেয়েদের পোশাক যেন কী – শাড়ি না?"

বলাকা মনে মনে একটু সিঁটিয়ে গেল, প্যান্ট পরে না জানি তাকে কত কুচ্ছিতই না দেখাচ্ছে! মুখে বলল, "হ্যাঁ, শাড়িই তো|"

ইভারের প্রশ্ন, "তোমার শাড়ি নেই?"

আর যায় কোথায়, মুহূর্তে বলাকা উৎসাহের আতিশয্যে বেজে উঠল, "নেই মানে? কত যে শাড়ি, গুণে শেষ করা যায় না|"

- "তাহলে কাল থেকে তুমি শাড়িই পরে এসো|"

ব্যস, বলাকাকে আর পায় কে| রোজ একটা করে নতুন শাড়ি, তার সঙ্গে ম্যাচিং ব্লাউজ, মানানসই গয়না – সে এক হইহই কাণ্ড একেবারে| অফিসশুদ্ধ লোক রোজ দেখতে আসে আজ বলাকা কোন শাড়ি পরে এসেছে | আর বলাকা একেবারে রানীর মতো শাড়ির আঁচল দুলিয়ে গর্বিত পায়ে অফিসে ঘোরাফেরা করে|

এমনি করে কাটল কয়েক সপ্তাহ, সুখের স্বর্গে বিচরণ করে| সুখের পরিমাণ আরো বাড়ল যেদিন ইভার তার ঘরে বলাকাকে ডেকে সুসংবাদ দিল | বলাকার মাইনে বেড়েছে ঘন্টা পিছু দশ সেন্ট|

আহ্লাদে ভাসতে ভাসতে রণজয়কে খবরটা দেওয়ামাত্র তার ভুরু কুঁচকে গেল|

- "দশ সেন্ট মাইনে বেড়েছে তোমার? মাত্র দশ সেন্ট?"

বলাকা থতমত, "কেন, দশ সেন্ট কি খারাপ নাকি?"

- "একশোবার খারাপ, খুবই খারাপ |" রণজয় একশভাগ নিশ্চিত, "যারা একদম অকর্মণ্য, তাদের ছাড়িয়ে দেওয়ার আগে ওইরকম মাইনে বাড়ানো হয়|"

শুনে বলাকা খুবই আহত হয়েছে, "দাঁড়াও তো, কাল আমি তাহলে অফিস গিয়ে ওই ইভারকে আগে ধরব, এত খারাপ কেন দেবে আমায় শুনি?"

বলাকার প্রশ্ন শুনে ইভার খানিকক্ষণ চুপ করে রইল| সে আসলে অতিমাত্রায় ভদ্রলোক, উচিত বাক্যও তার মুখ দিয়ে সবসময় বেরোয় না| তারপর আস্তে আস্তে মুখ খুলল, "তুমি, মানে তোমার কাজকর্ম ঠিক, মানে আর কী একদমই... ওই যে কার্ল, সে তো তোমায় নিয়ে অতিষ্ঠ হয়ে গেছে| তুমি সারাদিনে ফাইল-টাইল কিছুই করো না, স্টকের যোগ বিয়োগ তো দূরের কথা|"

বলাকা এবার রেগেছে, "কে বলল আমি ফাইল করি না? যোগ বিয়োগটা নাহয় বাদ রাখি ওই ক্যালকুলেটরটা ঠিক পোষায় না বলে, মানে কোনোদিন ব্যবহার করিনি তো..."

ইভার হাঁ হয়ে যায়, "তবে যে বলেছিলে তুমি ক্যালকুলেটরের ব্যবহার জানো?"

বলাকা অদম্য, "ক্যালকুলেটর দেখেছি তো, চালাতে আর কতক্ষণ? ও হয়ে যাবে| কিন্তু ফাইল করি না বলে আমায় মিথ্যে অপবাদ দেওয়া কেন?"

ইভার এবার হালে পানি না পেয়ে কার্লকে ডাকে|

কার্ল এসে বলে, "তুমি বলাকাকে জিজ্ঞেস কর তো ও কীভাবে ইনভেন্টরি কার্ডগুলো ফাইল করে?"

বলাকা হারবে না, "কেন, কার্ডের রং দেখে দেখে যেটা যেখানে ইচ্ছে সেটা সেখানে সাজিয়ে রাখি।"

শুনে ইভার প্রায় চেয়ার থেকে পড়ে যায় আর কী!

বলাকা শুনতে পায় কার্ল বলছে, "ওই শোনো, শুনলে তো? এবার বোঝো দিনের শেষে কী পরিমাণ অব্যবস্থা সামলে আমায় ইনভেন্টরির হিসেব ঠিক করতে হয়, স্টক আপডেট করতে হয়। এ আমি আর পেরে উঠছি না, আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, হয় তুমি আমায় বিদায় দাও না হলে বলাকাকে ছাড়ো।"

ইভার হাতের পেন্সিলটা আস্তে আস্তে টেবিলে ঠুকছে, "শুনলে তো? কার্ল তোমার সঙ্গে আর কাজ করতে পারছে না, তোমায় ছেড়ে দিতে বলছে। কিন্তু একটা কথা বলো দেখি, এখানকার হাইস্কুলের ছেলেমেয়েগুলোও তো ফাইল করতে জানে, ওদের স্কুলেই এগুলো শিখিয়ে দেয়। তুমি কি সেটুকুও শেখোনি?"

এবার বলাকার সম্মানে লাগে। ফাইল তুলে খোঁটা দেওয়া? নাহয় বলাকা শুধু ফাইল হাতে আর্দালিকে বাবার পিছনে ঘুরতেই দেখেছে, নিজে কোনোদিন ফাইল করেনি, তা বলে এরকম অপমান!

ঝাঁঝিয়ে ওঠে, "না, আমাদের হাইস্কুলে লেখাপড়া করায়, ফাইল করতে শেখায় না। তা আমি যখন এতই অকর্মণ্য, আমাকে তাহলে বিদায় দেওয়া হোক, কাল থেকে আমি আর আসব না।"

ইভার এবার কার্লের দিকে তাকায়, "বলাকাকে কাজটা শিখিয়ে নিলে হয় না? ফাইলিং তো আর এমন কিছু হাতি-ঘোড়া ব্যাপার নয়?"

কার্ল ঘাড় গোঁজ করে বলে, "শেখাতে পারি, কিন্তু শিখবে কে? তুমি তাকে শাড়ি পরে অফিসে আসতে বলেছ, সে তো সারাদিন শুধু শাড়ি আর সাজসজ্জা নিয়েই ব্যস্ত। যেন প্রিন্সেস! ও কাজ শিখবে?"

ইভার এবার বলাকার পক্ষ নিল, "শিখবে, শিখবে, যে শাড়ি সামলাতে পারে সে ইনভেন্টরিও সামলে রাখতে পারবে। তুমি ওকে নিয়ে কাল থেকেই লেগে যাও দেখি?"

বলাকাকেও মৃদু একটু ধমক দিল, "আগে বলোনি কেন যে তুমি ফাইলিং জানো না? আমরা শিখিয়ে নিতাম তাহলে। আমরা তো ভাবতেই পারিনি যে কলেজ পাস করে কেউ... যাকগে, কাল থেকেই কার্লের কাছে শিখতে শুরু করে দাও।"

বলাকার শিক্ষানবিশী শুরু হ'ল পুরোদমে।

কিছুদিন কাজটা শেখার পর তার একটু একটু লজ্জাই করতে লাগল আগের কথা ভেবে। না জেনে কাজে কী গন্ডগোলটাই না করেছে সে! কার্ল দিনের পর দিন এই মাৎস্যন্যায় মুখ বুজে সামলে গেছে, তারপর একেবারে অসহ্য হয়ে ওঠায় নাচার হয়ে শেষটায় ইভারের কাছে গেছে।

এর পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। বলাকা লক্ষ্মী মেয়ে, চটপট শিখে নিয়েছিল কাজকর্ম। ক্যালকুলেটর দিয়ে যোগ-বিয়োগ করা, ইনভেন্টরি কার্ড সাজিয়ে রাখা, স্টক মিলিয়ে নেওয়া – সব। কয়েক মাসের মধ্যেই বলাকা সুদক্ষ এক কর্মী। তার প্রশংসায় কার্ল তখন পঞ্চমুখ, ইভার তা শুনে মিটিমিটি হাসে। মাইনে বাড়ে কাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে।

ডাইমলারের কাজই বলাকার প্রথম চাকরি, প্রবাসে স্বাবলম্বী হবার পথে প্রথম পা ফেলা। এর পর অনেক পথ হাঁটা, অভিজ্ঞতার ঝুলি ভরে নেওয়া দীর্ঘ কর্মজীবনে। ইভার আর কার্ল-এর মতো দুই খাঁটি মানুষকে পাশে পেয়েছিল বলেই না তা সম্ভব হয়েছিল! সময়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে আরো জোরদার।

কার্ল এখন অশীতিপর। নিজের বাড়িতেই থাকে, একলা। বলাকাকে দেখলে কোঁচকানো মুখে বড় মিষ্টি হাসি ফোটে। প্যান্ট-শার্ট দেখে মাঝে মাঝে বলে, "তুমি কি সত্যি আর শাড়ি পরো না? আমার ওপর রেগে গিয়ে শাড়ি পরাই ছেড়ে দিলে?"

বলাকা হাসে, "নাঃ, এখন শুধু পার্টিতেই শাড়ি পরা।"

দুজনের দেখা হলেই ইভারের কথা ওঠে। কত স্মৃতি।

ইভার ফিরে গেছে তার মাতৃভূমি সেই পূর্ব ইউরোপের ছোট্ট গাঁয়ে। গরীব বাচ্চাদের জন্যে একটা স্কুল খুলেছে, হাসপাতাল চালায়। মাঝে মাঝে ছবি পাঠায়। বুড়ো হয়ে গেছে অনেক, নুয়ে পড়েছে দীর্ঘদেহ। কিন্তু মুখে সেই অনাবিল হাসি। যে হাসিতে একদিন উজ্জ্বল হয়েছিল বলাকার জীবন। আজ ঘুরে দাঁড়িয়েছে যুদ্ধবিধ্বস্ত এক ছোট্ট পাড়াগাঁ।

অনামিকা

মল্লিকা ব্যানার্জী

আতু…! ভুতু…!

কচি কচি গলায় পাপান চীৎকার করে ডাকছে রাস্তার কুকুর ছানাদুটোকে, রান্নাঘর থেকে লক্ষ্য রাখছে সেমন্তী | বছর সাতেকের পাপান গড়িয়ায় আসার পর থেকেই খুব একা হয়ে পড়েছে; বায়না ধরেছিল কুকুর চাই | ওদিকে সেমন্তী একা হাতে সারাদিন কর্তার অফিস, রান্নাবান্না, ঘর গোছানো, পাপানের দেখাশুনো করতে করতেই হিমশিম খায় | এর ওপর আবার একটা অবলা জীবের দায়িত্ব! কিছুতেই রাজী হয়নি সেমন্তী | তাই রাস্তার নেড়ী কুকুরের সদ্য জন্মানো বাচ্চাদুটোকে দেখাশুনোর ভার পাপান কারুর অনুমতির অপেক্ষা না করেই নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে | এতে অবশ্য সেমন্তীরও প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় আছে | এই এখন যেমন একবাটি দুধ ভাত মেখে নিয়ে পাপান চেঁচিয়ে তাদের ডেকে চলেছে |

- “এই নে তোর আতু আর ভুতুকে, আমাদের সিঁড়ির নীচে শুয়েছিল |”

আর একটা কচি গলার আওয়াজ পেয়ে উঁকি মারে সেমন্তী | দেখে পাপানের বয়সী একটি বাচ্চা একটা নারকেল দড়ি বেঁধে দু’হাতে আতু আর ভুতুকে টানতে টানতে আনছে | বেশ দেখতে বাচ্চাটি – ফর্সা, রোগা, একমাথা কোঁকড়া চুল, তবে সবচেয়ে সুন্দর ওর টানা টানা চোখদুটো |

- “এই, তুই আমার পেটসদের গলায় দড়ি বেঁধেছিস কেন? ওদের কষ্ট হচ্ছে না! কী বুদ্ধুরাম রে তুই! তোর নাম কী?” বেশ রাগী গলায় বলে পাপান |

বেচারা ছেলেটা একটু ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি আতু-ভুতুর গলার দড়ি খুলতে খুলতে বলে, “আমি বিল্টু, মাঠের ওপাশে আমাদের বাড়ী |”

এবার একটু প্রসন্ন গলায় পাপান বলে, “আমরা এখানে গত মাসে এসেছি | আগে মুম্বাইতে থাকতাম | ওখানে কত বন্ধু ছিল, এখানে কেউ নেই, তুই আমার বন্ধু হবি?”

এবার লাল মাড়ি বের করে একগাল হেসে ঘাড় কাত করে সম্মতি জানায় বিল্টু |

পাপান বেশ বিজ্ঞের মতো ওর কাঁধে হাত রেখে বলে, “তোর বার্থডে কবে রে? আমার বার্থডে পরশু দিন, তুই আসবি তো? চিকেনের লেগ পিস ভালবাসিস তো? মামমাম বলেছে সেদিন আতু-ভুতুর জন্যও চিকেন স্টু বানিয়ে দেবে, আমরা দুজনে আতু-ভুতুকে চান করাব, খাওয়াব, কেমন?”

কড়াই নামিয়ে তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে বেরিয়ে এসে সেমন্তী দেখে তারই বয়সী একটি মেয়ে ‘বিল্টু বিল্টু’ বলে ডাকতে ডাকতে এদিকেই আসছে |

ওকে দেখে একটু হকচকিয়ে গেলেও মিষ্টি হেসে হাতটা অল্প তুলে নমস্কারের ভঙ্গি করে বলে, “আমি অনামিকা, আপনারা বোধহয় নতুন এখানে, তাই না?”

সেমন্তীও প্রতিনমস্কারের ভঙ্গি করে হেসে বলে, “ঠিক বলেছেন, এ বাড়ী আমার স্বর্গীয় খুড়শ্বশুরের, নিঃসন্তান মানুষ ছিলেন | আমার স্বামীকেই দানপত্র করে গেছেন | আমরা আগে মুম্বাইতে ছিলাম; এখন কর্তার কলকাতায় পোস্টিং, তাই বাড়ীভাড়া না নিয়ে এটাই সারিয়ে-সুরিয়ে থাকতে এলাম | আসুন না ভেতরে, এক কাপ চা খেয়ে যান, সবে তো এগারোটা বাজে | সদ্যই এসেছি তাই বেশি আলাপ পরিচয় হয়নি, আসুন না গল্প করা যাবে |”

অনামিকা একগাল হেসে বলে ওঠে, “আপনি নয় তুমি বলো | আর এখন নয় ভাই, বিকেলে পাঁচটায় এসে চা খাব | তখন আমরা গল্প করব, আর বাচ্চারা তোমাদের এই বাগানে খেলবে | এখন আমার মরারও সময় নেই গো, আমার কর্তার ব্যবসা আছে | দুপুরে বাড়ীতে ভাত খেতে আসে | মেলা কাজ বাকি গো, ছেলের আবার দুপুরে টিউশন | বিকেলে টিউশন থেকে ফেরার পথে তোমার বাড়ীতে চা খেয়ে যাব’খন | তা তোমার নামটাই তো জানা হয়নি |”

‘সেমন্তী বসু’, হেসে বলে সেমন্তী | এরপর বিল্টুকে প্রায় হিড়হিড় করে টানতে টানতে বাড়ীর দিকে ছুট লাগায় অনামিকা |

ওদের মাঠ পেরিয়ে যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিজের মনেই ভাবে সেমন্তী, ...যাক্ বাবা, একটা সমবয়সী মেয়ে পাওয়া গেল! নাহলে এখানে বেশিরভাগ মহিলাই ম্যাক্সির ওপর ওড়না বা গামছা জড়িয়ে কলতলায় গল্প করে | ও হেসে কথা বলতে গেলেই এ ওর গায়ে ঠেলা দিয়ে নিজেরা ফিসফিস করে... নয়তো চোখ টিপে, মুখ মচকে কী

এক অজানা ইশারায় নিজেদের মধ্যে কী যে কথা বলে – সেমন্তী কিছুই বোঝে না। শুধু আর্থিক নয় শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারেও আশপাশের লোকেরা একটু বেশিই মাটো। এরই মধ্যে পাশের বাড়ীর শর্মিলা বৌদির সাথেই যা একটু ভাব হয়েছে। অমিতাভদা ভীষণ গপ্পে, প্রায়ই আসেন ওদের বাড়ীতে আড্ডা দিতে। শর্মিলা বৌদির ছেলেপুলে হয়নি, সারাদিন ওঁর পঙ্গু শ্বশুরমশাই মানে বিনোদ জ্যেঠুর দেখাশোনা করেন, আর বালগোপালের সেবা করেন।

পাড়ায় যেমন কিছু আদি লোক রয়েছেন, আবার ফ্ল্যাটবাড়ী গড়ে ওঠায় কিছু বাইরে থেকে আসা মানুষও রয়েছেন। তবে তাঁদের নাক বড়ই উঁচু, নিজেদের ফ্ল্যাটের লোকজনদের সঙ্গেই মেশে। আসলে সবটাই কেমন প্রাণহীন, তাই বিল্টু আর অনামিকাকে পেয়ে পাপান আর সেমন্তীও বেশ খুশি হয়ে উঠল।

ঠিক পাঁচটায় ওরা আসতেই প্লেট ভর্তি কাজু, চিপস্, বিস্কিট, কেক টেবিলে এনে রাখল সেমন্তী। অত খাবার দেখে বিল্টুর চোখদুটো চকচক করে উঠলেও মায়ের মুখের দিকে তাকাল। যতক্ষণ না মা ঘাড় বেঁকিয়ে অনুমতি দিল একটা কিছুও ছোঁয়নি বাচ্চাটা; বোঝা গেল মায়ের কাছে ভালই সহবৎ শিখেছে। পাপানের তো খাওয়ার দিকে কোনও নজরই নেই; কোনমতে বিল্টু কেকটা শেষ করতেই, ওকে নিয়ে চলল নিজের ঘরে ভিডিও গেমস্ দেখাতে।

চা খেতে খেতে বাড়ীর চারপাশটা চোখ বুলিয়ে অনামিকা বলে ওঠে, “কী সুন্দর সাজিয়েছ গো; আমার ইচ্ছে হলেও উপায় নেই। বাপেরবাড়ীতে থাকি যে! বাবা যা কিপটে বুড়ো, হাত দিয়ে একপয়সা গলে না।”

অবাক গলায় সেমন্তী বলে, “এই যে বললে বরের ব্যবসা – খেতে আসবে দুপুরে?”

একটু হেসে বিষাদমাখা গলায় বলে, “নতুন এসেছ তো তাই শোননি, ঐ মোড়ের মাথার টেলিফোন বুথটা আমার বরের, ও ঘরজামাই। আমার বাবা রেলে কাজ করতেন, আমরা হাওড়ায় থাকতাম, আমি হাওড়া গার্লস কলেজে পড়েছি। বাবা রিটায়ার করে দিদির বিয়ে দিয়ে এইখানে বাড়ী করল। বাড়ীতে তখনও ফোন আসেনি, তাই বুথে যেতাম দিদিকে ফোন করতে। ব্যস, প্রেমে পড়ে গেলাম। পালিয়ে বিশালাক্ষী মন্দিরে গিয়ে বিয়ে করেছিলাম। ওর বাড়ী বাংলাদেশে। বন্ধুর সাথে মেসবাড়ীতে থাকত। বিয়ের পরে কোথায় যাব ঠিক করিনি, ঝোঁকের মাথায় বিয়ে করে ফেলি। দুই ননদ থাকে দমদমে, কিন্তু ওদের বাড়ীতে থাকতে দিতে চাইল না। আমার দিদিও জামাইবাবুর ভয়ে আমাদের ফিরিয়ে দিল। অবশেষে বাবা-মা’র কাছেই আসি। বাবা মা কখনই বিয়েতে রাজী ছিল না; তাই প্রথমে আমাদের রাখতে চায়নি – আমাকে বলেছিল যেন ওর ধারে-কাছে না যাই। কিন্তু প্রেমে পড়লে কে কবে কার কথা শোনে বলো তো? মেসেই দেখা করতাম। ব্যস, বিল্টু পেটে এসে গেল। তখন বাবা আবার লোক ডেকে বিয়ে দেওয়ালেন। পাড়ায় খুব ঢিঢি পড়ে গিয়েছিল, তাই আমি আর কারুর সাথে মিশি না। আমার কর্তা বুম্বা এম কম পাস, একদিন দেখো ও ঠিক অনেক বড় হবে।

আমার সব কথা তো শুনলে। এবার তোমার গল্প বলো।”

ঘোরের মধ্যে ওর গল্প শুনছিল সেমন্তী। এবার বলল, “আমরা হয়তো সমবয়সী। কিন্তু তোমার জীবন কত রোমাঞ্চকর! আর আমার কী ভীষণ সাদামাটা। ভাল মেয়ে, ভাল ছাত্রী, ভাল বউ আর ভাল মা হয়েই কেটে গেল, বলার মতো কিছুই নেই। বালিগঞ্জে বাপেরবাড়ী, ভাল স্কুলে পড়েছি, তারপর কলেজ শেষ হতে না হতেই কাগজ দেখে সম্বন্ধ করে বাবা মা বিয়ে দিয়ে দিল। আমার কর্তা, সুমঙ্গলরা প্রবাসী বাঙালি; পাটনায় এক’শ বছরের পুরনো বাড়ী। ওর এক কাকা এই বাড়ীটা ওকে দিয়েছেন। আমার কর্তা একটা আধা-বেসরকারী সংস্থায় আছেন। কী সব গভর্নমেন্টের শেয়ার কেনাবেচার কাজ সব – আর বদলির চাকরি, আমি বাপু ভাল বুঝি না। বিল্টু কোন স্কুলে পড়ে গো? পাপানকে পাটুলির কাছে একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে দিয়েছি।”

হঠাৎ অনামিকা সেমন্তীর হাতদুটো জড়িয়ে বলে ওঠে, “আমার একটা উপকার করবে? আমার অবস্থা তো বুঝছই, কিন্তু ছেলেটাকে সাউথ পয়েন্টে পড়াতে চাই, তুমি একটু তোমার ছেলের সাথে পড়াবে ওকে? তাহলে টিউশনের ক’টা টাকা বাঁচে, বাপেরবাড়ীতে থাকি মানে যে খুব আদরে থাকি তা ভেবো না। গ্যাসের দাম, ইলেক্ট্রিকের বিল, রবিবারের মাংস সব আমাদের খরচ। চিন্তায় চিন্তায় আমার হাই সুগার। দুবেলা রান্না, ঘর ঝাড়া-মোছা সব আমার ওপর, জানো। ছেলেটা যতক্ষণ

তোমাদের বাড়ীতে থাকবে, একটা ভাল পরিবেশে থাকবে। উঠতে বসতে আমার বাবা মা বুম্বার নিন্দে করে। ছেলে বড় হচ্ছে, বাবার নিন্দে শুনলে রেগে যায়। ছেলেটা বোঝে কিছু একটা ঠিক নেই, গুম মেরে থাকে। তোমার ছেলেটা বড় ভাল আর মিশুকে, বিল্টুরও খুব ভাল লেগেছে ওকে। তুমি দাদাকে জিজ্ঞেস করে জানিও, আজ উঠি ভাই।"

এরপর থেকে প্রায়ই দুপুরে আসত বিল্টু। অবাক হয়ে পাপানের খেলনাগুলো নাড়াচাড়া করত; কোনোটা পছন্দ হলে হাতে নিয়ে বসেই থাকত। বিকেলে অনামিকা ওকে নিতে এলে ও সেইসব মাকে দেখাত, আর মায়ের দিকে বড় বড় ছলছল চোখ মেলে তাকিয়ে থাকত। ঐটুকু পাপান কী বুঝত কে জানে, গম্ভীর হয়ে বলত, "ওই খেলনাটা দুদিন থাকুক তোর কাছে। আন্টি, তুমি পারমিশন দাও প্লিজ। বাবা কাল চিকেন আনবে বলেছে তাই বিল্টু আমার সঙ্গে লাঞ্চ করবে কিন্তু। আমার তো কোনো ভাইবোন নেই, তুমি বিল্টুকে আমাদের বাড়ীতে রেখেই দাও না গো।"

অনামিকা হাসতে হাসতে বলে, "সেই ভাল। তোমার মাকে বলো বিল্টুকে দত্তক নিতে, আমিও তাহলে নিশ্চিন্ত হই।"

অনামিকার ছিপছিপে চেহারা, মাজা মাজা রং, মোটা কালো চকচকে চুলে বিনুনি, কাটা কাটা নাক-চোখ-মুখ – এককথায় লোকের নজর কাড়ে। প্রত্যহ মাঠের পাশে মাচায় বসা চ্যাংড়া ছেলেগুলোর মন্তব্য যেতে আসতে সইতে হয় ওকে। ওর ছেলেটাও বোঝে মায়ের রাগ-দুঃখ, তাই ওদের দেখলেই লাথি দেখায়।

একদিন কৌতূহলের বশে সেমন্তী বুম্বাকে দেখতে বুথে চলে গেল, পাপানকে শর্মিলাদির কাছে রেখে। সেখানে গিয়ে সত্যিই চমকে গেল সেমন্তী। টকটকে ফর্সা, চাবুকের মতো ব্যায়াম করা চেহারা, একমাথা ঢেউ খেলানো চুল, চোখে সানগ্লাসেস্ পরে বাইক নিয়ে হিরো স্টাইলে বেরিয়ে গেল বুম্বা। বুথে বসিয়ে গেল অনামিকার বাবাকে। জামাই বেরোতেই ভদ্রলোক সেমন্তীকে বললেন, "আপনার বাড়ীই যায় তো আমার মেয়ে আর নাতি? আপনার স্বামীকেও তো দেখি বাইক নিয়ে অফিস যেতে, কিন্তু আমার জামাইটির মতো এমন লক্কা পায়রা নয়। আমরাও চেয়েছিলাম দেখেশুনে মেয়ের বিয়ে দিতে। কী করে যে ও এক চালচুলোহীন ফেরেব্বাজের পাল্লায় পড়ল! পাড়ায় আমাদের মাথা কাটা গেল, মুখে চুন-কালি মাখাল শয়তানটা।

কী বলবে ভেবে না পেয়ে আস্তে আস্তে সেমন্তী শর্মিলাদির বাড়ী ফিরে এসেছিল। এ বাড়ীতে এলেই সকাল বিকেল ধূপ-ধুনোর গন্ধ দারুণ লাগে সেমন্তীর। পাপানেরও জেঠিমার বাড়ী ভাল ঘিয়ের লাড্ডু জোটে, দাদুর সাথে ক্যাচ-ক্যাচ খেলা হয় – দারুণ খুশিতে থাকে।

ওকে দেখেই শর্মিলাদি বলে ওঠেন, "সেমন্তী, তোদের বাড়ী অনামিকাকে দেখি আজকাল ছেলেকে নিয়ে খুব ঘন ঘন আসছে। এমনিতে কিছু না তবে ওর বরটা তো সুবিধের নয় – অনেকের টাকা মেরেছে। কখনও শুনি বাড়ীর দালালি করে, কখনও ঘর রঙের কন্ট্র্যাক্ট নেয়, কখনও বলে টেলিফোন অফিসে কাজ করে। তোর অমিতাভদার কাছেও কয়েক দফায় প্রায় বিশ হাজারের মতো টাকা নিয়েছে। তবে অনামিকা মেয়েটা কিন্তু খুব সৎ। বিপদে পড়ে আমার থেকে দু'একবার ধার নিয়েছে, কিন্তু পরে ঠিক ফেরৎ দিয়েছে। আসলে তোরই বয়সী তো মেয়েটা, তোদের ভাল খেতে দেখে, ভাল কাপড়-চোপড় পরতে দেখে ওরও হয়তো আফসোস হয়। কিছু মনে করিস না – সাধারণত সম্পর্কটা সমানে সমানেই ভাল রে! বিপদে পাশে থাকিস, কিন্তু বেশি বন্ধুত্ব করলে অনামিকা বারবার তোর সাথে নিজের অবস্থার তুলনা করবে। ওর বাবা-মাও তোকে দেখিয়ে ওকে খোঁটা দেবে। এসব থেকেই হয়তো বা দীর্ঘশ্বাস লাগে... যাক্, ছাড় ওসব, এখন প্রসাদ খাবি চল।"

এই জন্যই সেমন্তীর এই দিদিটিকে এত ভাল লাগে, বড় ভাল মানুষটি। অমিতাভদাও ভাল লোক; তবে কারণে অকারণে কেমন একটু গায়ে হাত দেবার চেষ্টা করেন। অবশ্য সেটা সেমন্তীর মনের ভুলও হতে পারে। ছোট থেকে মেয়েদের স্কুল, মেয়েদের কলেজে পড়েই এই হাল হয়তো!

কিন্তু সত্যিই শর্মিলাদির কথাই ঠিক হ'ল। এর ঠিক মাসখানেক পর পাড়ায় হৈচৈ – বুম্বা নাকি শেয়ার বাজারে সর্বস্ব খুইয়েছে। এছাড়া পাড়াতেই অনেকের কাছে টাকা ধার করে ফেরার হয়েছে। অনামিকা আর বিল্টু আসা বন্ধ করল সেমন্তীদের বাড়ী।

একদিন পাপানের কান্নাকাটিতে সেমন্তীই গেল মাঠ

পেরিয়ে অনামিকার বাপেরবাড়ীতে দেখা করতে| গিয়ে চমকে উঠল সেমন্তী! কী চেহারা হয়েছে অনামিকার! সুগার চার'শর ওপর, চুল উঠে, চেহারা দড়ি পাকিয়ে বত্রিশের মেয়েকে বাষট্টি লাগছে|

সেমন্তীকে দেখে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে অনামিকা দরজা বন্ধ করে বলল, "মরণ কেন আসে না বলতে পারো? তোমায় দেখে ঈর্ষা হতো, ভগবান শাস্তি দিলেন! শেয়ার কিনে বুম্বা তোমার বরের মতো বড়লোক হতে গেল | জানো, কাবুলিওয়ালার থেকেও ধার নিয়েছে, পুলিশ খুঁজছে ওকে | আমাকে সর্বনাশের শেষ সীমায় ঠেলে দিয়ে বাংলাদেশে পালিয়েছে ও | ছেলেটাও কি বাপের মত হবে গো! একগলা মদ গিলে বাড়ী ফিরবে? আমি মরলে বাবা-মা নিশ্চয়ই নাতিকে ফেলবে না, বলো? এখন তো আমায় দেখলেই ওরা জ্বলে যাচ্ছে| আমি মরলেই সব জুড়োবে|"

- "কী যা তা বলছ! সব ঠিক হবে, তুমি বুক বেঁধে দাঁড়াও | তোমাকেই তোমার ছেলেকে বড় করতে হবে | মরার চিন্তা মাথায়ও আনবে না একদম! বাবা-মার বয়স হয়েছে, আর আঘাত দিও না|" বলে সেমন্তী|

- "আমায় হাজার পাঁচেক টাকা দেবে গো বিশ্বাস করে? ঠিক ফেরৎ দিয়ে দেব| বাবার কাছে চাইতে পারছি না, ভীষণ রেগে আছে|" ধরা গলায় বলে অনামিকা|

সেমন্তী বলে, "আচ্ছা দেব, শর্মিলাদির কাছেও বলেছ কি?"

নামটা শুনেই চমকে উঠে বলে অনামিকা, "ওর বরটা লুচ্চা, জানোয়ার| বুম্বা বিশ হাজার ধার নেওয়ায় আমাকে ওর সাথে শুতে বলেছিল| ওকে এড়িয়ে চলো|"

এবার সেমন্তী ভীষণ রেগে বলে উঠেছিল, "তোমরা বর-বউ লোকের কাছে টাকা ধার করো, শোধ করো না; আবার ভদ্রলোকেদের বদনাম করো, ছি ছি! আমার কাজের মাসীর হাত দিয়ে টাকা পাঠিয়ে দেব, পেয়ে যাবে| তবে মাপ করো – আমার পক্ষে তোমার সাথে আর সম্পর্ক রাখা সম্ভব নয়|"

এরপর টাকা পাঠিয়ে আর খোঁজখবর নেয়নি সেমন্তী| কানাঘুষায় শুনেছিল দিদি-জামাইবাবু, বাবা সবাই অনামিকাকে চাপ দিচ্ছে বুম্বাকে ডিভোর্স দিতে, কিন্তু সে রাজী হচ্ছে না|

এর কিছুদিন পরে একদিন ভোর থেকে পাড়ায় হৈচৈ, পুলিশ এসেছে – বুম্বা ধরা পড়েছে| পাড়ার শেষপ্রান্তে একটা ভাঙ্গা মন্দির আর একটা মজা-ডোবা আছে, ওখানেই নাকি লুকিয়ে ছিল বুম্বা | কিন্তু তার সাথে অনামিকাও নাকি নিখোঁজ| কেউ কেউ বলছে অনামিকাকে প্রায়ই মন্দিরের দিক থেকে ভোর রাতে ফিরতে দেখত | হয়তো বুম্বাকে খেতে দিতে যেত, কিংবা টাকা যোগাত|

ঠিক দুদিন পরেই আবার বিশাল হৈচৈ, মজা-ডোবায় অনামিকার বডি ভেসে উঠেছে| সবাই বলাবলি করছে, "আহা রে, মেয়েটা শেষে আত্মহত্যা করল; লজ্জায় নিজেকে শেষ করে দিল!"

পুরো ঘটনায় সেমন্তী ভীষণ মুষড়ে পড়ে| ওরই বয়সী মেয়েটা এ কী করল! নিজের ওপরেই খুব রাগ হচ্ছিল সেমন্তীর, কেন অনামিকার পাশে দাঁড়াল না! বন্ধু হিসেবে ওকে কি আর একটু মনের জোর যোগানো উচিত ছিল না সেমন্তীর!

সেমন্তী একদিন পাপানকে নিয়ে বিল্টুর কাছে গেল| অনামিকার বাবা মা ভেঙ্গে পড়েছেন খুব| আসার আগে একটা মুখবন্ধ খাম ওর হাতে দিয়ে বললেন, "ও বারবার বলছিল খুব শীগগিরই এটা তোমাকে দিয়ে আসবে, তবে সে সময় আর পেল না| এখনও ভাবতে পারছি না আমার মেয়ে মারা গেছে| ছেলে ওর প্রাণ ছিল | দুদিন আগে সামনের স্কুলে আঁকার শিক্ষকতা পেল | এছাড়া কোথায় একটা প্রতিযোগিতায় আঁকা পাঠিয়ে দশ হাজার টাকা পেল | বলছিল ঐ খাম আর মিষ্টি নিয়ে তোমাদের বাড়ী দেখা করতে যাবে| সেই মেয়ে কী করে আত্মহত্যা করতে পারে!"

ভারাক্রান্ত মনে বাড়ী ফিরল সেমন্তী| রাতে খাম খুলে দেখে ধার নেওয়া সেই পাঁচহাজার টাকা, আর সেই সঙ্গে একটা ছোট্ট চিঠি –

ভাই সেমন্তী,

জানি না তো ভাই, বিতৃষ্ণায় মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেবে কিনা, তাই এই চিঠি লেখা| নয়তো নিজের মুখেই খুশীর খবরটা দিতাম | জানো, আমার কলেজ জীবনে আঁকা পুরনো বেশ কিছু ছবি দুবাইতে থাকেন এক মহিলা কিনেছেন | ফেসবুকেই আলাপ | এছাড়া সামনেই একটা ছোটদের স্কুলে পার্ট-টাইম আঁকা শেখানোর চাকরিও পেয়েছি | সেদিন ঠিকই বলেছিলে নিজের ছেলেকে নিজেকেই বড় করতে হবে| আমি ঘুরে দাঁড়াবই, দেখে নিও | রাত অবধি শাড়ীতে আঁকছি,

অর্ডারও পাচ্ছি ভালই। দুর্বলের মতো মরব না; ঠিক লড়ে যাব, দেখো। বিল্টুর স্কুলে ভর্তির জন্য টাকা জমা দেওয়ার লাস্ট ডেট এসে গিয়েছিল, হাজার পাঁচেক কম পড়ছিল দুল বেচার পরেও। তাই মরিয়া হয়ে তোমার কাছে সেদিন চেয়েছিলাম টাকাটা।

শর্মিলাদি বড়ই ভাল মানুষ, ওঁর মুখ চেয়েই আমি অমিতাভদাকে পুলিশে দিইনি! সেদিন রেগে গেলে তুমি, ভাবলে অমিতাভদাকে মিথ্যে বদনাম দিচ্ছি। শোন তবে একটা ঘটনা বলি...

বুম্বা টাকা ধার নেওয়ার পর থেকেই অমিতাভদা আমাকে ভোগ করার জন্য ছোঁক ছোঁক করে চলেছে। প্রতি পূর্ণিমাতে শর্মিলাদি আমাকে আর বিল্টুকে ডাকতেন গোপালের ভোগ খেতে। সিঁড়িতে বা ছাদে একা পেলেই অমিতাভদা সজোরে আমার বুক কচলে দিত, নয়তো পাছায় খামচে দিত। তারপরেই নির্লিপ্ত মুখে সরে যেত যেন কিছুই হয়নি।

সবার সামনে কী অমায়িক মানুষ! ছেলেকে চকোলেট কিনে দিচ্ছে, আমায় অনামিকা মা বলে ডাকছে, আমার বাবা-মাকে দাদা-বৌদি বলে। কাকে কী বলব! এমনিই এত বদনাম আমার! কে বিশ্বাস করবে আমাকে?

আমি প্রথমে কাকুই বলতাম ওঁকে আর শর্মিলা বৌদিকে কাকিমা – পরে যখন দেখলাম বুম্বা 'দাদা' বলে, আমিও দাদা-বৌদি বলতে শুরু করি।

প্রথমে ভাবতাম অমিতাভদা নির্বিষ, ছেলেপুলে হয়নি, অল্পবয়সীদের গায়ে হাত বুলিয়েই সুখ পায়। পাড়ায় এত নামডাক ওর, বৌদি দেবতার মতন পুজো করেন মানুষটাকে, এক্ষেত্রে ফালতু চেঁচামেচি করে কী লাভ! লোকটাও বদলাবে না, আর লোকে ভাববে একে তো অপদার্থ বুম্বাটা টাকা দিতে পারছে না; তার ওপর বউকে দিয়ে বদনাম করাচ্ছে। আমি যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতাম, কোনও সুযোগই দিতাম না। ওকে দেখলেই সরে পড়তাম। কিন্তু তাতে যে আরো ক্ষেপে উঠেছিল বুঝিনি।

তোমরা তখনও আসোনি; অমিতাভদা বুম্বাকে বলেছিল, "অনামিকাকে বলিস বৌদি আজ রাতে ন'টা নাগাদ ডেকেছে। রাতে পুজো, বিল্টুকে আনতে হবে না। সবার জন্য প্রসাদ ওর হাতেই দিয়ে দেবে বৌদি।

গিয়েছিলাম জানো, কিন্তু সারা বাড়ী নিঝুম, কোনও ধূপ-ধুনোর গন্ধ নেই। মনটা কেমন কু গাইছিল। তবু বেল বাজালাম। অমিতাভদা দরজা খুলে বাইরের ঘরের পাশে ছোট ঘরটায় বসাল। বলল, "এই কাছেই গেছে তোর বৌদি, তুই ততক্ষণ সরবৎ খা আমি আসছি বাবাকে দেখে।"

কী জানি কী মনে হয়েছিল – আমি ইনডোর প্ল্যান্টের টবে ঢেলে দিয়েছিলাম সরবৎটা। জানি না ঘুমের ওষুধ ছিল কিনা!

খানিক পরে অমিতাভদা ঘরে ঢুকেই একটানে কাপড় খুলে আমার নাভিতে, বুকে মুখ ঘষতে শুরু করেছিল। মা কালী বোধহয় ভর করেছিলেন সেদিন আমার ওপর, পাথরের অ্যাশট্রেটা ছুঁড়ে মেরেছিলাম ওর চোখ লক্ষ্য করে। গলগল করে রক্ত বেরোতেই চোখ চেপে বসে পড়ে শয়তানটা।

এরপর গায়ে কাপড় জড়িয়ে, দরজা খুলে পালিয়ে এসেছিলাম। আমার কথা বিশ্বাস না হলে ওর ডান ভ্রুর ওপরের গভীর দাগটা কীসের দাগ জিজ্ঞাসা করো ওকে।

অনেকদিন পরে জমানো কথাগুলো তোমাকে বলে একটু হালকা লাগছে ভাই। টাকাটা ফেরৎ দিলাম। ভাল থেকো বন্ধু!

ইতি

অনামিকা

পুনঃ

একটা কথা জানিয়ে রাখি, বুম্বা বাংলাদেশে যায়নি। বনগাঁর কাছে ননদের এক আত্মীয়ের বাড়ীতে আছে। এ পাড়ার ভাঙ্গা মন্দিরে মাঝে মাঝে এসে আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে যায়। আমি একদিন ভোরবেলা মন্দির থেকে ফেরার পথে অমিতাভদাকে দেখেছি ওদের ছাদ থেকে তোমার বেডরুমের জানলায় উঁকি দিতে। জানি না শয়তানটাও আমাকে দেখেছিল কিনা। তুমি সাবধানে থেকো, পারলে কখনও লোকটার মুখোশ ছিঁড়ে দিও। আমার কথা কেউ না মানলেও তোমার মতো শিক্ষিত মেয়ে বললে লোকে মানবে।

চিঠিটা পড়তে পড়তেই সেমন্তীর খালি মনে হচ্ছিল অনামিকা খুন হয়েছে। আর ঐ অমিতাভ নামক লোকটাই এর পেছনে আছে। অনামিকা যে কোনো সময় মুখ খুলতে পারে সে ভয় তো ছিলই তার। অমিতাভ বেশ বুঝেছিল বুম্বা আসে ঐখানে – তাই হয়তো বুম্বা পৌঁছাবার আগেই জলে ঠেলে ফেলে দিয়েছে অনামিকাকে। পরে ওৎ পেতে পাড়ার

ছেলেদের সাহায্যে বুম্বাকে ধরল। প্রভাবশালী অমিতাভ পুলিশকে টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করতে পারলেও জয়েন্ট কমিশনার অনিমেষ মুখুজ্যেকে বশ করতে পারবে না।

সেমন্তী সোজা ফোন লাগাল তার মাসতুতো দাদা পাপুদা ওরফে অনিমেষ মুখুজ্যেকে – অন্তত অনামিকার রহস্যজনক মৃত্যুর তদন্ত তো শুরু হোক!...

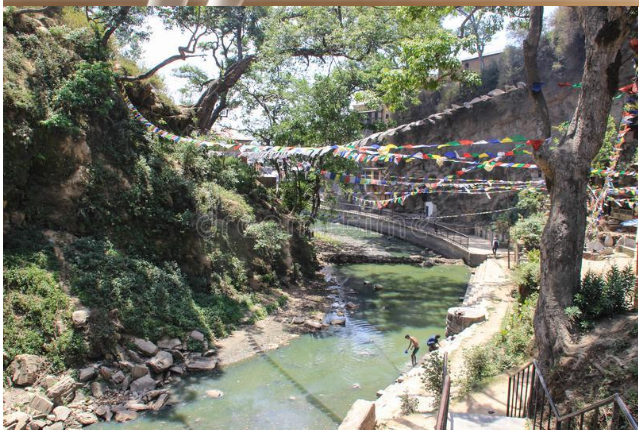

হে ভগবান, ব্রাজিলই যেন জেতে

বলাকা ঘোষাল

আমরা বাঙালিরা বরাবর পৃথিবীর ওপারের ব্রাজিলকে এবং তাদের এক নম্বর ফুটবল খেলোয়াড় রোনাল্ডোকে (Cristiano Ronaldo) মাথায় করে রাখি। সেক্ষেত্রে “হে ভগবান, ব্রাজিলই যেন জেতে” প্রার্থনাটি একেবারেই অস্বাভাবিক নয়। আমাদের দেশের ছিপছিপে চেহারার কদমছাঁট-ওয়ালা ছেলেগুলোর সাথে রোনাল্ডোর বেশ মিলও আছে। তারা রোনাল্ডোর খেলার কৌশল আয়ত্ত করতে না পারুক, তাকে প্রচন্ড ভালবেসে আর তুমুল উত্তেজনায় গলা ফাটিয়ে রোনাল্ডোর জয়গান গায়। তারপর ব্রাজিল জিতলে তো কথাই নেই; পাড়ায় পাড়ায় বিজয় মিছিলে থালা বাটি চামচ বাজিয়ে, পটকা ফাটিয়ে, নাচানাচি করে – অন্তত দুধের স্বাদ ঘোলে... নাঃ থাক, উপমায় কাজ নেই। দক্ষিণ আমেরিকাতেই ফিরে যাওয়া যাক।

এই একই “হে ভগবান, ব্রাজিলই যেন জেতে” – বাক্যটি আর্জেন্টিনার কোনও মানুষ বললে এক্কেবারে দেশদ্রোহীর দায়ে পড়ে যাবে। ইতিহাসে এরকম কেউ বলেছে বলে জানা না থাকলেও কিন্তু ব্যাপারটা ঘটেছে। আমি স্বচক্ষে না দেখলেও আমার কাছে এক আর্জেন্টিনীয় বন্ধু নিজে কবুল করেছে এই পাপ। একজন খাঁটি দেশপ্রেমী হয়েও এই প্রার্থনা তাকে করতে হয়েছে ২০০২ ওয়ার্ল্ড কাপ-এর ফাইনালে। কী সর্বনাশ!

সে একা নয়; তার সাথে আরও দুজন স্বদেশী এবং তাও আবার একজন ব্রাজিলিয়ানের বাড়িতে বসে এই গর্হিত কাজটি তারা করেছে অতি গোপনে, নেহাতই নিরুপায় হয়ে। ভাগ্য ভাল, গোটা দুনিয়ায় এই ঘটনা সম্বন্ধে হাতে গোনা কয়েকজন ছাড়া কেউ টের পায়নি।

2002 FIFA WORLD CUP KOREA JAPAN

নইলে হয়তো ফাঁসিই হয়ে যেত তাদের; বা কারুর ট্রিগার উঠত নড়ে | কে বলতে পারে, এদের যেরকম মাত্রাহীন দেশপ্রেম!

সেরকম ধরনের সম্ভাবনার হাত থেকে বাঁচাতে আমি এদের আসল নাম গোপন করে, ডাকনাম আর ছদ্মনামের কৌশলে বেশ রেখে-ঢেকেই ঝাঁপি খুলছি | বব্বম হাজাম যেমন রাজার মাথায় শিং-এর গোপন কথা বটগাছের কোটরে ফিসফিসিয়ে বলেই ফেলেছিল, আমিও তেমন উনিশ বছর ধরে পেটে রাখা এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের কাহিনী আপনাদের বলেই ফেলছি | শ-শ-শ কাউকে বলে দেবেন না যেন!

আমাদের বন্ধু উইলি, আর তার দুজন সহকর্মী - পাচি আর বেন্তো – তিনজনেই সরল ভাল মানুষ | ২০০২-এর বিশ্বকাপের কয়েক মাস আগে আর্জেন্টিনা থেকে নতুন এসেছে মার্কিন মুলুকে | সবারই পরিবার তখনও দেশে | নানান কাজের চাপ আর নতুন দেশের নতুন আদব কায়দা শেখার ব্যস্ততা | এই প্রথম তাদের ওয়ার্ল্ড কাপ ম্যাচ দেখা হচ্ছে বিদেশের মাটিতে | কাপ জেতার স্বপ্নে জল ঢেলে গ্রুপ ম্যাচেই হট-ফেভারিট আর্জেন্টিনা বাদ পড়ে গেছে | তাই তাদের খুব মন খারাপ |

এদিকে আরও দুঃখের ব্যাপার হ'ল – কার্লোস সান্তোস্, অর্থাৎ এদের অফিসের বড়-স্যার | না না, তিনি অতি ভদ্র | কিন্তু সমস্যা হ'ল, তিনি এক্কেবারে খাঁটি ব্রাজিলিয়ান | ফুটবল প্রেম যেখানে দেশভক্তির মাপ-যন্ত্র, আর কাটা ঘায়ে নুন ছিটিয়ে ব্রাজিল একের পর এক ম্যাচ জিতে চলেছে, আমেরিকার অফিসে এই দু'পক্ষের কাছেই ব্যাপারটা একটু বিব্রতকর | ফুটবল প্রসঙ্গে প্রাণ আকুপাকু করলেও পেশাদারি ভদ্রতায় ওই বিষয়টি এরা সবাই খুব আলতো করে এড়িয়ে যায় |

দক্ষিণ আমেরিকার এই দুই প্রতিবেশী দেশের বিশ্বজোড়া নামডাক, আর ফিফার বিশ্বকাপ সৃষ্টির অনেক আগে থেকেই এরা একে অপরের 'সকার-শত্রু'| দুই দেশের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার নাম হ'ল "সুপারক্লাসিকো দে লাস আমেরিকাস", ভাবার্থ – "আমেরিকার অনবদ্য সংঘর্ষ"|

ফুটবল নিয়ে এই হাড্ডাহাড্ডি লড়াই সরকারী স্তরে এবং সাধারণ জনতার মধ্যে তো বটেই – এমনকি স্টক মার্কেট থেকে জুয়াড়ি ড্রাগ মাফিয়াদের মধ্যেও আছে | ফ্রেন্ডলি ম্যাচেও ওই একই অবস্থা | কোন ছাড়াছাড়ি নেই | সে অনেক কান্ড! ESPN-এর মতে পৃথিবীর খেলাধুলা নিয়ে এটা অন্যতম রেষারেষি | CNN-এর মতে ইংল্যান্ড-স্কটল্যান্ডের ফুটবল দ্বন্দ্বের পরেই দ্বিতীয় স্থানে আছে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা |

এইসব স্পোর্টস্ চ্যানেলগুলো ভারত-পাকিস্তানের ক্রিকেটের খোঁজ রাখে কি? বা ইষ্টবেঙ্গল-মোহনবাগান? এই দলাদলি নিয়ে যারা প্রাণ-লড়িয়ে দিয়েছেন, তাঁদের এ ব্যাপারটা কিছুটা অনুমান করা সম্ভব | কাজেই ভদ্রতার খাতিরে ওই কার্লোসবাবুর উত্তেজনা চেপে রাখা যতটা কঠিন, উইলি, পাচি ও বেন্তোর ঠিক ততটাই কষ্টকর নির্বিকার থাকা |

ফিফার হিসেবে আজ অবধি এই দুই দেশ ওয়ার্ল্ড কাপে ১০৫টা ম্যাচ খেলেছে | তার মধ্যে ৪১টা জিতেছে ব্রাজিল, ৩৮টা আর্জেন্টিনা | কেবলমাত্র উনিশ-বিশের তফাৎ | আর মোট ২৬-বার ড্র | বলা বাহুল্য কেউই কম যায় না |

ব্রাজিল যখন কোয়ার্টার ফাইনালও জিতে গেল তখন শোকে-দুঃখে ম্রিয়মান হয়েও এই তিন মক্কেল কংগ্র্যাচুলেট করল ব্রাজিলবাবুকে | চোখ চকচক করে তিনি বললেন, "আই অ্যাম গোয়িং হোম |" অ্যাঁ, সেকী! কার্লোসবাবুর উল্লাস আর চাপা থাকেনি | যেই না সেমিফাইনালে উঠেছে ব্রাজিল, এই ব্রাজিলবাবু হুশ করে কেটে ফেলেছেন সপরিবারে দেশে যাওয়ার টিকিট | আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে হইহই করে খেলা দেখবেন | তিনি একদম নিশ্চিত যে ব্রাজিল ফাইনালে যাচ্ছেই, আর ফাইনাল জিতবেও | সেই আনন্দে তিনি ড্যাং ড্যাং করে উঠে পড়লেন সাও পাওলোর প্লেনে | আর্জেন্টিনা গোড়াতেই হেরে যাওয়ার দুঃখটা আবার এদের তিনজনের মনে কুরকুর করে উঠল |

যাওয়ার আগে ব্রাজিলবাবু দয়ার সাগর হয়ে এই আর্জেন্টিনিয়ান sub-ordinate-দের দিয়ে গেলেন তাঁর বাড়ির চাবিটি | মুখে ঝামা ঘষে যখন জিতছিই, ওরা আমাদের দেশের বিজয় আমাদের বাড়ির বড় টিভিতেই দেখুক | বেচারারা হেরেই যখন গেছে বহু আগে, অন্তত একটু আরাম করে সোফায় বসে, দেয়াল জোড়া ৭২-ইঞ্চি স্ক্রীনে রাইভালদের আনন্দ দেখুক |

তাঁর এই পরম বদান্যতায় উইলি-পাচি-বেন্তো অভিভূত | ভালই হ'ল | হিউস্টনের পেল্লাই বাড়ি শুধু বাইরে থেকেই

দেখা হয় | এরা থাকে ছোট মাপের অ্যাপার্টমেন্টে | তাই টিভিও ছোট | হঠাৎ কেতাদুরস্ত বাড়ির রস আস্বাদনের সুযোগ হ'ল তাদের | বিপুল বসার ঘরে নরম সোফায় ডুবে সেমিফাইনাল ম্যাচটি বেশ জমিয়ে দেখা হ'ল | ব্রাজিল জেতাতে এদের কষ্ট হলেও একটা সান্ত্বনা যে বস তাঁর ছুটি আরেকটু বাড়াবেন | কাজের চাপ তাই একটু কম থাকবে | আর বসের ম্লান মেজাজও দেখতে হবে না | কিন্তু ফাইনালে এরা মনপ্রাণ দিয়ে জার্মানির জন্য লাফাবে বসেরই বাড়িতে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই | বসের মেজাজ যেরকমই হোক না কেন – ডোন্ট কেয়ার | বুকের জ্বালা মেটাতে জার্মানির জিতই তাদের কাম্য | তাহলে অন্তত শত্রুপক্ষের মুখে একটা বেশ পালটা ঝামা ঘষে মনের গভীরে ওই হুহু করা জ্বালাটা একটু জুড়োয় | ঠোঁট বেঁকিয়ে "জীবনে হারা-জেতা তো আছেই – টেক ইট্ ইজি" সান্ত্বনা দিতেও ভাল লাগবে | চোখের সামনে অমন টপাটপ ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে একেবারে ফাইনালে উঠে গেল ব্রাজিল, এ কী সহ্য করা যায়!

অবশেষে সেই বিশেষ দিনটি হাজির – ৩০শে জুন, ২০০২ | সেবার প্রথম ইউরোপ বা আমেরিকা মহাদেশের বাইরে খেলা হচ্ছে | সাউথ কোরিয়া আর জাপান হোস্ট দেশ | জাপানের টোকিয়োর লাগোয়া শহর ইয়োকোহামায় ফাইনাল | ওখানে বিকেল মানে হিউস্টনে ভোর রাত | ফিফা বিশ্বকাপ ফাইনালের ইতিহাসে এই প্রথম ব্রাজিল জার্মানির মুখোমুখি হচ্ছে | দুই দলই দুঁদে | ব্রাজিল জিতলে বিশ্ব রেকর্ড হবে | ওরা চারবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান হয়েছে আগেই | এটা হবে পঞ্চমবার | আর জার্মানি তিনবার জিতেছে | ওদের স্বপ্ন – আরেকবার জিতলে ব্রাজিলের সমান সমান হতে পারে | কাজেই দুই দলেই চাপা উত্তেজনা | অধীর আগ্রহে গোটা দুনিয়া বসে আছে এদের লড়াই দেখতে |

তিন মক্কেল এদিকে প্রচুর মন-কাড়া খাবার আর পানীয় নিয়ে সন্ধ্যেবেলাতেই হাজির কার্লোসের অট্টালিকায় | মার্কিন কায়দায় এলাহি বসার ঘরে আরাম করবার সুযোগ যখন পাওয়া গেছে, কে ছাড়ে! পেট ঠেশে খেয়ে একপ্রস্থ ঘুমও মেরে নেওয়া গেল | রাত দুটো নাগাদ খেলা শুরু হ'ল | সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন উত্তেজনা ওঠে আর পড়ে | কিন্তু গোল আর হয় না | উনিশ মিনিটের মাথায় রোনাল্ডো একটা সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও হারায়; বারের গা ঘেঁষে বেরিয়ে যায় বল | উইলিরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে | টেনশান এড়াতে সারাক্ষণই মুখ চলেছে | নানান রকম শক্ত, তরল, নরম সব উপাদেয় খাবার-দাবার – পুষ্টি তুষ্টি কোনটাই বাদ নেই | তিরিশ মিনিটের মাথায় রোনাল্ডোর আরেকটা মিস্ | বেশ বেশ | তীরে এসে এভাবেই তরী ডুবুক ব্রাজিলের, সেটাই এদের কাম্য | হাফ-টাইমের ঠিক আগেই জার্মানি একটুর জন্য মিস্ করল গোলের সুযোগ | আর হুইসল বাজবার ঠিক আগে রোনাল্ডোর আবার একটা মিস্ | এই

প্রচন্ড লড়াইয়ে হাফ-টাইমে স্কোর শূন্য-শূন্য | একটা হেস্তনেস্ত না হলেই নয় | ব্রাজিলের অদ্ভুত কৌশল | আর জার্মানির সুনাম যে তারা শেষ মুহূর্ত অবধি হাল না ছাড়া জেদ নিয়ে লেগে থাকে | শেষ মিনিটেও গোল করে খেলার ভোল পালটে দেওয়া একেবারেই আশ্চর্য নয় তাদের পক্ষে | আর ব্রাজিল এখনও অবধি এই বিশ্বকাপের যে ফাইনাল খেলাগুলো জিতেছে, প্রতিটিই বাড়তি সময় ছাড়াই জিতেছে | এটাও একটা রেকর্ড |

হাফ-টাইম মোটে পনেরো মিনিটের | তাই চটপট রান্নাঘর পরিষ্কারের পাট মিটিয়ে, ডিশ-ওয়াশারে বাসন ঢোকাতে না ঢোকাতেই সময় শেষ | "ভামোনোস, ভামোনোস" বলে তাড়া দিয়ে ওরা টিভিতে চোখ ডোবাল | শেষের জন ঝটপট ডিশ-ওয়াশার চালু করে বসে পড়ল সোফায় | এক্সট্রা টাইম যদি হয়, তাহলে রাতটাই পার হয়ে যাবে | মন আনচান – কে জেতে, কে হারে | আর একটু পরে পরেই জার্মানরা হাফ লাইন ডিঙোলেই এরা হাঁউমাঁউ করে হাত পা ছুঁড়ে চেঁচিয়ে উঠছে | ব্রাজিল হাফ-লাইন পেরলেও ওই একইভাবে 'গেল গেল' রব উঠছে | ব্রাজিল প্রচন্ডভাবে

আক্রমণের মুডে। জার্মানি ডিফেন্স সামলাতে ব্যস্ত, অথচ তারই মধ্যে দু-দুবার গোলে হামলা করেও পারল না কিছু করতে। তিন মক্কেলের তাতে আক্ষেপের শেষ নেই।

হঠাৎ ৬৭ মিনিটের মাথায় রোনাল্ডো করে দিল বাজিমাত। হুট করে হয়ে গেল গোল। এদের দুঃখের বাঁধ ভেঙে পড়ল। মাথা চাপড়ানো, হাত কামড়ানো, আক্ষেপ, বিলাপ সব ভিড় করে এল।

এদিকে অনেকক্ষণ ধরে মনে হচ্ছে পাশে সাদা লেসের পোশাক পরা এক পরীও যেন হেলেদুলে তার ঘাগরা দুলিয়ে এদের সাথে খেলা দেখছে। উইলি খেয়াল করেছে প্রথমে। আবার মনে হচ্ছে – নাঃ, রঙিন পানীয় হয়তো একটু বেশিই পেটে চলে গেছে। তাই হয়তো...।

কিন্তু তবু এত উত্তেজনার মুহূর্তেও মনে হচ্ছে পাশ থেকে সেই সাদা পরী দুলে দুলে উঠছে। না তাকিয়ে আর পারা গেল না। তারপরে যা হ'ল সেটা ওয়ার্ল্ড কাপ ম্যাচের থেকেও সাংঘাতিক।

আকাশ ফাটিয়ে "মন-দিও! মীরা মীরা" চিৎকার করে লাফিয়ে উঠল উইলি। না না, ভক্তিভাবের উদ্রেক হয়নি মোটেই। মন-দিও, মীরা, অর্থাৎ "হে ভগবান! দেখো।" পাচি আর বেন্তো সে দৃশ্য দেখে উন্মাদের মতন আওয়াজ করছে। "কে দিয়াল্লো (এটা কী?)? কে দেমোনিওস্, (কী কান্ড)?" এদের তিনজনেরই কপাল, চোখ, চোয়াল তখন পিকাসোর আর্টের মতন স্বস্থান-বিচ্যুত হয়ে নাকের চারপাশে বিচিত্রভাবে যেখান সেখান থেকে ঝুলে আছে। যার যেটুকু পানীয়র প্রভাব ছিল, এক লহমায় তা পগার পার।

পরীও নয়। ভূতও নয়। যা দেখে এরা এহেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়, তা হ'ল ফকফকে সাদা ফেনা। গোটা রান্নাঘর জুড়ে যেন সাদা বরফের ময়দান, সমুদ্র, পাহাড় – দেখে মনে হচ্ছে যেন অ্যান্টার্টিকার একটা বিপুল অংশ এসে হাজির হয়েছে। মাটি থেকে রান্নাঘরের কাউন্টার ছাড়িয়ে ফেনা অনেকটাই উঁচু হয়ে আছে। আর উইলির এতক্ষণ যা দেখে পরী মনে হচ্ছিল, সেটা রান্নাঘরের বেরোবার পথে কোমর অবধি ফুলে ওঠা ফেনা; ফুলে-ফেঁপে বেরিয়ে এসেছে যতটা সম্ভব। রান্নাঘরের অন্যত্র দেওয়াল থাকায় সেটা আর এগিয়ে আসতে না পেরে বেরোবার পথটায় গোলাকৃত হয়ে ঠেলে আসছে। এসি-র হাওয়ায় সেটাই দুলে দুলে লেসের ঘাগরা মনে হচ্ছে। এ আর কিছু নয় – শুধু সাদা ফেনার ঢেউ। ওরা তিনজন বসার ঘরে পাগলের মতন ছুটোছুটি লাগিয়ে দিয়েছে। এরকম হ'ল কী করে তা ওদের ঘিলুর নাগালের বাইরে। কোথা থেকে এর সুরাহার পথ শুরু করা যায় সেও মাথায় আসছে না। বসের বাড়ি বলে কথা। তার উপর তিনি ব্রাজিলিয়ান। তাঁরই দিলদরিয়া অফারে পেল্লাই স্ক্রীনে খেলা দেখার বরাত খুলেছে। আর তার উপর কাঠের বাড়ি – কিছু ক্ষতি হলে লক্ষ লক্ষ ডলারের ধাক্কা। এটা যে তিনি চক্রান্ত বলে সন্দেহ করবেন না, তারও কী ঠিক আছে? মুখে না বললেও, কথাটা মনে উঁকি দিলেও তো লজ্জা। "আমরা ইনোসেন্ট, গোবেচারা ভাল মানুষ, হিংসে থেকে এসব করিনি। প্রতিশোধ নেওয়ার কোনও অভিপ্রায় ছিল না" বলবার প্রয়োজন যেন না হয়! সবাই হাত কামড়ে কামড়ে ভাবতে ব্যস্ত।

তারপর কোমর অবধি সাবানের ফেনা নিয়ে তারা ঢুকল রান্নাঘরে। পেছল মাটির মধ্যে কোনরকমে এঁকেবেঁকে আগে ডিশ-ওয়াশারটাকে বন্ধ করল। এই রহস্যের উদ্ঘাটন হ'ল তার একটু পরেই। সদ্য আমেরিকায় এসে হয়তো অনেকেরই এই কান্ড হয়েছে। যা বোঝা গেল তা হ'ল যে হাফ-টাইমে তাড়াহুড়োতে ডিশ্-ওয়াশারের বিশেষ ধরনের কম-ফেনার সাবান না ভরে এরা ঢেলে দিয়েছিল হাতে মাজার লিকুইড সাবান। ডিশ-ওয়াশারে বেশি ফেনা হতে নেই। বেশি ফেনার জায়গাই নেই যে ভিতরে। আর হাতে মাজার সাবানের বেলায় ঠিক উল্টো। মানুষের ভাল লাগার জন্য ফেনার কেমিক্যাল সোডিয়াম লরেথ-সালফেট বেশি মেশানো থাকে।

অতএব সেই ফেনার মিছিল ডিশ-ওয়াশারের ফাঁক দিয়ে ঠেলে ঠুলে বেরিয়ে পড়ে ধরাচুড়ো নিয়ে এই ব্যাপক রূপ নিয়েছে। দাড়ি কামানোর ফোমের মতন সেগুলো হাতে করে তুললে চুড়ো হয়ে থাকছে – ইচ্ছে করলে দিব্যি তাজমহলও বানানো যায়। কিন্তু এখন শিশুর মতন ফেনা নিয়ে খেলার সময় বা ইচ্ছে কোনটাই এদের নেই।

এখন প্রধান সমস্যা হ'ল কী করে এসব পরিষ্কার করা হবে। খেলা তো উঠল মাথায়। ঠিক বারো মিনিট পরে রোনাল্ডো কখন যে আবার গোল দিল সেটা আর এদের দেখাই হয়নি। দুই হাত দিয়ে সমানে বিশাল পাহাড়ের মতন সাবান তুলে

তুলে সিঙ্কে ফেলে সেটা নর্দমা দিয়ে পার করা প্রচন্ড কঠিন চ্যালেঞ্জ | ফেনা এদিকে নামে তো ওদিকে ওঠে | কলের জলের বাধ্য সে নয় | ফকফকে টাইট ফেনাকে নামিয়ে, সেটা রীতিমতো ঠেলেঠুলে নালীতে ঢুকিয়ে দিতেই আরও পাহাড় এনে হাজির করছে বাকি দুজন | পুরো রান্নাঘর পরিষ্কার করতে অন্তত কয়েক ঘন্টা লাগবে বোঝাই যাচ্ছে | হড়হড়ে পেছল মেঝেতে এরা কোনরকমে জিমন্যাস্টিকসের ব্যালেন্স করে সমানে পাহাড়প্রমাণ সাবান সিঙ্কের দিকে এগিয়ে দিতে লাগল | পাচি সিঙ্কের নালীর মুখে ফেনা ঠেলতে ঠেলতে হঠাৎ বলে বসল, “ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি ব্রাজিল যেন জেতে |” এইরকম প্রার্থনা কোনও আর্জেন্টিনিয়ানের মুখে শোনা গেছে বলে ইতিহাসে জানা নেই | এরা তিনজনে মিলে একসাথে সারাটা ক্ষণ বলতে থাকল, “পিদো এল দিও পোর ব্রাসিলিয়া | মন দিও! পিদো পোর ব্রাসিলিয়া |” হে ভগবান, আজ ব্রাজিলের জন্যই তোমায় ডাকছি, ঠাকুর |

এদের করুণ কন্ঠের প্রার্থনার জন্য কিনা জানি না ভগবান সেদিন সদয় হয়ে ব্রাজিলকেই জিতিয়েছিলেন | তার ফলে কার্লোস সান্তোসবাবু এমনই খুশি মেজাজে কাজে ফিরলেন যে রান্নাঘরের ফেনা যদি এরা পরিষ্কার নাও করত তাহলেও হয়তো এঁর চোখে পড়ত না | আর পড়লেও ক্ষমা হয়ে যেত আলবাৎ |

কিন্তু তবু পাচি, বেন্তো, আর উইলি সেদিন কোনও ঝুঁকি না নিয়ে সারা রাতের পর অনেক বেলা অবধি সমানে ঘষে-মুছে পরিষ্কার করেছে বসের রান্নাঘর | প্রতিটি তাক পরীক্ষা করে, তাকের দরজাগুলোকে তারা ভাল করে মুছেছে যাতে জলের একটুও দাগ না থাকে | ব্রাজিল জেতবার ক্ষতি সেই তুলনায় তখন নেহাতই তুচ্ছ তাদের কাছে | মাথা, ঘাড়, কোমরে রীতিমতো ব্যথা নিয়ে এরা গুটিগুটি যে যার বাড়ি ফিরে গেছে বিধ্বস্ত, নিস্তেজ অবস্থায় | এইরকম অভিনব বিশ্বকাপ খেলা দেখা তাদের জীবনে আর হয়নি, হবেও না |

ব্রাজিল থেকে কার্লোস সান্তোসবাবু ফিরে এলে এরা চাবি ফেরৎ দিয়েছে যথেষ্ট ধন্যবাদ জ্ঞাপনের সাথে | এর পরে উনি জিজ্ঞেস করলেন “খেলা কেমন দেখলে বড় স্ক্রিনে?” এরা কৃতজ্ঞতায় অভিভূত ভাব প্রকাশ করেছিল; এবং আরোও দুদিন পরে হালকা বিনয়ী চালে এই তিন মূর্তি জানতে চেয়েছিল, “বাড়ির সব ঠিক ছিল তো? ...ইয়ে, মানে, আমরা ফোর্সড্ ব্যাচেলাররা আশাকরি...”

ভূয়সী প্রশংসায় ভরে দিয়েছিলেন ব্রাজিলবাবু | “আরে, দারুণ দারুণ, একেবারে ঝকঝকে – অবিশ্বাস্য | ইউ লেফট দ্য হাউস ক্লীনার দ্যান ইউ ফাউন্ড ইট!” দুই দলই খুশী | অতএব, নটে গাছটি মুড়লো; আমার গল্পটিরও তাই এখানেই মধুরেন সমাপয়েৎ |

ব্রাজিলের ওটা ছিল পঞ্চম কাপ | সেই বিশ্ব রেকর্ড এখনও চলেছে | আর জার্মানির ওটা চতুর্থ হার বিশ্বকাপ ফাইনালে | তারা টেরও পেল না এই তিনজনের প্রার্থনার কী প্রচন্ড জোর | আর এই তিন মক্কেলের সান্ত্বনা একটাই যে সেই জেতার পর থেকে ব্রাজিল আর কোনদিনও বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ান হতে পারেনি | এই তিন জনতার প্রার্থনার অভাবেই কী?

সেটা বরং অজানাই থাক |...

২০০২ এর বিশ্বকাপের বিশ্ব রেকর্ড —

১) এই প্রথম ইউরোপ বা আমেরিকা মহাদেশের বাইরে বিশ্বকাপ খেলা হোস্ট করা হয় |

২) এই প্রথম ও শেষ ব্রাজিলের ইউরোপ বা আমেরিকা মহাদেশের বাইরে বিজয় |

৩) এই প্রথম ব্রাজিল ও জার্মানি ফাইনালে মুখোমুখি |

৪) এই প্রথম (আর আশাকরি অন্তিম বার) ব্রাজিলের বিজয়ের জন্য আর্জেন্টিনার একাধিক মানুষের আর্ত প্রার্থনা |

৫) বলা বাহুল্য, ব্রাজিলের পঞ্চমবার বিশ্বকাপ জেতা |

2002 FIFA World Cup Winner Brazil

২০২১-এর সর্বগ্রাসী রাক্ষস

হুসনে জাহান

“লাগবে না, আমার কিচ্ছু লাগবে না। আমার তো মরে যাবার সময় হয়ে গেছে। আমি না খেলেই বা কি? আমার জন্য কাউকে কিচ্ছু করতে হবে না। সব ফেলে দাও বাইরে।” রেগে, কেঁদে, চিৎকার করে সুপার মার্কেট থেকে আসা কাঁচা মাছ-মাংস-শাক-সবজির প্যাকেট সব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রবি শোবার ঘরের দিকে চলে গেল।

কালু কিছু বুঝতে না পেরে হতভম্ব হয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর থলেভরা মাছ-মাংস-সবজি হাতে উঠিয়ে মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রবিকে এ অবস্থায় কিছু বলার বা বোঝাবার সাহস কিংবা সাধ্য তার নেই। যদিও সে ভাল করেই জানে যে রবির ছোট বোন লন্ডন থেকে অনেক ঝামেলা করে কাঁচা খাবারগুলো ঢাকার এক বড় সুপার মার্কেটে অনলাইন অর্ডার করে ভাইয়ের ফ্ল্যাটে ডেলিভারি দেবার ব্যবস্থা করেছিল।

বিদেশের কোন দৈত্য বোতল থেকে ছাড়া পেয়ে ঘূর্ণি ঝড়ের মতো তার বন্দিদশার প্রতিশোধ নেবার আক্রোশে প্রবল বেগে সারা পৃথিবী গ্রাস করতে বেরিয়েছে!

‘ঘড়ি বলে টিক টিক, জীবন করে টিপ টিপ...’

রবির আশেপাশের খবর শোচনীয়। পাশের বাড়ির এক গৃহিণী মারাত্মক কোভিডে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে। লকডাউনে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে খাবার পর্ব বন্ধ হয়ে গেল। পাড়ার এক বন্ধুস্থানীয় ডাক্তার এবং সব হিতৈষীরা রবি আর কালুর কোনও উপসর্গ না থাকা সত্ত্বেও তাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোভিড টেস্ট করলেন। টেস্টের ফল এল পজিটিভ। কথাটা শোনামাত্র শ্বশুরবাড়ির লোকজন দু’বেলার রান্না খাবার নিয়ে আসার ব্যবস্থাও নাকচ করে দিল। এতগুলো অপ্রত্যাশিত এবং অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার চাপেই হ’ল রবির এই অস্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ। এর জন্য কি তাকে খুব দোষারোপ করা যায়?

যথাক্রমে শ্বশুরবাড়ির সবারও টেস্ট করানো হ’ল। বাসার খাবার রান্না এবং পাঠানোর কাজে যারা সংশ্লিষ্ট ছিল, সবারই টেস্ট পজিটিভ হ’ল। হু হু করে মহামারী ছড়িয়ে যাচ্ছে। এই খবর শুনে রবির বিদেশে বাস করা ভাইবোনেরা বিচলিত হয়ে টেলিফোন করে ঢাকার আধুনিক সুপারমার্কেটের সেবার শরণাপন্ন হ’ল। আর কালুকে অনুরোধ করল সে যেমন পারে তেমন করেই যেন রবিকে দুটো ভাত মাছ রেঁধে দেবার চেষ্টা করে।

রবির স্ত্রী যখন সুস্থ ও সচল ছিল তখন রবি লেখাপড়া, বই লেখা, মঞ্চে বক্তৃতা দেওয়া, সভা পরিচালনা করা, রবীন্দ্র সংগীতের চর্চা, গবেষণা, সঠিক নিয়মে গানের শিক্ষা দেওয়া, গ্রাম-উন্নয়নমূলক গবেষণা, পরিদর্শন ইত্যাদি নিয়েই ব্যস্ত থেকেছে। সব ধরনের কাজেই তার স্ত্রীর সহযোগিতা, উৎসাহ, অনুমোদন, মতামত তাকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। হঠাৎ সেই জীবনসঙ্গী স্ট্রোক হয়ে চলাফেরা ও বাকশক্তি রহিত হয়ে পড়ল। দেশ বিদেশের নানারকম চিকিৎসা করিয়েও তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব হ’ল না। তখন রবি হতাশ হয়ে তার কাজকর্ম, পেশা, নেশা সব ত্যাগ করে স্ত্রীর হাত ধরে হাসপাতালের ঘরে তার পাশেই বসে থাকত। কিছুদিন পর হাসপাতাল থেকে শ্বশুরবাড়িতে এনে নার্স ও ভাই-বোনদের তদারকিতে থাকবার ব্যবস্থা করা হ’ল। তখনও রবি সারাদিন স্ত্রীর পাশেই বসে থাকে, কারণ স্ত্রীর করুণ চাহনির অনুরোধ ঠেলে সে উঠে আসতে পারত না। রাতে স্ত্রী ঘুমোবার পর নার্সের হেফাজতে তাকে রেখে সে নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে আসত। সে বলত, “আমি কাছে বসে থাকলে তবেই তাকে খাওয়ানো যায়। আমাকে শুধু ওর জন্যই বেঁচে থাকতে হবে। আমার কিছু হলে সে খাওয়া বন্ধ করেই মরে যাবে।”

এরকম পরিস্থিতিতে রবি ক্রমশঃ ভুলে গেল তার বাকি সমাজ ও সংসারের কাজকর্ম। তার বই লেখা, পড়াশোনা, দেশের ও দশের কাজ, সামাজিকতা, আত্মীয় বন্ধুদের সাথে মেলামেশা তো দূরের কথা; সৌজন্য বজায় রেখে কথা বলার অভ্যেসটুকুও সে ভুলে গেল। কেউ ফোন করলে বা না বুঝে শুধু কুশল জিজ্ঞাসা করলেও সে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠত।

এরই মধ্যে রবির ড্রাইভার, যাকে সে গাড়ি চালানোর হাতেখড়ি দিয়ে নিজের ছেলের মতো কাছেই রেখেছিল, সে এবং রবির স্ত্রীর নিজের মনমতো তৈরী করে নেওয়া বিশ্বস্ত কাজের মেয়েটি তাদের এই মর্মান্তিক অবস্থায় হঠাৎ কাজ ছেড়ে চলে

গেল। রাগে দুঃখে রবি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল। তার শখের টয়োটা গাড়িটা দান করে দেবার সিদ্ধান্ত নিল। সে কথা জানতে পেরে তার ছোট শ্যালক শহুরে জীবনের এই অতি প্রয়োজনীয় বাহনকে পরিবারের সকলের কাজে ব্যবহারের জন্য নিজের কাছেই রেখে নিল।

এসব কারণে শ্বশুরবাড়িতেই রবির দুবেলা খাবার বন্দোবস্ত করা হয়। এ ব্যবস্থায় সারাদিন শ্যালকের পরিবারের সাথে স্ত্রীর চিকিৎসা ও অবস্থা নিয়ে আলাপ আলোচনা বাদেও আত্মীয়সঙ্গ ও সহযোগিতারও সুযোগ হয়ে যেত। বাইরের পৃথিবীর সাথে কথাবার্তা বলবার সময় সুযোগ কমতে থাকল। ফলে কারো সাথে অপ্রয়োজনীয় আলাপ আলোচনা করা সে পুরোপুরিই ভুলে গেল। এভাবে বাইরের মানুষজন, লেখাপড়া, গান-সাহিত্য, সমাজ সেবার সহকর্মী ও সমঝদাররা সবাই তার থেকে একে একে দূরে সরে গেল। এভাবেই পুরো চারটে বছর স্ত্রীর পাশে বসে শ্যালক পরিবারের সঙ্গে কাটাবার পর তার জীবনসঙ্গীটি জীবনের মায়া কাটিয়ে অন্য পারে চলে গেল।

তার পরও শ্বশুরবাড়িতে দুবেলা খেতে যাওয়া ছাড়া আর কোনো সামাজিকতা বা উৎসবে রবির আগ্রহ ফিরে এল না। বুদ্ধিবৃত্তিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং অতি প্রয়োজনীয় আধুনিক পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক বিষয়ে তার যে পারদর্শিতা সে আগে হাসিল করেছিল, চার বছরের অব্যবহারে তার কিছুই আর ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হ'ল না। এভাবেই তার দৈনন্দিন নিরানন্দ ও পীড়াদায়ক জীবন চলছিল।

রবির এক বোন লন্ডনে, আরেকজন সুইডেনে, ভাই জার্মানিতে আর মেয়ে থাকে আমেরিকায়। স্বাভাবিক সময়ে তারা প্রত্যেকেই বছরে একবার বা দুবার দেশে এসেছে; তাকে সঙ্গ দিয়েছে। খাওয়াদাওয়া গল্পগুজব করে আনন্দে দিন কেটেছে। তারপর ২০২০ সালে দেখা দিল এই মারাত্মক মহামারী। মানুষ ভাল করে কিছু বোঝবার আগেই ধনী গরিব নির্বিশেষে এই রোগের শিকার হয়ে পড়ল। এই পরিস্থিতিতে বিদেশের ভাইবোন, মেয়ের আসাই শুধু স্থগিত হয়নি, স্থানীয় আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী কেউ আর এখন দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরেও দেখতে আসে না। নিজের ফ্ল্যাটে একা শুয়ে বসে টিভি দেখা, কাগজ পড়া ছাড়া রবির জীবনে আর কিছুই করবার থাকল না।

কারোরই জানা নেই কতদিন পর আবার মানুষ নিশ্চিন্ত হয়ে ইচ্ছেমতো এখান ওখান যাওয়া-আসা করতে পারবে। অজানা অনিশ্চিত ভয়ে সকলেই প্রয়োজনীয় কাজ ছাড়া ঘরের বাইরে পা বাড়াতে ভরসা পায় না। সবাই এখন যে যার নিজের নিয়মে জীবন ধারণের ও মনোরঞ্জনের পথ খুঁজে নিতে বাধ্য হয়েছে। এমনিতেই আজকাল আপনজন ছাড়া বিনা প্রয়োজনে বা বিনা স্বার্থে অন্যের খোঁজখবর নেবার চল একেবারে উঠে গেছে বললেই হয়। 'চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা'-টাই এখন জীবনের মূল মন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোভিড আক্রান্ত মানুষ হাসপাতালে আত্মীয়-স্বজনের স্নেহের পরশ থেকে বঞ্চিত। ফোনের মাধ্যম ছাড়া মুমূর্ষুদের সাথে যোগাযোগেরও কোনো সুযোগ নেই। শুধুমাত্র ডাক্তার নার্সের পরিচর্যায় হাসপাতালে প্রয়াণের পর মৃতের সৎকার সম্পন্ন করাও দুরূহ হয়ে পড়েছে।

দেশের এরকম অবস্থায় রবি, কালু এবং শ্বশুরবাড়ির সবার যখন কোভিড ধরা পড়ল, সে যেন 'মরার ওপর খাঁড়ার ঘা'! নিরুপায় শ্যালক স্বীয় পরিবারের নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে রবিকে খাবার পাঠানোর ওপর পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞা জারি করে দিল। এই পরিস্থিতির ভিত্তিতে রবির মনের অবস্থা ও অসামাজিক ব্যবহারের কারণ বুঝতে মোটেই কোনো গবেষণার প্রয়োজন হয় না।

শ্বশুরবাড়ি থেকে খাবার আসা বন্ধ হওয়াটাই কি রবির একমাত্র দুঃখের কারণ? এককালে রবির স্ত্রী মেয়ের কাছে বিদেশে বেড়াতে গেলে দেশে রবি নিজেই মোটামুটি রান্না করে জীবন ও সংসার সামলিয়েছে। মাইক্রোওয়েভ, গ্যাসের চুলো, প্রেসার ও ইকমিক কুকার ইত্যাদি আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে নিজের কাজ চালানো সেরকম দুঃসহ মনে হয়নি। আসলে এখনকার পরিস্থিতিতে স্ত্রীর অবর্তমানে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে খাওয়া এবং পরবর্তীতে সেখান থেকে খাবার আসাটাই রবির জন্য ছিল সামাজিকতার একমাত্র সূত্র। সে তো স্ত্রীর অসুখের চারটে বছর নিজের সত্তাকেই ভুলে বসে আছে। শুধু খাবার কেন, নিজের জীবন-ধারণ বা উপভোগ করবার সব কৌশলই এখন তার কাছে দূর দূরান্তে বরফে ঢাকা হিমালয় পর্বতে ওঠবার মতই দুরূহ মনে হয়। দেশের মধ্যেই তার একমাত্র নিকট আত্মীয়দের সাথে যদি চাক্ষুষ ও সামাজিক যোগাযোগটুকু পুরোপুরি ছিন্ন হয়ে যায়, তখন তার একা ঘরে

বসে থাকা জীবনের কতটুকু অর্থই বা বাকি থাকে? তার সম্পূর্ণ জীবনটা তো তাহলে এক জনমানবহীন বন্দির মতনই হয়ে গেল | ঘড়ির কাঁটা ধরে সকালে ওঠা, কর্নফ্লেক্স আর দুধ খাওয়া, দুপুরে ও রাতে কালু দুটো ভাত মাছ ইত্যাদি কোনোমতে রেঁধে দেয়, আর সারাদিন বাকহীন অবস্থায় ডিভানে কাত হয়ে টিভির খবর ও প্রোগ্রামের দিকে তাকিয়ে থাকা – এটাই কী জীবন? কাজেই তার মতে এর চেয়ে না খেয়ে আস্তে আস্তে মরে যাওয়া অনেক ভাল | কেউ তো চিরদিন এ পৃথিবীতে বাঁচেনি, বাঁচবেও না | যদি দেশের ও দশের কোনো উপকারেই না লাগা যায়, কারো সাথে দুটো কথা বিনিময়ের সুযোগও বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে কার ভাল লাগতে পারে একা একা মুখ বন্ধ করে বেঁচে থাকতে?

পৃথিবীর এই ভয়ঙ্কর দুর্দিনে সবাই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছে এ রোগে আক্রান্ত হলে হাসপাতালে সম্পূর্ণ নির্বান্ধব অবস্থায় জীবনটা ডাক্তার নার্সের শুশ্রূষা ও করুণায় সঁপে দিয়ে ভাগ্যের লিখনের অপেক্ষায় ধুঁকতে হবে | আর আত্মা দেহ থেকে নিষ্কৃতি নেবার পরবর্তীতে দেহের সৎকারের বেলাতেও কেউ মায়াভরে এগিয়ে আসতে ইতস্তত করবে | এই ভয়াবহ একাকীত্বের চেহারা উপলব্ধি করে দারুণ হতাশায় রবি ওরকম আচরণ করে নিজের দুঃখের আত্মপ্রকাশ করে ফেলেছে | শ্বশুরবাড়িতে খেতে যাওয়া বা সেখান থেকে খাবার আসাটা তো শ্যালকের পরিবারের সাথে দেখাশোনা ও যোগাযোগের একটা সুযোগ ও উপলক্ষ্য মাত্র ছিল | কাজেই রবির এরকম দুঃখের আত্মপ্রকাশকে কি দোষ দেওয়া যায়? রবির সেই নিদারুণ দুঃখ যদি ক্রোধের রূপ নেয়, তবে সেটাকেও কি খুব অস্বাভাবিক বলা যায়? এরকম শোচনীয় অবস্থায় কিঞ্চিৎ সাহায্য করবার উদ্দেশ্যেই বিদেশের ভাইবোনরা দূর থেকে ফরমায়েশি বাজার ডেলিভারির ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করেছিল | যাক, ভাগ্য ভাল যে রবি, কালু এবং শ্বশুরবাড়ির সবার সময়োপযোগী চিকিৎসা হওয়ায় সবাই সুস্থ হয়ে উঠতে পেরেছে | আপাততঃ সবার যৌথ পরামর্শে আবার দুবেলার রান্না খাবার নিয়ে আসবার ব্যবস্থা চালু করা হ'ল; তবে প্রচন্ড কড়াকড়ি আর সাবধানতা অবলম্বনে | কালু শুধুমাত্র একবারই দুপুরে হেঁটে যাবে ও বাড়িতে | গেটের ঘন্টা বাজিয়ে বাইরেই অপেক্ষা করবে | তারপর ওপাশ থেকে সে বাড়ির পরিবেশক দু'বেলার খাবার গেটের ওপার থেকে হাত উঠিয়ে কালুর কাছে হস্তান্তর করবে | তথাস্তু! নেই মামার চাইতে তো কানা মামা ভাল! তবু তো সান্ত্বনা যে তার শ্যালক ও সম্বন্ধীর পরিবার তাকে একেবারে খরচের খাতাতে লিখে ফেলেনি |

নিয়তির কী উপহাস – যে রবি সবার জন্য নিজের সুখ, আরাম জলাঞ্জলি দিয়ে কত কী না করেছে? এ কথা তার ভাইবোনদের তো অজানা নয় | তার নিজের দাদা, দাদু, বাবা মা, মাসি, ভাইবোন থেকে জামাইবাবুদের সবার অসুখ, চিকিৎসা, হাসপাতালে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ওষুধ পথ্য জোগাড় করে দেওয়া, রক্তের খোঁজ করা, সবই তো রবি আন্তরিকতার সাথে বিনা দ্বিধায় নিঃস্বার্থভাবে, সম্ভবেরও অতিরিক্ত দৌড়াদৌড়ি করে পালন করেছে | তাই এটা সত্যিই দুঃখজনক যে আজ তার জীবনের শেষ দিনগুলোতে তাকে সঙ্গ দেবার, তার দৈনন্দিন সাধারণ চাহিদা পূরণ করা সম্ভব না হলেও, তার খোঁজ খবর নেবার বা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসার মতো আত্মীয়, বন্ধু কাউকেই ধারে কাছে পাওয়া যাচ্ছে না |

মনে প্রশ্ন জাগে, এটাই কি তবে ভবিষ্যত পৃথিবীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপ হয়ে দাঁড়াল নাকি?

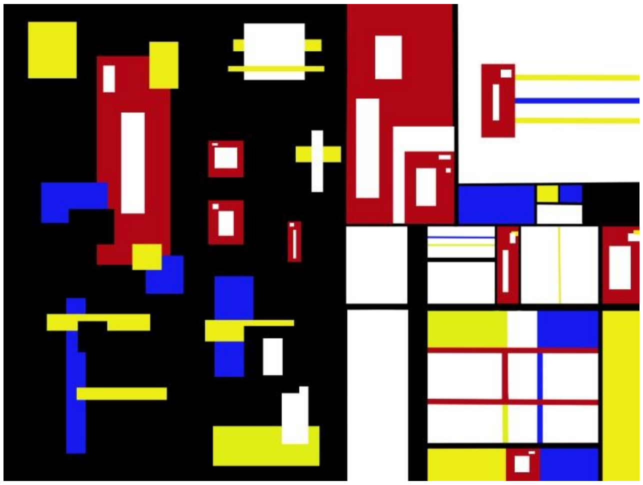

শিল্পী: আমন সাহা (বয়স ১৮)

আত্মজ

দেবব্রত তরফদার

তিন চারদিন ধরে অঝোর ধারায় বৃষ্টি হচ্ছে। বহুতল বাড়ির উপর থেকে কলকাতাকে কুয়াশার ঢাকা মনে হয়। লবণ হ্রদের এই অঞ্চলে এখনো কিছু গাছগাছালি অবশিষ্ট রয়েছে, দূর থেকে সবুজ দেখে বোঝা যায়। কিছুদিন ধকল গেছে খুব। বহুজাতিক সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মচারীর কাজ এবং দায়িত্বের চাপ অনেক বেশি। বিশেষ করে মনোময়ের মতো উচ্চপদস্থ কর্মচারী, যিনি ব্যবস্থাপনা বিভাগের উচ্চপদে আসীন। কদিন একটু কাজের চাপ কম, আজ তাঁকে বৃষ্টি দেখার বিলাসিতায় পেয়েছে। কেন জানি না বারবার আনমনা হয়ে যাচ্ছেন তিনি। মনে পড়ে যাচ্ছে মামারবাড়ির গ্রামের কথা। দু একটি বৃষ্টিভেজা দিনের কথা মনে আছে। দাদুর সঙ্গে মাঠে ঘোরা, ছোটমামার ছিপ ফেলা, বা পাশের মাঠে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে বল পেটানো। তাঁর মতো চরম পেশাদার মানুষ কাজ আর লক্ষ্য স্থির রেখে উপরে ওঠায় যাঁর ধ্যানজ্ঞান, তার কেন ফিরে আসা দিনের কথা মনে পড়বে এই অবেলায়। তাঁর বয়স এখন চুয়ান্ন, এই মধ্য পঞ্চাশেই বুড়ো হয়ে গেলেন নাকি।

নদীয়ার এক মফস্বল শহর রানাঘাটের ছেলে তিনি। অতি ছোট বয়সে মাকে হারান, মায়ের মুখ মনেই পড়ে না। তবে স্নেহ ভালবাসা যত্নের অভাব হয়নি কোনোদিন। ঠাকুমা, ছোটপিসি, বড়কাকিমা এঁরা তাঁর যত্নের ত্রুটি রাখেননি। ছোটপিসির বিয়ের পর একটু একা লাগত কিন্ত ততদিনে সে বড় হয়ে গেছে। শান্ত মেধাবী ছেলেটিকে কখনো শাসন করতে হয়নি। মেধাবী হলেও সে বইমুখো নয়। ছোটবেলা থেকেই ছোটকাকার সঙ্গে মাঠে গেছে।

ভালবাসার আর একটি জায়গা ছিল, তাঁর মামার-বাড়ি। মায়ের মৃত্যুর পর মামারবাড়ি, মানে বহরমপুরে গঙ্গার ওপারের গোয়ালজান গ্রামে তাঁর শিকড় অনেক পাকাপোক্ত হয়েছে; বাড়ির মেয়ের সন্তানকে আঁকড়ে ধরেছিলেন তাঁরা। তাই ছোটবেলার অনেকটা সময় তাঁর কেটেছে ওই গঙ্গার ধারের গ্রামে। গঙ্গার আকর্ষণও তাঁর কাছে কম ছিল না। বাবা মার্চেন্ট নেভিতে ছিলেন। দু'এক বছর পর পর আসতেন প্রচুর জিনিস নিয়ে। বাবার বাড়ি আসার চেয়ে এসব জিনিসের প্রতি আকর্ষণ ছিল অনেক বেশি। একে মা নেই তারপর বাবার আসার ঠিক ছিল না, তাই বাবার সঙ্গে সঠিক বন্ডিং গড়ে ওঠেনি। ছোটপিসির বিয়ের পর তার কানে কিছু কথা আসে বাবার বিয়ে সংক্রান্ত বিষয়ে। বাবার আপত্তি থাকলেও ঠাকুরদার উপর কোনো কথা চলে না; তাই কিছুদিন পর অনাড়ম্বরভাবে বাড়িতে নতুন মায়ের আগমন ঘটে। এই নতুন মা'টি ছোটপিসির চাইতেও বয়সে ছোট। প্রথম প্রথম একটু আড়ষ্টতা থাকলেও পরে ব্যাপারটা সহজ হয়ে গিয়েছিল। এক বছর পর ফুটফুটে পুতুলের মতো একটি বোনের জন্ম। মনোময় তখন অবশ্য অনেক বড় হয়ে গেছে। তার বাবার বিয়ে বা বোনের জন্ম নিয়ে বখাটে ছেলেরা কুৎসিত ইঙ্গিত করলেও সে এড়িয়ে গেছে। বারো ক্লাস পাস করে মেডিকেল বা এঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তি না হয়ে বাড়ির অমতে নিজের জেদে ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে অর্থনীতি নিয়ে। কলকাতায় মেস হস্টেলে কেটে গেল প্রায় ছ'সাত বছর। বাড়ি থেকে টাকার যোগান সঠিক সময়েই এসেছে। সেদিক থেকে তাকে কখনো ভাবতে হয়নি। ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় এক ক্লাস ছোট সুমনাকে ভাললাগা এবং পরে ভালবাসা। পাস করার পর প্রথমে ব্যাঙ্কে চাকরি, তারপর বিয়ে এবং দুটি ছেলেমেয়ে। এরমধ্যে ব্যাঙ্কের চাকরি ছেড়ে বহুজাতিক সংস্থায় যোগদান। সুমনার কলেজে চাকরি এবং নিউ আলিপুরে ফ্ল্যাট। প্রথম কয়েক বছর কলকাতায়, তারপর পায়ের তলায় সরষে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং দেশের বাইরে কেটে গেছে বহু বছর। সুমনা একাই ছেলেমেয়ের দেখভাল করেছেন, মনোময় অর্থের যোগানদার মাত্র। ছেলে রনি ফিজিক্স অনার্স, থার্ড ইয়ার সেন্টজেভিয়ার্সে। পড়ার চাইতে তার প্রেম সাইকেলে। সে সাইক্লিস্ট এবং এরই মধ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অভিযান চালিয়েছে তার ক্লাবের সঙ্গে। মেয়ে তিতলি লেডি ব্রেবোনে ইংরেজি অনার্সে ভর্তি হয়েছে এবছর। সে পড়ার সঙ্গে নাচ নিয়ে ব্যস্ত। একজন নামী শিক্ষিকার নাচের দলের সঙ্গে বিদেশ পর্যন্ত ঘুরে এসেছে।

পরিপূর্ণ সফল একটি মানুষ মনোময়, ঘরে এবং বাইরে। মনোময়ের এক তীব্র আকর্ষণী শক্তি আছে ছোটবেলা থেকেই। বাড়ি, স্কুল, কলেজ, বন্ধুমহল এবং কর্মক্ষেত্রে তাঁকে

পছন্দ করেছেন বেশিরভাগ মানুষ | দেখা গেছে প্রথম আলাপেই অনেকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে| তা সত্ত্বেও তিনি নিজের ভিতর অসম্ভব নিরাসক্ত একজন মানুষ | অতৃপ্তিকে এড়ানোর জন্য তিনি প্রথম থেকেই কাজকে আঁকড়ে ধরেছেন, সেখান থেকেই তাঁর উত্তরণ | আর উপরে ওঠা মানেই তো আরো বেশি একা হয়ে যাওয়া |

ছেলেমেয়ে তাঁকে যে অপছন্দ করে তা নয়, বরং বাবাকে নিয়ে প্রচ্ছন্ন গর্ব রয়েছে তাদের | অথচ ছোটবেলা থেকেই বাবা তাদের দূরের মানুষ; এতদিনেও সেই দূরত্ব খুব একটা কমেনি | ছোটবেলায় মাতৃহারা হওয়াই কি এর কারণ? তা তো নয়, কেননা মাকে তাঁর মনেই নেই; আর স্নেহ ভালবাসার তো অভাব হয়নি কোনদিন | সুমনার সঙ্গে প্রেম থাকলেও সুমনার ভালবাসায় যেমন ব্যগ্রতা ছিল, তাঁর তেমন ছিল না, আর তাঁদের বিয়েটা না হলেও হয়তো তাঁর তেমন দুঃখ হতো না | দীর্ঘদিনের অদর্শনে সুমনা যেমন ব্যাকুল থাকত, তিনি নিজে তেমন টান অনুভব করেননি | তাঁর এই শীতলতায় সুমনার ভালবাসাও শুকিয়ে গেছে|

- স্যার আপনি কি এখনও থাকবেন?

নিজস্ব আরদালি রতনের কথায় সম্বিত ফেরে তাঁর | কখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমেছে| এখন বৃষ্টির জোর কম হলেও, ঝিরঝির করে পড়ছে| অনেকদিন পর তাঁর পুরনো কলকাতায় যেতে ইচ্ছে হ'ল| বহুদিন পর পুরনো কলেজের সামনে এসে দাঁড়ালেন | সন্ধ্যার কলেজ স্ট্রিটের ব্যস্ততা একটু কম| কফি হাউস যে টানছিল না তা নয়, কিন্তু পুরনো টেবিল থাকলেও পুরনো মানুষজন কেউ নেই| অনেক ভেবেও দু একজন বাদে কারোকে মনে করতে পারলেন না | যৌবনকালের পুরনো চায়ের দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি| অনেক কিছুর পরিবর্তন হলেও এখনও এই দোকানের মতো অনেক কিছুই আবার একই রকম রয়ে গেছে, এমনকি চায়ের স্বাদ পর্যন্ত | তবে দীর্ঘদিনের অনভ্যাসে এক চুমুকের বেশি খেতে পারলেন না| তিনি একটু বেশি স্বাস্থ্য সচেতন| ভোরবেলায় প্রাতঃভ্রমণ, জগিং, তার সঙ্গে ফ্রিহ্যান্ড; তা যেখানেই থাকুন না কেন | বয়সোচিত কারণে মধ্যপ্রদেশ সামান্য স্ফীত হলেও মধ্য চল্লিশ বলে চালিয়ে দেওয়া যায়| বরং সুমনাকেই তাঁর চেয়ে বেশি বয়সী মনে হয় | একচুমুক চা খেয়ে ফেলে দিতে গিয়ে ভাবলেন ইচ্ছে থাকলেই অতীতে ফেরা যায় না| এমন সময় একটি মেল আসল | মেল দেখলেন – আগামীকাল দুপুর দুটোয় বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের স্পেশাল মিটিং মুম্বাইতে | সকালে ফ্লাইট | টিকিটও মেল করে দিয়েছে; অতএব নস্টালজিক হবার সময় এখন নয়, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা দরকার|

নিউ আলিপুরে তিন হাজার স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাট, প্রায় দশবছর আগে কেনা | দুটো গাড়ি থাকলেও তিতলির কলেজ, পড়া, নাচের ক্লাসের জন্য বেশ অসুবিধা হচ্ছে ইদানীং| একটা মোটর বাইক থাকলেও সাইকেল রনির বিশেষ পছন্দের; আছেও বেশ কয়েকটি রেসিং সাইকেল | সেই সাইকেলই রনি বেশি ব্যবহার করে| নিউ আলিপুর থেকে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ মাত্র সাত কিলোমিটার; ট্রাফিকের ঝামেলা না থাকলে রনির কুড়ি মিনিট লাগার কথা|

মনোময় বাড়ি ফিরে দেখলেন তিনজনের কেউ ফেরেনি| রনি আটটা বা সাড়ে আটটা নাগাদ ফেরে| সুমনা কলেজ থেকে অনেকদিন কাজকর্ম বাজার ইত্যাদি সেরে তিতলিকে নিয়ে ফেরেন | তিনি আরাম চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন| কাজের মেয়েটি জিজ্ঞেস করল চা দেবে কিনা| তিনি জানালেন চা চান না, সকালের ফ্লাইটে মুম্বাই যাবেন তাই ন'টার সময় ডিনার করবেন| স্নান করে সিভাস রিগ্যালের বড় একটা পেগ নিয়ে বসেন| তিনি পরিমিত মদ্যপায়ী এবং তাঁর একটিই ব্র্যান্ড – অফিসে মিটিং শেষে বা পার্টিতে বড়জোর দু'এক পেগ| গোঁড়া পরিবারের মেয়ে সুমনা, এসব একেবারেই পছন্দ নয়, তবে বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানে স্বামী কাজ করার সুবাদে অনেক কিছুই তাঁকে মানিয়ে নিতে হয়েছে|

তিনি ঘরে একটি কম পাওয়ারের আলো জ্বালিয়ে বসে থাকেন| এম এসসি পাস করার পর এস আইতে ভর্তির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, এমন সময় পুরনো এক পরীক্ষার দৌলতে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে চাকরি পেয়ে যান প্রবেশনারী অফিসার পদে | জীবনে স্থিতির কারণে সুমনা বাধা না দিলেও বাড়ি থেকে এই চাকরি না করার জন্য চাপ এসেছিল| আবার এই চাকরি ছেড়ে এম এন সি-তে জয়েন করার সময়ও সুমনার আপত্তি ছিল| উচ্চ বেতন কাঠামো, বিদেশে এম বি এ পড়ার সুযোগ এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধার কারণে কোনো আপত্তিই ধোপে টেকেনি| সুমনা আর

শিশুপুত্রকে রেখে তিনি দু'বছরের জন্য আমেরিকায় পাড়ি দিলেন কম্পানির পয়সায় এম বি এ করার জন্য। এরপর আর পিছনে ফেরার সময় পাননি। প্রত্যাশা অনুযায়ী সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে শুধুই উপরে উঠেছেন। যত উপরে উঠেছেন ততই ছোটবেলার কাছের মানুষগুলো দূরে সরে গেছে। এমনকি তাঁর নিজের মানুষরাও। ধীরে ধীরে ক্ষয়ে আসে সব শিকড়গুলি। বোনের বিয়েতে রানাঘাটে শেষ যাওয়া। তার আরো আগে দিদার পারলৌকিক কাজে গোয়ালজান যাওয়া। সুমনা অবশ্য সবার সঙ্গেই যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করেন। বাড়িতে মানুষজন আসলেও বিরক্ত হন না। তিনি জয়েন্ট ফ্যামিলির মেয়ে। মনোময় না পারলেও সুমনা তাঁর আত্মীয়দের অনেকের সঙ্গেই যোগাযোগ রাখেন। এমনই বিরল শ্রেণীর মানুষ সুমনা। নিজের শিকড় উপড়িয়ে ফেললে সম্পর্কের গাছটির মৃত্যু হবেই। তবে ইদানীং দু'একটি পুরনো ছবি অস্পষ্টভাবে ফুটে উঠছে কেন! আর উঠেই মিলিয়ে যাচ্ছে। কেন এমন হয়!

২

এরপর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। মুম্বাইয়ের মিটিং-এ কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় তার প্রয়োগের জন্য ডিরেক্টরগণকে ছুটতে হচ্ছে দেশের বিভিন্ন ব্রাঞ্চে। তাই দিল্লি এবং ব্যাঙ্গালোরের অফিস ঘুরে আবার কলকাতায়। এখানে কতদিন কে জানে!

জুলাইয়ের মাঝামাঝি এক দুপুরে আরদালি রতন একটি স্লিপ দিয়ে বলল, একটি ছেলে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়, ভিজিটিং রুমে বসিয়ে রেখেছি। মনোময় আনমনে স্লিপটি নিয়ে তাঁর কাজে ব্যস্ত হয়ে যান। ঘন্টাদুয়েক পর তাঁর মনে পড়ল ছেলেটির কথা, এর জন্য অবশ্য কোনো অনুশোচনা নেই। কেননা তাঁদের মতো পদমর্যাদার এবং ব্যস্ত মানুষের সঙ্গে দেখা করতে হলে অপেক্ষা করা একটি সাধারণ ব্যাপার। স্লিপটি টেবিলের উপরেই আছে। উদ্দালক মুখার্জি, সুন্দর হাতের লেখা। তিনি মনে করতে পারলেন না এই নামে কাউকে চেনেন কিনা। রতনকে জিজ্ঞেস করলেন, ছেলেটি কি আছে এখনো?

- হ্যাঁ স্যার, ম্যাগাজিন পড়ছে।

- ঠিক আছে পাঠিয়ে দাও।

একটু পরে বছর আঠারোর একটি ছেলে এসে ঢোকে। রোগা ছিপছিপে একহারা চেহারা। মুখে নরম দাড়ি, লম্বায় তাঁর মতোই হবে, ছ'ফুটের কাছাকাছি। ভাষা ভাষা চোখদুটো কেমন চেনা মনে হয়। মেধাবী মানুষটি কিছু মনে করার চেষ্টা করেন। ছেলেটি তখনো দাঁড়িয়ে, তার মুখটা বিষণ্ন। তিনি ছেলেটিকে বসতে বলে আবার কাজে ডুবে যান। মিনিট পনেরো পর ফাইল বন্ধ করে ছেলেটিকে দেখেন। তারপর বলেন, তোমার বাড়ি কোথায়? আমার সঙ্গে তোমার কী প্রয়োজন? ছেলেটি কোনো কথা না বলে একটি মুখবন্ধ সাদা খাম এগিয়ে দিয়ে বলে, এটি রাখালদাদু দিয়েছেন।

রাখালদাদু মানে তো মনোময়ের ছোটমামা। ছেলেটি তাহলে ছোটমামার পরিচিত কেউ।

ভিতরের চিঠি খুলে 'বাবলা' সম্বোধন দেখে এক অন্যরকম অনুভূতি হয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ডাকনামে ডাকা মানুষের সংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকে। এই মাল্টিন্যাশনাল কম্পানীর সিনিয়র ডিরেক্টর এম এস-এর ডাকনাম যে বাবলা তা তিনি নিজেই ভুলে গিয়েছিলেন। চিঠিতে টিপিক্যাল বাড়ির কুশল জিজ্ঞেস করার পর লিখেছেন, এই ছেলেটির কেউ নেই কলকাতায়। অসুবিধায় পড়লে দেখিস আর পরিচয়টা ওর কাছ থেকেই জেনে নিস।

চিঠি সরিয়ে মনোময় ছেলেটিকে লক্ষ্য করেন। এর মধ্যে একটা লুকোচুরি খেলা আছে, নাহলে ছোটমামা ছেলেটির পরিচয় দিলেন না কেন! ঠোঁটটেপা ছেলেটি তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। চোখ মুখের ভাব বোঝা যাচ্ছে না। তাঁর সঙ্গে প্রথম দর্শনে প্রায় প্রত্যেকের চোখে যে মুগ্ধতা দেখা যায় তা এই ছেলেটির নেই। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি কে?

- আমি উদ্দালক, বৃন্দাবন ভট্টাচার্যের নাতি।

কে বৃন্দাবন ভট্টাচার্য ভাবতে ভাবতে স্মৃতির অতলে ডুব দেন তিনি। ছেলেটি এখনও কিছু বলেনি। সফল মানুষটির স্মৃতিশক্তির পরীক্ষার খেলায় মেতেছে বোধহয়। বহুদিন পর উত্তেজনা অনুভব করেন। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে যায় দাদুর বাড়িতে একটি মন্দির ছিল, রাধাকৃষ্ণের নিত্যসেবা হতো। প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ বৃন্দাবন ভট্টাচার্য, বহরমপুর কোর্টের মুহুরী হলেও দাদুর বাড়ির স্থায়ী পুরোহিত ছিলেন। আর তখনই কিছু মনে পড়ে যাওয়ায় চমকে ওঠেন। তাঁর একটি মেয়ে ছিল ফুল্লরা, মানে ফুলি। কলাবিনুনি, লাল ফ্রকপরা একটি কিশোরীর

মুখ ভেসে ওঠে। এবার বুঝতে পারেন মাতৃমুখী ছেলেটিকে কেন এত চেনা মনে হচ্ছিল। স্মৃতিশক্তির পরীক্ষায় উৎরে যাবার কারণে নিজেকে হালকা লাগে। তিনি হেসে বলেন, তুমি ফুল্লরার ছেলে?

- হ্যাঁ, বলে ঘাড় নাড়ে ছেলেটি। তার মুখের রেখাও একটু নরম হয়। মুখে কিছু না বললেও চোখ হাসে।

মনোময় আগ্রহ দেখাতে গিয়েও সংযত হন। কোনো উটকো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ছেন না তো!

- তুমি কি কলকাতায় থাকো?

ছেলেটি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ে।

- লেখাপড়া করতে এসেছ?

- হ্যাঁ।

- কি পড়ো?

- আমি এবার প্রেসিডেন্সি কলেজে ফিজিক্স অনার্সে ভর্তি হয়েছি।

কলেজ এবং বিষয় শুনে নড়েচড়ে বসেন মনোময়। কোথায় থাকো তুমি?

- হোস্টেল পাইনি। এম জি রোডে এক দাদার মেসে আছি। এখনও স্থায়ী আস্তানা জোটেনি।

মেসের ঠিকানা জিজ্ঞেস করে চমকে ওঠেন। ওই মেসে তাঁর ছাত্র বয়সের আট বছর কেটেছে। বহুদিন ঐ রাস্তায় যাননি। তখনই মেসটির শেষ অবস্থা ছিল। তিনি অবাক হন তিরিশ বছর আগের সেই মেসবাড়ি এখনো টিকে আছে। কিন্তু বিস্ময় প্রকাশ না করে জিজ্ঞেস করেন, তোমার রেজাল্ট নিশ্চয়ই ভাল হয়েছিল?

রেজাল্ট শুনে আবার চমকাবার পালা। ছেলেটির জাহির করার মনোভাব নেই। শুধু নম্বর ছাড়া আর কোনো কথা বলেনি সে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি জেলায় স্ট্যান্ড করেছ?

- আমি রাজ্যে ফোর্থ হয়েছি।

জীবনে অনেক বিখ্যাত মানুষের সান্নিধ্যে আসলেও রাজ্যে স্ট্যান্ড করা কোনো ছাত্রকে এই প্রথম এত কাছ থেকে দেখছেন। এবার তিনি একটু সহজ হন। বহুদিন পর কেজো মনোময়ের মধ্যে এক অন্য অনুভূতি জাগে। আচ্ছা, তোমরা এখন থাকো কোথায়?

- আমরা এখন গোয়ালজানে থাকি দাদুর বাড়িতে। দিদা মারা গেছেন, দাদু শয্যাশায়ী; আমরা ওখানে থাকি।

মনোময় একটু ইতস্তত করে বলেন, তোমার বাবা কী করেন?

- বাবা প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। ছ'বছর আগে মারা গেছেন। তখন থেকেই আমরা দাদুর বাড়িতে থাকি।

নিরাসক্ত মানুষটির বুক কেঁপে যায়। সামনে বসে থাকা ছেলেটির মুখে সবসময় হাসি। কথা বলার ভঙ্গি অসাধারণ। ফুলি কেমন আছে জিজ্ঞেস করার কোনো মানে হয় না। ছেলেটি বলেই চলে। মা অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার, আমি চলে আসায় মায়ের অসুবিধে হচ্ছে খুব, দাদুকে কিছুটা দেখাশোনা আমিই করতাম কিনা।

রতনকে ডেকে ক্যান্টিন থেকে কিছু খাবার আনার কথা বলায় ছেলেটি হাসতে হাসতে বলেছিল, কিছু খাব না, অভ্যাস খারাপ হয়ে যাবে।

গরিবের গরীবিয়ানার অহংকারের ব্যাপারটা বুঝলেও চরম সত্যটা বুঝে চুপ করে থাকেন। তিনি ভাবেন একে কিছু টাকা অফার করা যায় কিনা, কিন্তু সাহস পান না। তবুও বলেন, তোমার কিছু প্রয়োজন হলে অবশ্যই বলবে।

- তা তো বলবই, কলেজ আর মেস ছাড়া আপনিই এই শহরে আমার প্রথম পরিচিত মানুষ। আসলে মায়ের কাছ থেকে আপনার কথা এত শুনেছি যে ছোটবেলায় আপনাকে অতি-মানব ভাবতাম। তাই আপনাকে দেখার খুব ইচ্ছে ছিল।

- তা, ছোটবেলার কল্পনার সঙ্গে মিলল কিছু?

- ছোটবেলায় মানুষের কত কল্পনা থাকে। এই বয়সে সেই তুলনা বোকামি, আর শুধু পরিচয়ে কিছু বোঝা যায় না।

ছেলেটি উঠলে মনোময় জিজ্ঞেস করেন, তোমার স্মার্টফোন আছে?

- বাব্বা, এখন স্মার্টফোন ছাড়া জীবন অচল। ছেলেটি হেসে পকেট থেকে একটি স্মার্টফোন বার করে। মনোময় হেসে একটি কার্ড এগিয়ে দেন।

- তার কোন প্রয়োজন হবে না, টেবিলের কাঁচের নিচে কার্ডটি আগেই দেখে নিয়েছি। দশ ডিজিটের সংখ্যা বইতো নয়। অনুমতি পেলাম এবার ফোন মেমরিতে রাখব। আর আমার নম্বরটা আপনার প্রয়োজনে লাগার কথা নয়।

সুন্দর ছেলেটি আপাত নিরীহ কিন্তু ছুরি চালাতে জানে ঠান্ডা মাথায়। এটা তো লড়াইয়ের ময়দান নয়, ছেলেটিও তাঁর

প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, তবে তাঁর উত্তেজনা জাগে কেন! এ পর্যন্ত তাকে কোন সম্বোধন করেননি, করার কথাও নয় কিন্তু যাবার আগে মনোময় জিজ্ঞেস করেন, তোমার ডাকনাম কি?
ছেলেটি থামে, তাঁর দিকে ফিরে দাঁড়ায়। মুখে সেই হাসি। ঠাকুমার কথায় ভুবন-ভোলানো হাসি নাকি এরকমই হয়। তারপর একটু থেমে বলে, মা আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু। আমি একটু বড় হবার পর মা আমার সঙ্গে সবকিছু শেয়ার করেন। আমার একটা ডাকনাম আছে, কিন্তু খুবই অপছন্দের। অপছন্দটা অবশ্য বড় হবার পর শুরু হয়েছে। কিন্তু কী আর করা যাবে – সবাই তো সেই নামেই ডাকে। এমনকি আমার কলেজের অনেক বন্ধুরা আমাকে 'বাবলা' নামে ডাকতেই বেশি পছন্দ করে।

উদ্দালক চলে গেছে ঘন্টাখানেক হ'ল।মনোময় বসে আছেন স্থবিরের মতো। শেষ তীরটি এভাবে আসবে তিনি বুঝতেই পারেননি। নিজের মধ্যে এরকম একটা লড়াই শুরু হবে তা দু'ঘন্টা আগেও ভাবেননি। তবে উদ্দালক এখানে আর আসবে না এটা তিনি ভাল করেই জানেন, কিন্তু তার অস্তিত্ব রেখে গেল কঠিনভাবে। প্রথম রাউন্ডে নক আউট হলেও ছেলেটিকে একটুও খারাপ লাগেনি। বরং আরো দু এক রাউন্ড লড়াইয়ের জন্য উত্তেজনা অনুভব করেন।

৩

রাত্রি এগারোটা বাজে। সাধারণত মনোময় সান্যাল দশটার মধ্যে ডিনার সেরে বিছানায় চলে যান। কোনো কোনো দিন এক পেগ, ক্বচিৎ দু'পেগ মদ্যপান করেন। আজ তৃতীয় পেগ শেষ হয়েছে, কিন্তু গ্লাসে এখনো পানীয়, অর্থাৎ চতুর্থ পেগ চলছে। সুমনা এসে ঘুরে গেছেন মিনিট পাঁচেক আগে। তাঁদের কথোপকথন ছিল এরকম –

- কী ব্যাপার, আজ ডিনার করবে না?
- তোমরা করেছ?
- আমরা তো তোমার পরে ডিনার করি। এই সময়টায় আমরা একটু কথাবার্তা বলি। আমাদের ডিনারের সময় হয়েছে, তাই জানতে এসেছি। আমাদের এই গল্প তো তুমি পছন্দ কর না।
- কখন বললাম পছন্দ করি না?
- মুখে বলার প্রয়োজন আছে কি? তুমি কতদিন আমাদের সঙ্গে বসোনি বলো তো?

মনোময় চুপ করে থাকেন। সুমনার অভিযোগ মিথ্যে নয়। দূরত্বের কারণে ছোটবেলা থেকেই ছেলে-মেয়ে মায়ের কাছে যেমন সহজ, বাবার কাছে তেমন নয়। তিনি নিজেও আর উদ্যোগ নিতে পারেননি। মাঝখান থেকে তিনি থাকলে ওদের আড্ডা মাটি হবে তাই ওদের সঙ্গে সামিল হন না।
আজ হঠাৎ বহুদিন পর মনোময় সুমনার বাহু চেপে ধরে আকর্ষণ করেন। সুমনা তাঁর দিকে তাকান শীতল চোখে। বরাবরই তিনি কম কথার মানুষ। অতিরিক্ত মদ্যপানে মনোময়ের মুখে লাল আভা, গাল চকচক করছে। সুমনা ধীর গলায় বলেন, তুমি তো জানো নেশাগ্রস্ত মানুষ আমার বরাবরের অপছন্দ।

তাঁদের যৌনজীবন স্বাভাবিক নয় বহুদিন। চুয়ান্ন বছরের মনোময়ের রুটিন মাফিক জীবন যাপন, এক্সারসাইজ আর প্রাতঃভ্রমণে সুঠাম, টানটান চেহারা। যুবকের মতোই মনে হয় তাঁকে। অন্যদিকে তিতলির জন্মের পর নানান মেয়েলি অসুখ আর অপারেশনে সুমনার চেহারা ভেঙে গেছে। তাঁকে মনোময়ের চাইতে বেশি বয়সী মনে হয়। আর দেহমিলনে সুমনার শীতলতার কারণে তাঁদের শয়নকক্ষ বহুদিন আলাদা। কিন্তু আজকে সুমনা তাঁর স্বামীকে কাঠগড়ায় দাঁড় করান, আমাকে আবার কী দরকার? আমাকে ছাড়াই তো তোমার চলে যাচ্ছে বহুদিন। পুরনো বাতিল মানুষকে আবার সোহাগের জন্য দরকার পড়ল কেন?
মনোময় চুপ করে থাকেন, সুমনা ভাবে এই লোকটি কি আসলে তাঁকে ভালবেসেছিলেন কোনোদিন! কিন্তু তাঁর নিজের ভালবাসায় তো যথেষ্ট ব্যগ্রতা ছিল! কথা বলে সুমনা অপেক্ষা করে, কিন্তু রোবট মানুষটি স্ত্রীর অভিযোগে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন, হয়তো অপরাধবোধে। অদৃশ্য দেওয়ালটি ভাঙার আগ্রহ নেই। সুমনা এগিয়ে যান খাবার ঘরের দিকে।
চতুর্থ পেগ শেষ করেন মনোময়। তারপর চুপ করে বসে থাকেন। তাঁর পানপাত্র এখনো খালি নয়। শারীরিক সম্পর্কের ব্যাপারে তাঁর ছুতমার্গ কম। বিদেশে এবং দেশে অনেক মহিলার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছে বা এখনো হয়ে থাকে। ব্যাপারটা তাঁর কাছে অনেকটা যান্ত্রিক। শারীরিকভাবে কেউই তাঁকে মন থেকে টানতে পারেনি। আজ অবশ্য অন্য একটি ব্যাপার – একটি বাচ্চা ছেলে তাঁকে এলোমেলো করে দিয়ে

গেল | ছেলেটির নিরাসক্ত হাসি খুবই আকর্ষণীয় যা বারবার ফুলির কথা মনে করিয়ে দেয় | ফুল্লরা তাঁর চেয়ে বছর তিনেকের ছোট | তিনি যখন ছুটিতে দাদুর বাড়িতে যেতেন তখন ফুল্লরা প্রতিদিন বাবার সঙ্গে আসত সাজি হাতে | একেবারেই দাদুর বাড়ির পাশে তাদের বাড়ি | দাদুর বাড়িতে গাছগাছালি ছিল প্রচুর; সবই ফুল এবং ফলের গাছ, সারা বছরই কোন না কোন মরসুমী ফুল-ফল হতো | চার-পাঁচ বছর বয়স থেকেই সে বাবলা দাদার সঙ্গে লেপ্টে থাকত | তার দিদা বারবার মজা করে জিজ্ঞেস করতেন কী রে বাবলাকে বিয়ে করবি? অমনি অবোধ মেয়েটি তৎক্ষণাৎ হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ত | আরেকটু বড় হলে দিদা একথা জিজ্ঞেস করলে লজ্জা পেয়ে বলত, যাঃ | বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে বাবলার উপর তার অধিকারবোধ বেড়ে যাচ্ছিল | বাবলা যখন নাইন/টেনে পড়ে তখন ফুল্লরার শারীরিক পরিবর্তন তার চোখে পড়তে শুরু করে | বয়ঃজনিত লজ্জা থাকলেও মেয়েটি সর্বক্ষণ এবাড়িতে থাকতে চাইত | একসঙ্গে ছবি আঁকা, গঙ্গার ধারে ঘুরতে যাওয়া – এসব তো ছিলই, আর হাঁ করে বাবলার কাছে শহর আর তার স্কুলের গল্প শুনত | এ সময় ফুল্লরার শরীরের সঙ্গে অসাবধান স্পর্শে বাবলার শরীরে শিহরণ জাগত | একসময় বাবলার ফেরার দিন এসে যেত; কিন্তু সেদিন ফুল্লরাকে দেখতে পাওয়া যেত না | টানহীন নিরাসক্ত ছেলেটির প্রথম আকর্ষণ জাগল মেয়েটির প্রতি | এরপর রানাঘাটে এসে ছুটির দিন গুনত ছেলেটি, আর ছোটমামাকে চিঠি লিখত তাকে নিয়ে যাবার জন্য | ক্লাস ইলেভেনে তার পড়ার বিঘ্ন ঘটবে বলে ঠাকুরদা সেবার গরমের ছুটিতে মামারবাড়ি যেতে নিষেধ করেন, পরে অবশ্য তার ম্লান মুখ দেখে অতি কম সময়ের জন্য ছুটি মঞ্জুর করেন | মাত্র চারদিন থেকে ফেরার আগের দিনের কথা মনে পড়ল | দাদুর বাড়িতে যখন মনোময় থাকত না তখন তাঁর ঘরে ফুল্লরার অনেক সময় কাটত | সে ওই ঘরটি পরিপাটি করে গুছিয়ে রাখত | সেই ঘরে ফেরার আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় বাবলা হঠাৎ ফুল্লরাকে বলে, এবার আর পুজোর ছুটিতে আসতে পারব না, আসব সেই উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে | নতমুখী কিশোরীর দু'ফোঁটা চোখের জল পড়ে মেঝের উপর | ছোটবেলা থেকে মা-হারা ছেলেটি, যে কারো প্রতি কখনো তেমন আকর্ষণ অনুভব করেনি, সে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে মেয়েটির চোখের জল দেখে | এরকম অনুভূতি তার আগে কখনো হয়নি | সে অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলে তুই আমায় ভালবাসিস? জানি না যাও, মেয়েটির মুখ দেখা যায় না | বাবলা তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুই হাতে তার মুখটা তুলে ধরে | কিশোরীর চোখ বন্ধ কিন্তু তার মুখ হাসি-কান্না আর লজ্জায় মাখামাখি | বাবলা তার দিকে একদৃষ্টে তাকায় তারপর তার ঠোঁট নেমে আসে কিশোরীর অনাঘ্রাত নিষ্পাপ ঠোঁটের উপর | এ ব্যাপারে তার অভিজ্ঞতা না থাকলেও স্কুলের অতিপক্ক ছেলেদের কাছে শোনা গল্প, আর কিছু ইয়ে টাইপের বইয়ের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল | তার নিঃশ্বাস গাঢ় হয়, সে আকর্ষণ করে ফুল্লরাকে | ফুল্লরা কিয়ৎকাল পর তাকে দুই হাতে সরিয়ে দিয়ে বলে, বাবলাদা, তুমি খুব খারাপ; দিদাকে বলে দেব | এই বলে দুহাতে মুখ ঢেকে পালিয়ে যায় | অজানা আশঙ্কায় বিনিদ্র রজনী কাটে বাবলার, যদি ফুল্লরা বলে দেয় দিদাকে | তারমধ্যে অপরাধবোধ এবং শারীরিক উত্তেজনার মিশ্র অনুভূতি |

পরদিন সকালে চলে আসার সময় তার মন চাইছিল ফুল্লরাকে একবার দেখার | হঠাৎই দিদা চিৎকার করে ডাকেন, এই ফুলি, কোথায় গেলি রে? বাবলা চলে যাচ্ছে | ফুল্লরা আসে, এই ফুল্লরাকে অচেনা মনে হয় বাবলার | একরাশ লজ্জা তার মুখে, সরাসরি বাবলার দিকে তাকাচ্ছে না | কিন্তু এই প্রথম সে তাদের সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে আসে | নৌকা ছেড়ে দেয়; দূরত্ব বাড়ার সঙ্গে ফুল্লরার অবয়বটা ছোট হতে থাকে | কিন্তু বাবলা এতদূর থেকেও বুঝতে পারে ফুল্লরা হাত দিয়ে চোখ মুছছে | তার দম বন্ধ হয়ে আসে, চোখও ঝাপসা হয় | এটাই কি তাহলে ভালবাসা? ভালবাসা এত খারাপ কেন? কেন এত কষ্ট দেয়?

ঠিক এক বছর পর তার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হয় | এর পর পরই ছিল জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা | এসব শেষ করে অল্প দিনের জন্য মামার বাড়িতে আসে বাবলা | পড়ার চাপ শেষ হওয়ায় ফুল্লরাকে দেখার জন্য মন উদগ্রীব ছিল | রানাঘাট থেকে বহরমপুর স্টেশনে সে নামে একা | ইচ্ছে করে কাউকে কিছু জানায়নি, সবাইকে চমকে দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল | তার পরদিন সকালে ফুল্লরার সঙ্গে দেখা হয় | এক বছরে ফুল্লরার অনেক পরিবর্তন হয়েছে | এখন ও আরো বেশি সুন্দর, কিন্তু আচরণ আগের মতো নয় | তাকে এখন অনেক দূরের

মানুষ বলে মনে হচ্ছে। আগের মতো কথায় কথায় তার ঘরে আসে না, এমনকি মামার বাড়িতে আসলে বড়মামী বা দিদার সঙ্গে গল্প করে চলে যায়। বাবলা ছটফট করে, হাঁপিয়ে ওঠে। পরদিন দুপুরবেলা ফুল্লরাকে একা পায়, কিরে কথা বলছিস না কেন?

- কোথায় কথা বললাম না? আচ্ছা মিথ্যুক তো!

- কই, একবারও তো আমার ঘরে আসলি না? চল, গঙ্গার ধারে যাই।

- তুমি যাও, মা বলেছেন আমি বড় হয়েছি, এখন ছেলেদের সঙ্গে মিশতে নেই।

- ও, বলে বাবলা চুপ করে যায়। তারপর রুদ্ধ গলায় বলে, তোর জন্যই তো আসলাম। এক বছর ধরে শুধু ভেবেছি কখন, কবে তোর সঙ্গে দেখা হবে। আর এসে দেখছি তুই আমাকে ভুলে গেছিস।

- কে বলল তোমায় ভুলেছি?

- বলতে হবে কেন, এই যে একবারও কাছে আসলি না।

- কেন, ভালবাসলে কি কাছে আসতে হবে?

- হবেই তো।

- না, তুমি খুব দুষ্টু হয়েছ আমি জানি।

- একটুও দুষ্টুমি করব না, কাছে আয়।

- এই তো আসলাম, বলে বাবলার গালটা ছুঁয়েই পালিয়ে যায় ফুল্লরা।

তারপর সেই বিশেষ দিন, দুপুরের পর আকাশ কালো হয়ে আসল। বাবলা ছুটল গঙ্গার ধারে। ঝড়ের আগে নদীর ধারে দাঁড়াতে তার ভীষণ ভাল লাগে। একটু পরেই প্রথমে ধীরে ও শেষে জোরে বাতাস বইতে শুরু করল। বাবলা তখন বাড়ির দিকে দৌড়াল, কিন্তু পৌঁছাতে না পেরে পাশে স্কুলের বারান্দায় দাঁড়ায়। বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টি শুরু হ'ল। তীব্র বাতাসে বৃষ্টির ছাট তার গায়ে ছুঁচের মতো বিঁধছে। বৃষ্টির দাপট কমলে দেখে ছোটমামা দৌড়ে আসছেন। দুজনে ঠান্ডায় হি হি করে কাঁপে, একটু পরে ঝড়ের দাপট কমলে তারা দুজন কাঁপতে কাঁপতে বাড়ি যায়। উঠোনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আম পড়ে আছে। বড়মামী আর দিদার সঙ্গে দৌড়ে দৌড়ে আম কুড়াচ্ছে ফুল্লরা। সে ঘরের দিকে ছোটে। ঘরে এখন আধো অন্ধকার, ভিজে জামাকাপড় বদলে নেয়। আজ বোধহয় আর কারেন্ট আসবে না। চারদিকে গাছের ডাল ভেঙে একাকার। বাইরে এসে দেখে বিকেলের আলো এখনো রয়েছে। ফুল্লরাকে দেখা যাচ্ছে না, সে বোধহয় বাড়ি চলে গেছে। বাবলা আবার বেরিয়ে যায়। একটু পরেই সন্ধ্যা হয়, বাড়ি বাড়ি শাঁখ বাজে। অন্ধকার হতেই সে বাড়ি গিয়ে দেখে আধো-অন্ধকারে হ্যারিকেনের পাশে বসে দিদার সঙ্গে বসে গল্প করছে কে ও? শাড়িপরা ফুল্লরাকে চিনতেই পারেনি সে। কিছুক্ষণ মুগ্ধ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে ঘরের দিকে যায় বাবলা। একটু পরে দিদা ফুল্লরাকে বলেন, যা তো ফুলি বাবলার ঘরে একটা বাতি দিয়ে আয়। ঠান্ডা লেগে গেল, বোধহয় কষ্ট হচ্ছে। ফুল্লরা এসে দেখে বাবলা খাটের এক পাশে বসে আছে। সে খুব কাছে এসে দাঁড়ায়, এত কাছে যে বাবলা নতুন শাড়ির গন্ধের সঙ্গে তার গায়ের গন্ধও পায়। বাবলা হাত বাড়িয়ে ফুল্লরাকে জড়িয়ে ধরে, ফুল্লরা তার হাত ছাড়িয়ে দেয়। তার গলার স্বর নিচু হলেও স্পষ্ট, ফিসফিস করে বলে, বাবলাদা, আমি সব সময় তোমার কথা ভাবি, প্রতি মুহূর্তে। আমার পড়ায় মন বসে না, কিচ্ছু ভাল লাগে না। কান্নায় তার গলা অবরুদ্ধ হয়ে আসে। বাবলার উত্তেজনা থেমে যায় সে গুটিয়ে নেয় নিজেকে। আচমকা ফুল্লরা নিজেকে উন্মুক্ত করে বাবলাকে জড়িয়ে ধরে, তারপর ফিসফিস করে বলে, এই দেখো আমি তোমায় কিনে নিলাম, তুমি আমার। এসময় তার মধ্যে কোন উত্তেজনা ছিল না, ছিল না কোন কামনার আভাস। ছিল আত্মপ্রত্যয় এবং দৃঢ়তা। বাবলার কিন্তু শরীরের মধ্যে তোলপাড় শুরু হয়, নিঃশ্বাস গরম হয়ে ওঠে, গা দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরোয়। তার হাত ফুল্লরাকে পাগলের মতো ছুঁয়ে চলে। ফুল্লরা হাত চেপে ধরে বলে, প্লিজ বাবলাদা এভাবে নয়। এখন নয়, আমি তো তোমারই, আমার সবকিছু তোমার কাছে জমা থাকল। বাবলা আড়ষ্ট হয়ে যায়। কোন জোর করতে পারে না। ফুল্লরা শান্তভাবে নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে বাবলার ঠোঁটে ঠোঁট ছুঁয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায়।

বিবশ বাবলা বসে থাকে চুপচাপ; জ্বর ছেড়ে গেলে যেমন অনুভূতি হয়, তেমন লাগে। পুরো ব্যাপারটা সে ঠান্ডা মাথায় গুছিয়ে ভাবে। ফুল্লরার ভালবাসার কাছে সে যেন গুটিয়ে যায়। রান্নাঘর থেকে দিদা আর মামীর সঙ্গে ফুল্লরার কণ্ঠস্বর শোনা যায়। কিছু একটা নিয়ে হাসাহাসি করছে। একটু পরে ফুল্লরা

খুব সহজভাবে এসে বলে, বাবলাদা বাড়ি গেলাম। বেশি রাত হলে মা আবার ঝাঁটাপেটা করবে।

আজ বহু বছর পর এসব কথা মনে পড়ছে কেন আবেগহীন রোবট মানুষটির! কোন কিছুই যাকে টেনে রাখতে পারেনি, কোন নারীই নয়। ফুল্লরার সঙ্গে যা ঘটেছিল সে তো ছিল বয়ঃসন্ধি কালের আবেগ মাত্র। মনোময় তো তখন শুধু শরীরের কথা ভেবেছে। শরীর, শরীর, তোমার কি মন নেই বাবলা, মন?

মাতাল মনোময় বিড়বিড় করে। ফুল্লরা আমার নামে তার ছেলের নাম রেখেছে। কেন রেখেছে আমি কি বুঝি না। বোকা মেয়ে, গেঁয়ো মেয়ে – ভালবাসা, ধুস। তিনি ইজি চেয়ারে বসেই ঘুমিয়ে পড়েন, গ্লাসে তখনো পানীয় অবশিষ্ট আছে।

এখনো বছর পাঁচেক চাকরি আছে। আঠাশ বছর বয়সে যে ইঁদুর-দৌড় শুরু হয়েছিল, ছাব্বিশ বছর ধরে তা চলছে। আরো উপরে ওঠা মানে আরো ক্ষমতা, আরো অর্থ। আর কি, তাদের এখন অর্থের অভাব নেই। সুমনার বেতন বোধহয় বেশ ভালই। ছেলেমেয়েরা মেধাবী, ভদ্র , রুচিশীল। নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে, কখনোই বাবা-মায়ের বোঝা হবে না। তবে কেন এই বিরামহীন ছুটে চলা! তাঁর ক্লান্তি লাগে, ভাবেন কী করবেন। আবার কাজের মধ্যে ডুবে যান। কিন্তু সদ্য কিশোর পেরোনো ছিপছিপে ছেলেটি, সে কখনো কখনো তাঁকে টেনে নিয়ে যায় অতীতে, মাঝে মাঝে এলোমেলো করে দেয় তাঁর সত্তাকে। ছেলেটিকে দেখে মনে হয় তাঁর নিজের অতীত যেন ফিরে এসেছে, কিন্তু এর সঙ্গে তাঁর কোন মিল নেই, শুধুমাত্র কলেজ আর ওই মেস ছাড়া। ইদানীংকালে হোয়াটস্অ্যাপ খুলে কিছুর জন্য অপেক্ষা করেন তিনি। কেন করেন তা তিনি নিজেই জানেন না।

এর মধ্যে ছোটমামার চিঠি আসে একদিন। মামা জানিয়েছেন উদ্দালক যে মনোময়ের সঙ্গে দেখা করেছে সেটা তাকে জানিয়েছে। মামা লিখেছেন, আমি বুঝতে পারছি ফুলির অসুবিধা হচ্ছে খুব, কিন্তু সে তো কখোনই তার অসুবিধার কথা মুখ ফুটে বলবে না। ওদিকে শুনলাম বাবু টিউশনি ধরেছেন নিজের খরচ চালাবার জন্য, কিন্তু রেজাল্ট খারাপ না হয়ে যায় ছেলেটার। বাবলা শুধু ওর মায়ের নয়, আমাদের পুরো গ্রামের মানুষদের স্বপ্ন, তুই পারলে একটু দেখিস।

আগে হলে মনোময় গেঁয়ো মামার কান্ডজ্ঞান না থাকায় বিরক্ত হতেন। তাঁর পরিচিতদের মধ্যে কারো লেখাপড়া চালাতে কষ্ট হচ্ছে তা এই প্রথম। আসলে তিনি তো কারো খোঁজই নেননি কোনদিন। আর তাঁর পাশে নিম্নবিত্ত মানুষই বা কোথায়। তিনি তো ব্যক্তিগতভাবে কারো সঙ্গে মেলামেশা করার প্রয়োজন বোধ করেননি কখনও।

এই মনোময় একদিন হঠাৎই তাঁর আরদালি রতনকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার ছেলে মেয়ে কটি?

রতন খুবই অবাক হয়; বলে, একটি ছেলে, একটি মেয়ে।

- কী পড়ে ওরা?

- মেয়ে ছোট, সে স্কুলে পড়ে। আর ছেলে এবছর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হ'ল ইতিহাস নিয়ে।

- ইতিহাস নিয়ে? মনোময় ভুরু কোঁচকান।

- হ্যাঁ স্যার, আমার ছেলে রেজাল্ট বরাবরই ভাল করে, কিন্তু ইতিহাসের জন্য পাগল; কারো কোন কথা শোনেনি, আমিও আর বাধা দিইনি।

অবাক হন মনোময়, মনে মনে হাসেন – স্বপ্নের ফেরিওয়ালারা এখনো আছে তাহলে! আনমনে জিজ্ঞেস করেন, রতন, তোমার বাড়ি তো বাঘাযতীন; তাই না?

- না স্যার, আমি নৈহাটিতে থাকি।

- নৈহাটি, তাহলে তো আমরা একই লাইনের, আমার বাড়ি রানাঘাটে।

কেমন অদ্ভুত লাগে। এতদিনের চেনা মানুষগুলি, অথচ তাদের সম্পর্কে কিছুই জানেন না। হঠাৎই মনোময় বলেন, ছেলে-মেয়ের লেখাপড়ার জন্য কিছু প্রয়োজন হলে অবশ্যই বলবে।

রতন অবাক হয়ে ঘাড় নাড়ে।

রতনের সঙ্গে কথা বলার পর মনোময় নিজের উপর বিরক্ত হন; এত কথা না বললেই বোধহয় ভাল ছিল। কম্পানির সিনিয়র ডিরেক্টরের মানায় না একজন আরদালির সঙ্গে এত কথা – কম্পানির নিয়মের মধ্যে এসব নেই।

আজকাল ফুল্লরার কথা মনে হয় কখনো কখনো। একজন অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার কত বেতন পায় তা জানা নেই। তার ছেলেটিকে সরাসরি সাহায্য করা সম্ভব নয়। ফুল্লরা তাঁর সম্পর্কে কতটুকু বলেছে ছেলেকে তা তিনি জানেন না। তবে

তিনি যে ছেলেটির অপছন্দের মানুষ, তা বোঝাতে একটুও আড়াল করেনি। কখনো কখনো তার পুরনো মেসে যাবার ইচ্ছে জাগে। তারপর চিন্তা করে দেখে মনোময় সান্যালের এসব আবেগ সাজে না।

কিন্তু একদিন সব এলোমেলো হয়ে গেল। লাঞ্চের আগে মিটিং ছিল সেদিন। শেষ হতে আড়াইটে বাজল। মনোময় লাঞ্চ না করে হঠাৎ বেরিয়ে যান। বহুদিন পর দিনের বেলায় পুরনো জায়গায়। বর্ষা শেষ হলেও এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। কলেজ স্ট্রিট চত্বরের দুপুরের সঙ্গে তিরিশ বছর আগেকার বেশ কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কলেজের উল্টোদিকে কর্নারে ছোট বইয়ের দোকানটি একই রকম আছে; শুধুমাত্র সাদা ধুতি আর শার্টপরা মানুষটির বদলে অল্প বয়সী একটি ছেলে রয়েছে। তিনি সংস্কৃত কলেজের সামনে গাড়ি রেখে বড় বড় পা ফেলে তাঁর পুরনো কলেজে ঢুকে পড়েন, প্রায় তেত্রিশ বছর পর। নিজের সিদ্ধান্তে খুব অবাক হয়ে যান। মনে মনে হাসেন। আবার ভাবেন হঠকারী সিদ্ধান্ত হয়ে গেল কিনা।

সমস্ত ডিপার্টমেন্ট একই জায়গায় আছে, তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে গিয়ে খোঁজ করেন উদ্দালকের। সেখানে দেখা গেল তাকে অনেকেই চেনে, হয়তো তার ভাল রেজাল্টের জন্য। ক্লাস চলছে, একটু অপেক্ষা করেন তারপর লম্বা করিডোরে তার ছিপছিপে চেহারাটা দেখা যায়, মুখে সেই হাসি।

- কী ব্যাপার আপনি? চোখ মুখ দেখে মনে হয় খুব একটা অবাক হয়নি।

- এই তো, এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম তোমার সঙ্গে দেখা করে যাই।

- ভাল করেছেন।

- তোমার এখন ক্লাস আছে?

- আছে, তবে বাঙ্ক মারা যাবে।

তারা দুজন করিডোর দিয়ে হাঁটতে থাকে। করিডোরের শেষপ্রান্তে একটি মেয়ে উদ্দালককে ডাকে। সে মেয়েটির দিকে এগিয়ে যায়।

- কীরে বাবলা, কোথায় যাচ্ছিস?

- আজকে ডিসি স্যারের ক্লাসটা করছি না।

- কে ইনি?

- পরিচিত মানুষ।

- আমি ভাবলাম শ্বশুরমশাই।

- তা হতে পারে। তবে ওঁর মেয়ে আছে কিনা জানি না।

ওদের হাসির শব্দ মনোময়ের কানে আসে।

- তুই নোটটা ঠিকঠাক করে নিস। আমি এসে পরের ক্লাস ধরছি।

- তুই ক্লাসে না থাকলে ডিসি স্যার পড়াবেন তো? মেয়েটির মুখে কপট হাসি।

- যাঃ, কী আবোল তাবোল বকিস।

তারা দুজনে গেট পেরিয়ে যায়।

- স্যারেরা তোমায় খুব পছন্দ করেন, তাই না?

- তা করেন।

- তোমার ভাল রেজাল্টের জন্য?

- তা নয়, প্রেসিডেন্সিতে ভাল রেজাল্টের অভাব আছে নাকি? আপনি তো জানেনই। রেজাল্টের রেশ কেটে গেছে।

- দুজনে হেয়ার স্কুল পেরিয়ে ইউনিভার্সিটির দিকে হাঁটতে থাকে।

- তুমি হস্টেল পেয়েছ?

- না, তবে আমার তাড়া নেই। মেসে সেট হয়ে গেছি। ওই দাদা আমায় যেতে দেবেন না আর অন্য বোর্ডাররাও।

মনোময়ের তেত্রিশ বছর আগের সময় হঠাৎ উঁকি দিয়ে যায়।

- তোমার বই কেনা হয়েছে?

- সব হয়নি। তবে সমস্যা হচ্ছে না; লাইব্রেরী আছে, স্যারেরা আছেন, বন্ধুরাও খুব হেল্পফুল।

- টিউশন নিচ্ছ না?

উদ্দালক হাসে, মাকে নিংড়ালে আর কিছু বেরোবে না। আমি এখানে ভর্তি হতে চাইনি, এ শুধু মায়ের স্বপ্নপূরণ। তবে একজন স্যারের যা ফি, তাতে আমার সারা মাস চলে যাবার কথা।

- তুমি টিউশন নাও। আর আজই বইগুলো কিনে দিচ্ছি আমি।

- আপনি কেন দেবেন, আর আমিই বা কেন... কথা অসমাপ্ত রাখে সে। তারপর বলে, স্যারেরা আমার বিষয়ে কিছুটা আন্দাজ করেন। সবসময় তাঁদের সাহায্য পাচ্ছি। আর অহনাকে তো দেখলেন; ও সব নোট গুছিয়ে রাখে। বইয়ের

এখন প্রয়োজন নেই। সামনেই প্রথম সেমিস্টার, মোটামুটি সব গুছিয়ে নিয়েছি। এরপর একটু চুপচাপ থেকে বলে, প্রয়োজন হলে অবশ্যই বলব। এই শহরে আপনি ছাড়া আর আমার পরিচিত কেই বা আছেন।

মনোময় বুঝতে পারেন এই ছেলেটি কোনদিন তার প্রয়োজনের কথা বলবে না। তিনি জানেন উদ্দালক এই কথাটি মন থেকে বলেনি। কিন্তু শেষ বাক্যটি তাঁর মনকে নাড়া দেয়। মিথ্যে হলেও মানুষের কাছ থেকে এরকম কোন কথা শোনা এই প্রথম। কোনও মানুষ এরকম অকপট কথা বলেনি তাঁকে।

- চলো, তাহলে কিছু খাওয়া যাক।

উদ্দালক হাসে, ওই যে বলেছিলাম অভ্যেস খারাপ হয়ে যাবে! সকাল দশটা আর রাত্রি দশটা এই দুই বেলা মেসে খাবার জোটে। তখন রাক্ষসের মতো খেয়ে নিই – বলেই হেসে ফেলে। মা নাড়ু, মোয়া, নিমকি দিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু মেসের কাকুরা এর স্বাদ পাননি বহুদিন, তাই সবাই মিলে ভাগ বাটোয়ারা করে একদিনেই শেষ।

মনোময়ের চোখের সামনে দিদার রান্নাঘরের ছবিটা ভেসে ওঠে। লক্ষ্মীপুজোর আগে গরম গুড়ের সুবাসে সারা বাড়ি মাতোয়ারা, কত রকমের নাড়ু, মোয়া তৈরি হতো। ছেলেটি বোধহয় মনের কথা পড়তে পারে; সে বলে, নাঃ, আপনি বাদ গেছেন এবার। পরের বার আপনাকে খাওয়াতেই হবে।

সামনে চায়ের দোকান। উদ্দালক তাঁর উদ্দেশ্যে বলে, চলুন অজিতদার দোকানের এক গজ চা খাই। পুরনো হারিয়ে যাওয়া কথাটা আবার ফিরে আসে। তাঁরাও এই শব্দটি ব্যবহার করতেন।

দেখা গেল দোকানদারের সঙ্গে এর মধ্যেই অনেক পরিচিতি হয়ে গেছে তার। মাটির ভাঁড়ের সোঁদা গন্ধের সঙ্গে বেশি চা-চিনি-দুধের পরিচিত গন্ধ মিশে যায়। অনেকদিন পর হাতে বেমানান লম্বু বিস্কুট। গোল বিস্কুটের নাম কেন লম্বু, তার কারণটা উদ্ধার করা হ'ল না এ জীবনে। তিনি আগ্রহের সঙ্গে উদ্দালকের বিস্কুট খাওয়া দেখেন। উদ্দালক বলে, আপনি হয়তো এতে আর অভ্যস্ত নন।

আবার একটা পরীক্ষা নাকি? মনোময় আপ্রাণ সহজ হবার চেষ্টা করেন। ওয়ালেটে হাত রাখতে গেলে উদ্দালক বলে, অজিতদার দোকানে খাতা আছে সেখানে লেখা হয়ে গেছে। হাড়-বজ্জাত ছেলেটার কাছে হারতেও যেন ভাল লাগে। তিনি হেসে ফেলেন। দোকান থেকে বেরোনোর আগে দোকানির সঙ্গে তার কিছু কথোপকথন হয়।

- অজিতদা, ডাক্তার দেখিয়েছ?

- নারে, সময় হয়নি, কাঁচুমাচু মুখ করে লোকটি বলে।

- এবার উদ্দালকের একটি অন্য মূর্তি দেখেন তিনি। ছেলেটি রেগে গিয়ে বলে, অত কষ্ট করে লাইন করলাম মেডিকেলে বড় ডাক্তারকে দেখানোর জন্য, আর তুমি গেলে না! কালকে সেকেন্ড পিরিয়ড অফ আছে ঘাড় ধরে নিয়ে যাব তোমায়। না হলে কবে স্ট্রোক হয়ে কেলিয়ে পড়ে থাকবে দোকানে।

'কেলিয়ে' শব্দটি অনেকদিন পর শুনলেন তিনি। এসব শব্দ যুবক সম্প্রদায় ব্যবহার করে চিরকাল। কিন্তু কথাটি বলে উদ্দালক একটু লজ্জিত হ'ল মনে হয়।

- বাবলা, রাগ করিস না। তোকে আসতে হবে না, আমি ঠিক চলে যাব।

- মনে থাকে যেন। নাহলে ঘাড়ে করে তুলে নিয়ে যাব। আমার গায়ের জোর সম্পর্কে তোমার কোন ধারণা নেই।

বয়স্ক মানুষটি কাছে এসে ছেলেটির মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

- যা পাগলা, ভদ্রলোক অপেক্ষা করছেন।

বেরিয়ে এসে উদ্দালক বলে, আপনার গাড়ি কোথায়? তারপর দুজনে সংস্কৃত কলেজের দিকে হাঁটতে থাকে। গাড়ির কাছাকাছি পৌঁছালে উদ্দালক বলে, আমি জানতাম আপনি আসবেন, তাই আপনাকে নম্বর দিইনি।

মনোময় তার দিকে তাকান। তার মুখে সরল হাসি থাকলেও বুঝতে পারেন এই রাউন্ডেও তাঁর হার হ'ল।

- কেন বুঝতে পেরেছিলাম অন্য একদিন বলব। সেটা আমার মায়ের বলা কথা। আপনি ভাবুন কী হতে পারে।

সে আবার আর এক রাউন্ডের সূচনা করল বোধহয়।

গাড়িতে ওঠার আগে উদ্দালক বলে, আপনার হোয়াটস্ অ্যাপে আমার নম্বর টেক্সট করে দেব, ইচ্ছে হলে ফোন করবেন। আপনার মতো ব্যস্ত আর প্রতিষ্ঠিত মানুষের এখানে আসা মানায় না।

মনোময় বুঝতে পারেন এটি অতি সত্য কথা। আজকে আর অফিসে ফেরার ইচ্ছে নেই। ময়দানের পাশে ফাঁকা রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে বসে থাকেন তিনি। অস্থির লাগে, তাঁর ছেলে

কখনো তাঁর সঙ্গে এমন সহজভাবে কথা বলেনি।

রাতে ডিনারের পর শুয়ে পড়েন তাড়াতাড়ি। আগামীকাল অধস্তন কর্মীদের সঙ্গে মিটিং রয়েছে। তার জন্য অবশ্য ল্যাপটপে হোম ওয়ার্ক করা আছে। আরো একবার চোখ বোলাতে পারলে ভাল হতো, কিন্তু ইচ্ছে করছে না। এত বছরে এই প্রথম এত ক্লান্ত লাগছে। মায়ের বলা কথা – কী বলতে পারে উদ্দালক, তিনি জিজ্ঞেস করতে পারেননি। অনেক বিষয়ে কৌতূহল ছিল, কিন্তু রুচিতে বেধেছিল।

সেই দিনটির পর কলকাতায় চলে আসেন তিনি। প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হওয়ার পর নতুন জীবনের ব্যস্ততায় বাড়িতে দু'একবার গেলেও মুর্শিদাবাদে আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি। শুধু ছোটমামার চিঠি আসত মাঝেমধ্যে। ছোটমামার চিঠিতেই দিদার মৃত্যুর সংবাদ পান এবং দিদার পারলৌকিক কাজে দু'দিনের জন্য গোয়ালজানে যাওয়াই তার শেষ যাওয়া ছিল। এত লোকের মধ্যে ফুল্লরাই তাঁর দায়িত্ব নিয়েছিল বড়মামীর নির্দেশে। এই তিন বছরে আরো সুন্দরী হয়েছে মেয়েটি। চোখ ফেরানো যায় না। অথচ মনোময় আগের মতো টান অনুভব করেননি। তাঁর পাপী চোখ ফুল্লরার শরীরের চড়াই উৎরাই ছুঁয়ে গেছে শুধু। ফুল্লরা বলে, তুমি খুব অসভ্য হয়েছ বাবলাদা; অথচ তার মুখে ছিল প্রশ্রয়ের হাসি। হাজারো মানুষের ভিড়ে যখনই সে ফুল্লরাকে লক্ষ্য করেছে তখনই দেখে ফুল্লরা চেয়ে আছে তার দিকে। আবার সন্ধ্যাবেলায় তারা দুজনে যায় তাদের পুরনো প্রিয় জায়গায় – সেই গঙ্গার ধারে।

ফুল্লরা বলেছিল, তুমি আমায় আর ভালবাসো না বাবলাদা।

- কে বলল তোকে?

- কেন, আমি বুঝি না? দিদা শেষ দিন পর্যন্ত তোমার কথা বলেছেন, আর তুমি আসার সময় পেলে না। আমার মতো গেঁয়ো, বোকা, কুচ্ছিত মেয়েকে তোমার মনে রাখতে বয়েই গেছে।

মনোময় কী বলেছিল মনে নেই, কিন্তু তার মনে হয়েছিল সামনে অনেক বড় পৃথিবী পড়ে আছে।

- কী বোকা মেয়ে আমি, জোর করে কি কাউকে বেঁধে রাখা যায়!

ফেরার দিন আবার সেই নদীর ঘাটে। নৌকা ছাড়ার আগে বোধহয় মনোময় একটু আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেছিল। গাঢ়স্বরে বলেছিল, ফুলি, আমি ফিরে আসব একদিন।

ফুল্লরার মুখে বিচিত্র হাসি। ঠেক খাওয়া গরিব ঘরের মেয়েটি এখন অনেক পরিণত। সে বলেছিল, তুমি অনেক বড় হও বাবলাদা, তোমার পৃথিবী এখন আর আমার পৃথিবীর মতো ছোট নয়।

নৌকা ছেড়ে দেয়, হলুদ শাড়ি, এলো চুল যুবতীর অবয়ব ছোট হতে থাকে আগেরই মতো। এপারে নৌকা থেকে নামার পর ওদিকে চেয়ে দেখে হলুদ বিন্দুটি তখনো স্থির।

স্মৃতির নিচে চাপা পড়া বিবর্ণ ছবিটা এতদিন পর আবার ফিরে আসে কেন!

৪

বেশ কিছুদিন ধরে সুমনা লক্ষ্য করছেন – ব্যাঙ্কের চাকরি ছাড়া মানুষটি বহুজাতিক সংস্থায় যোগদান করার পর ক্রমশ দূরে সরে গিয়েছিলেন এখন সেই দূরত্ব কমানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। এক সময় সুমনার মনে হয়েছিল এই মানুষটি ছাড়া চলে যেতে পারে জীবন। কিন্তু ছেলেমেয়ের কথা ভেবে এই ভাবনাকে প্রশ্রয় দেননি তিনি, বরং আরো বেশি আঁকড়ে ধরেছেন সন্তানদের। মাঝখান থেকে বাবার সঙ্গে সন্তানদের অনেক বেশি দূরত্ব তৈরি হয়েছে, সেটাই তাঁকে অনেক পীড়া দেয়। এখন মাঝে মধ্যে ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময়ের মনোময় উঁকি দেন। ব্রেকফাস্ট আর ডিনার টেবিলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় বসে থাকেন মানুষটি। কখনো রনি বা তিতলিকে এমন প্রশ্ন করে বসেন যা তাঁর পক্ষে বেমানান। ছেলে মেয়ে বাবার প্রশ্নের উত্তর দিলেও অদৃশ্য দেওয়ালটা থেকেই যায়। কখনো বাবলির নাচ বা রনির সাইকেল রেসের কথা জিজ্ঞেস করেন। সুমনা এখন আশাবাদী যে একদিন মুছে যাবে এই দেওয়ালটা।

পুজো আসতে বাকি নেই আর। মনোময় একদিন ব্রেকফাস্ট টেবিলে ঘোষণা করেন সপরিবারে বেড়াতে যাবার কথা, দেশের কোথাও বা বিদেশে। শেষ কবে তাঁরা একসঙ্গে বেরিয়েছিলেন তা মনেই পড়ে না। খুব লোভনীয় প্রস্তাব হলেও ছেলেমেয়ের ব্যস্ত শিডিউলের জন্য প্রস্তাব খারিজ হয়। মনোময়ের মুখের অবস্থা দেখে মায়া হয় সুমনার।

পুজো এসে গেল। কলকাতায় সাজো সাজো রব অনেক আগে থেকেই। অফিস থেকে ফিরতে রাত হয়ে যায়।

মার্চের বার্ষিক সভায় ম্যানেজিং ডিরেক্টর হবার সুযোগ। প্রতিদ্বন্দ্বী আছেন অবশ্যই দু'একজন, কিন্তু ইদানীং আর আগের মতো উৎসাহ পান না। ডিউটিতে অনড় থাকলেও ক্লান্তি তাঁকে গ্রাস করেছে। সেদিনের পর থেকে উদ্দালকের সঙ্গে তাঁর আর যোগাযোগ নেই, সে ফোন নম্বরও দেয়নি। সেদিনের কথা খুব গভীরভাবে মনে করার চেষ্টা করেন মনোময়।

মাত্র দু'মাস আগে এসেছে ছেলেটি, এখনো কথায় মুর্শিদাবাদী টান। গায়ে মলিন পোশাক এমনকি পর্যাপ্ত খাবারের সংস্থান পর্যন্ত নেই। এরই মধ্যে খাস কলকাতার ছেলে মেয়ে অধ্যাপক, কর্মীদের প্রিয়পাত্র। সে শুধু রেজাল্টের জন্য নয়, তাহলে সবাই তাকে ডাকনামে ডাকত না, এমনকি চা-ওয়ালা অজিতদা পর্যন্ত। হাসলে কিশোরী ফুল্লরাকে মনে পড়ে যায়। কোনভাবেই ছেলেটিকে সাহায্য করা গেল না; আবার পরোক্ষভাবে তাঁকে দেখা করতেও বারণ করে দিয়েছে। তাঁর মনের মধ্যে এ বাসনাও জেগেছে যে ফুল্লরার সামনে গিয়ে হাত পেতে দাঁড়াবেন কিনা।

আজ বিজয়া দশমী, অফিস ছুটি, কোন কাজ নেই। বাড়িতে চুপচাপ বসে আছেন মনোময়। সামনের আলমারিতে প্রচুর বই। সুমনার বই পড়ার নেশা খুব, তাঁদের মেয়েটিও বোধহয় পড়ে। এই বইয়ের অনেকগুলি তিনি উপহার দিয়েছিলেন সুমনাকে। দুজনে কলেজ স্ট্রিটের অলিগলি ঘুরে বই কিনতেন। তাঁর নিজের অবশ্য পড়ার অভ্যাস ছিল না। অনেকদিন পর আজ হঠাৎ ইচ্ছে হ'ল বই নেড়েচেড়ে দেখবার। এমন সময় অচেনা একটি নম্বর থেকে একটি ফোন আসে। রিসিভ করে দেখেন চেনা কণ্ঠস্বর –

- কেমন আছেন?
- ভাল আছি, তুমি কেমন আছ?
- আমি বাড়িতে এসেছি, তাই খুব ভাল আছি।
- তুমি কি গঙ্গার ধারে?
- হ্যাঁ, কী করে বুঝলেন ?
- নদীর ধারে ঢাকের আওয়াজ অন্যরকম হয়। এখন তো বিসর্জন হচ্ছে, তাই না?
- ঠিক ধরেছেন। আমি দাঁড়িয়ে আছি আপনার প্রিয় সেই জায়গায়। তারপর একটু থেমে বলে, আমি আর আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করিনি, কেননা তার প্রয়োজন ছিল না। একটু বড় হবার পর মায়ের কাছে আপনার কথা শুনেছি, সব কথা। আমিই মায়ের একমাত্র বন্ধু কিনা।
- তোমার মা কেমন আছেন?
- খুব ভাল, কেননা আমি এখন এখানে আছি।
- আমার সঙ্গে তোমার দেখা হওয়ার কথা শুনে মা কী বললেন?
- আমি তো মাকে কিছু জানাইনি। আমার কৌতূহল ছিল আপনাকে দেখবার, তাই রাখালদাদুকে দিয়ে চিঠি লিখিয়েছিলাম। আমার কৌতূহলের প্রধান কারণ ছিল যে আমার মা তাঁর অতীতের প্রিয়জনের নামে কেন আমার নাম রেখেছেন। কেন তিরিশ বছর বয়সে জোর করে তাঁকে বিয়ে দেওয়া হয়। সেই প্রিয়জনের বিয়ে হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও কী কারণে মায়ের এই অপেক্ষা, যে মানুষের স্মৃতি নিয়ে তিনি বাকি জীবন কাটিয়ে দিতে চেয়েছিলেন! এইসব প্রশ্ন যেখানে, সেখানে সেই মানুষটিকে দেখতেই হয়।

হঠাৎ পৃথিবীটা কেমন ধূসর লাগে মনোময়ের।

উদ্দালক বলেই চলে, মায়ের সঙ্গে বাবার বয়সের বিস্তর ফারাক ছিল। বাবা ছিলেন অতি ভালমানুষ। মা কিছু না দেখেই মতামত দিয়েছিলেন। মায়ের আপত্তি করার কোন উপায় ছিল না। বাবা প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। পুরনো কথা মনে করে এখন মনে হয় তাঁদের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা থাকলেও, স্বামীর প্রতি মায়ের ভালবাসা কতটুকু ছিল কে জানে! স্বামী এবং সংসারের প্রতি মা অতি কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন। আমি বারো বছর বয়সে বাবাকে হারালাম এবং মায়ের খুব কাছে চলে আসলাম। মায়ের ছেলেবেলার গল্প করার সময় তাঁর মুখে ফুটে উঠত এক স্বর্গীয় আভা। কখনো লজ্জাশীলা চোদ্দ বছরের কিশোরীর মুখ; এসবই ঘটত, যখন তাঁর গল্পে আপনি থাকতেন। তখন থেকেই আমি আপনাকে ঘৃণা করতে শুরু করলাম। আরো রাগ হতো নিজের নামের জন্য। ছোটবেলা থেকেই পাড়ার মানুষ, স্কুলের স্যার, বন্ধু, রিক্সাওয়ালা, নৌকার মাঝি, এমনকি ভিক্ষা করতে আসা মানুষের কাছেও আমি অত্যন্ত প্রিয়। মায়ের কাছে অনেকবার শুনেছি আপনার নাকি সম্মোহনী শক্তি আছে। আর বায়োলজিক্যাল বাবা না হয়েও আমি নাকি আপনার এই গুণ

পেয়েছি বলে আমার নির্লজ্জ বোকা মায়ের বিশ্বাস | আসলে আমি এখন বুঝতে পারি আমার বাবার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে আমার মধ্যে | প্রেম কেমন অন্ধ হয় তা বুঝতে পারলাম | তা সত্ত্বেও আমার খুব কৌতূহল ছিল আপনাকে দেখার | কিন্তু আপনাকে দেখার পর আমি হতাশ হয়েছি | আপনি বড় কম্পানির একজন কেউকেটা হলেও আপনাকে একজন অতি সাধারণ, সাদামাটা মানুষ বলে মনে হয়েছে | আমায় যাঁরা ভালবাসেন তাঁদেরকে আমি শতগুণ ভালবাসা ফিরিয়ে দিতে পারি | আপনি পারেননি, পারেনও না।

৫

এরপর দু'মাস কেটে গেছে | মনোময়কে দেখে এখন প্রৌঢ় মনে হয় | সবসময় কেমন অগোছালো ভাব | উপরে ওঠার আকাঙ্ক্ষা মরে গেছে | কী লাভ? উপরে উঠলেই তো আরো বেশি একা; পাশে থাকবে না কোন পরিচিত প্রিয়জন | এখন তিনি সুমনা আর ছেলেমেয়েদের অনেক বেশি আঁকড়ে ধরতে চান | তাই এখন তাঁকে ছুটি নিয়ে মেয়ের নাচের প্রোগ্রামে যেতে দেখা যায়, বা ছেলের সাইকেলের মডেল পছন্দের ব্যাপারে মতামত দেন | মনোময়ের এই আচরণ সুমনার অস্বাভাবিক মনে হয় | তিনি এই কয়মাসে অনেক প্রশ্নের জবাব না পেলেও, এই প্রথম মনোময়ের আচরণ সুমনার ভাল লাগে |

ডিসেম্বরের শেষ | এই সময়ের মধ্যে অনেকবার ফুল্লরার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছে হয়েছে, কিন্তু এক দুর্মুখ বালকের মুখ মনে পড়ায় তিনি সাহস পাননি | তাঁর ভয় ওই চোখকে, যে চোখ তাঁর মনের গভীর পর্যন্ত পড়তে পারে | তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের ফোন নম্বর জোগাড় করে জেনেছেন ফার্স্ট সেমিস্টার পরীক্ষা আর প্র্যাকটিক্যাল শেষ | বারবার নক আউট হওয়া মানুষটি অবশেষে ফোন করেন উদ্দালককে |

- পরীক্ষা শেষ হয়েছে?
- হ্যাঁ |
- কেমন হ'ল?
- ভাল হয়েছে, আপনি ভাল আছেন?
- হ্যাঁ আছি | তারপর, তোমার ক্লাস শুরু হয়ে গেছে?
- এখনো হয়নি; তবে দু-একদিনের মধ্যে হবে | কালকে বাড়ি থেকে ঘুরে আসি |
- কখন যাচ্ছ?
- দুপুর বারোটা চল্লিশের লালগোলা প্যাসেঞ্জার |
- ও আচ্ছা, ভাল থেকো |

ফোনটা ছেড়ে তিনি কিছুক্ষণ বসেন | তারপর তাঁর অধঃস্তনকে ডেকে বলেন, তিন চার দিন ছুটি নিচ্ছি | এরমধ্যে কোন মিটিং থাকছে না, মুম্বাইয়ের হেড অফিসে সব জানিয়ে দিচ্ছি |

রাত্রে সুমনাকে বলেন আমি দু-এক দিনের জন্য বাইরে যাব | এ আর নতুন কথা কী! পরদিন দরকারি জিনিসপত্র গুছিয়ে রওনা দেবার সময় তাঁর ক্যাজুয়াল পোশাক দেখে অবাক হয়ে সুমনা জিজ্ঞেস করেন, কোথায় যাচ্ছ?

একটু ইতস্তত করে মনোময় বলেন, মুর্শিদাবাদ | মামারবাড়ি যাইনি বহুদিন | মামা মামীদের সঙ্গে দেখা করে আসি | আর ফেরার পথে রানাঘাটে নামব |

সুমনার মনে বহু প্রশ্নের উদয় হলেও মার্জিত বুদ্ধিমতী মহিলাটি শুধু বলেন, আগে বললে না? আমি সবার জন্য কিছু কিছু জিনিস কিনে দিতাম, তারপর হেসে বলেন ঠিক আছে ঘুরে এসো |

ড্রাইভার এত বছর কাজ করলেও স্যারকে কোনদিন শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসেনি, তাই সেও অবাক হয় |

বহুদিন পর সেই পুরনো স্টেশনে – অনেক কিছু পরিবর্তন হলেও অনেক কিছু এখনও অবিকৃত আছে | নতুন নয় নম্বর প্লাটফর্মে লালগোলা প্যাসেঞ্জার | এখনো ট্রেন ছাড়তে মিনিট কুড়ি দেরি | ট্রেনে গিজগিজে মানুষ দেখে দম বন্ধ হয়ে আসে | কিছুক্ষণ দাঁড়ান এবং ভাবেন এরমধ্যে পাঁচ ঘন্টা জার্নি অসম্ভব | একবার ভাবেন ফিরে যাবেন কিনা | তারপর উদ্দালককে ফোন করেন |

উদ্দালকের গলা শীতল, আবেগহীন | সে বলে, আপনি চার নম্বর কম্পার্টমেন্টের সামনে আসুন |

মনোময় চার নম্বর কম্পার্টমেন্টের সামনে এসে দাঁড়ান | উদ্দালক ভিড় ঠেলে নামে এবং মনোময়ের ব্যাগটি নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলে, আমার পিছন পিছন আসুন | মনোময় ভিড় ঠেলে ওঠেন এবং ভিতরে গিয়ে দেখেন জানলার ধারে দুপাশে একটি করে রুমাল পাতা | উপরে বাঙ্কের লোকদের সরিয়ে দিয়ে সে মনোময়ের ব্যাগটি রাখে | তারপর

রুমাল সরিয়ে বলে, আপনি এখানে বসুন। আর সে বসে উল্টোদিকে।

- জায়গা কে রেখেছিল?

- আমি রেখেছিলাম।

- কার জন্য?

উদ্দালক হাসে। এ হাসির অর্থ মনোময় জানেন। তিনি আর কিছু জিজ্ঞেস করেন না। ট্রেন ছেড়ে দেয়, এই ভিড়ে জানলার ধারে বসা মানুষগুলি ভাগ্যবান। ডিসেম্বরের শীতের বাতাসেও আরাম লাগে মনোময়ের। মনে মনে ভাবেন সামনে বসে থাকা ছেলেটি তাঁর কে? কেউই না। তবে কেন বুকের মধ্যে একটা চোরা নদীর অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়! দুজন প্রতিপক্ষ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে। মনোময় অভিজ্ঞ চোখে যুবকটির চোখের ভাষা বোঝার চেষ্টা করেন। ছেলেটির চোখ হাসে। এখন আর ওকে যুযুধান মনে হয় না মনোময়ের।

বেশ কিছুক্ষণ পর ব্যারাকপুর, নৈহাটি, চাকদা ছাড়িয়ে ট্রেন রানাঘাটে ঢোকে। তারপর ঝমঝম করে কালীনারায়ণপুর ব্রিজ পেরিয়ে যায়। ট্রেনের যাত্রীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হকারদের ভিড়। হঠাৎ উদ্দালক ঝালমুড়িওয়ালাকে দেখে দু ঠোঙা ঝালমুড়ি কিনে একটি ঠোঙা মনোময়ের দিকে বাড়িয়ে দেয়। মনোময় তাঁর ওয়ালেটের দিকে হাত বাড়াতে গিয়ে উদ্দালকের চোখে চোখ পড়ায় হাত সরিয়ে নেন। এরপর দুজনেই হেসে ফেলে। বহু বছর পর ঝালমুড়ির উপর থেকে নারকেলের টুকরোটা নিয়ে খেতে শুরু করেন মনোময়। উদ্দালক শিশুর মতো হেসে বলে, ওটা শেষে খেতে হয়, যদি ঝাল লাগে সেই কারণে। মনোময় বলেন, অসুবিধে নেই জল আছে সঙ্গে। উদ্দালক তবুও মুড়িওয়ালার কাছ থেকে আরো দু টুকরো নারকেল চেয়ে নেয়। বলে, মায়ের কাছে শুনেছি নারকেল আপনার খুব প্রিয় ছিল। তারপর তাঁর মুড়ির মধ্যে টুকরোদুটো গুঁজে দেয়। চোখ ঝাপসা হয় মনোময়ের; জীবনে বোধহয় এই প্রথম। মাল্টিন্যাশনাল কম্পানির সিনিয়র ডিরেক্টরটি সাগ্রহে ঝালমুড়ি চিবোতে থাকেন। দুপাশের ধানক্ষেত চিরে লালগোলা প্যাসেঞ্জার নদীয়া পেরিয়ে মুর্শিদাবাদের দিকে এগিয়ে যায়।

সহজ টানাপোড়েন

সুস্মিতা রায়চৌধুরী

ডক্টর কেভিন সব রিপোর্টগুলো জড়ো করে বললেন, "সারোগেসি করাতে পারেন কিন্তু এখনই করাবেন কিনা সেটা আপনাদের ওপর।"

কলেজের প্রথম দেখায় প্রেম এবং তারপর দুই পরিবারের সম্মতিতে, দশ বছর আগে, বিয়ে হয় অভিরূপ আর শ্রাবস্তীর। বন্ধুরা ঠাট্টা করে বলত, "একটু ট্র্যাজেডি না থাকলে প্রেমকাহিনী ঠিক জমে না বুঝলি।"

কিন্তু ওরা শুধু হেসেই উড়িয়ে দিত কথাটা। কলেজ জীবনের চার বছর অগুন্তি প্রেমের প্রস্তাব পেত ওরা দুজনেই। কিন্তু শ্রাবস্তীর একঢাল কালো চুলের বিন্যাস আর ভাষাময় চোখ শুধুমাত্র জড়িয়ে থাকত অভিরূপের সুঠাম শরীর। অভিরূপের বুকে মাথা রেখে কেটে যেত অগুন্তি পড়ন্ত বিকেল। শ্রাবস্তীর যেন কিছুতেই আশ মেটে না অভিরূপকে পেয়েও।

কলেজে শেষ বছর, যখন বন্ধুরা ভ্যালেন্টাইন্স ডে'র তোড়জোড় করতে ব্যস্ত, সবাই জিজ্ঞেস করে "কিরে কী দিবি এবার শ্রাবস্তীকে?"

অভিরূপ হেসে বলে, "ভাবছি বাঁধিয়ে রাখব ঘরে।"

পার্থ ইয়ার্কি মেরে বলে, "ভাই, বিয়ে করে নিবি নাকি? নেমন্তন্ন করিস কিন্তু।"

সেদিন কলেজ শেষে অভিরূপ শ্রাবস্তীকে বলে "ভ্যালেন্টাইন্স ডে'র দিন দুপুরে বাড়িতেই থাকব বুঝলি।" শ্রাবস্তীর এক এক সময় মনে হয় নিজের মা-বাবার থেকেও বোধহয় সে বেশী ভালবাসে অভিরূপকে। ঘরের ভেতর এক সপ্তাহ কাটিয়ে দিলেও সে হাঁপাবে না যদি অভিরূপ থাকে সাথে। ভ্যালেন্টাইন্স ডে'র দিন অভিরূপের মা-বাবা গিয়েছিলেন এক আত্মীয়ের বাড়ি। এর আগে কোনদিনও ওরা একা দুপুর কাটায়নি বাড়িতে। শ্রাবস্তী দেখে অভিরূপের ক্যানভাসে লাল, নীল আর সাদা রঙের আধিপত্য সেদিন। সারা ঘরে ছড়ানো তুলি আর স্কেচ পেন্সিল।

"নতুন কিছু আঁকবি অভি?" শ্রাবস্তীর প্রশ্নে একটা লাল গোলাপ

গুঁজে দেয় অভিরূপ তার চুলে। আলতো করে খুলে দেয় হাতখোঁপা। একঢাল লম্বা চুল পিঠ ঢাকতেই শাড়ির আঁচল লুটিয়ে পড়ে মেঝেতে। টিপটাও খুলে দেয় সে কপাল থেকে। শুধু গলায় থাকে অভিরূপের দেওয়া লকেটটা। শ্রাবস্তীর ঠোঁটদুটো কেঁপে উঠলেও সম্মতি থাকে সবটায়। অভিরূপ শ্রাবস্তীর সম্মতিতে রাশ ভাঙে আদরের। তুলির টানে ক্যানভাসে ফুটে ওঠে শ্রাবস্তীর শরীরী বিভঙ্গ। ভ্যালেন্টাইন্স ডে-তে অভিরূপের তুলির টানে রঙিন হয় শ্রাবস্তীর অন্তরাত্মা।

- "এই ছবিটা কোনওদিন বিক্রি করবি না তো অভি?"

অভিরূপ সোহাগে ভরিয়ে দেয় শ্রাবস্তীকে। চুপকথায় প্রতিশ্রুতি পায় আবদার।

একমাস পরে শ্রাবস্তী জানায় সে প্রেগন্যান্ট। আচম্বিতে পৃথিবী টালমাটাল হয়ে গেলেও অভিরূপের যত্নে, ভরসায় সামলে ওঠে শ্রাবস্তীর মন। অ্যাবোরশন ঠিকভাবে হয়ে যায় সবার অজান্তেই। ওদের সুখ-দুঃখের ওপর অধিকার শুধু ওদের ব্যক্তিগত।

কলেজ শেষ হওয়ার পর দুজনেই চাকরি পায় নামকরা বিদেশী কম্পানিতে। ওদের বিয়ের দিন বাসরে সবাই ইয়ার্কি মারে, "তোদের এক বছরেই বাচ্চা হয়ে যাবে দেখিস।" অভিরূপ তখন বিদেশ যাওয়ার তোড়জোড় করছে। চাকরি সূত্রে দুজনেই হবে লন্ডনবাসী। কলকাতা ছাড়ার কষ্টটা ক'মাস বেশ অবসাদে রেখেছিল দুজনকেই। আসলে কেউ না জানলেও ওরা জানত ওদের ভালবাসার সবথেকে বড় সাক্ষী কুমোরটুলির ওই ছেঁড়া ত্রিপল, হলুদ ট্যাক্সির দৈনন্দিন চলাফেরা, মাটির ভাঁড়, প্যারামাউন্টের সরবত, টানা রিক্সার টুংটাং, ট্রাম, ফেরিওয়ালার ডাক। আসলে সব ভালবাসারই একটা টান থাকে। কিন্তু যখন সেটাই দুর্বল হয়ে যায় তখন কিছুক্ষণের জন্য সময়টার রাশ টেনে ধরতে হয় নিজেদের। সামলে নিয়েছিল ওরাও। অভিরূপ-শ্রাবস্তী নিজেদের বাড়িতেই বানিয়ে নিয়েছিল একফালি কলকাতা। সদ্য বিবাহিত জীবনের আনকোরা আনন্দে তখন বাঁধনছাড়া উন্মাদনা। এত বছর ভালবেসেও এতটুকু একঘেয়েমি আসে না ওদের। রোজ নতুন লাগে পরস্পরকে কাছে পাওয়া। ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন ওরা বিভিন্ন দেশ। ঠিক তখনই আবার প্রেগন্যান্ট হয় শ্রাবস্তী। "এই মুহূর্তে কোনও তৃতীয় মানুষের জায়গা নেই আমাদের মধ্যে" – এটাই বলেছিল ওরা। প্রথমবার অ্যাবোরশনের সেই কষ্টটা এবার যেন অনেকটাই কম। জীবন তো পড়ে আছে। প্রিয়বন্ধুর সাথে ভালবাসার অলিন্দে সুখে ঘরকন্না করে দাম্পত্য-জীবন। লন্ডনের পাথুরে রাস্তায় হাত ধরে এগিয়ে যায় সময়। ওদের দরকার লাগে না কাউকে।

পুরনো বন্ধুরা আজকাল যেন একটু ঈর্ষা করে ওদের। কীসের হিংসা বোঝে না ওরা। ফোন করতেই সেদিন মিলি বলে, "ভালই আছিস বাইরে। এই শহরটার ক্ষয় হচ্ছে রোজ। ভালই হয়েছে, নাহলে পচন লাগত তোদের সংসারেও।"

কিন্তু দু'বছরে একবার ওরা যখন কলকাতায় যায়, তখন ওদের আগের মতনই ভাল লাগে শহরটাকে। বন্ধুদের সাথে আড্ডায় ওরা জানতে পারে, শৌভিকের চাকরি চলে যাওয়ার খবর। জানতে পারে কেমন নোংরা ব্যবসা চলে হাসপাতালের বেডে, রাজনৈতিক রঙে। ভাল রেজাল্ট করেও মিলির মেয়েটা একটা নামকরা স্কুলে ভর্তি হতে পারেনি, শুধুমাত্র অনুদান দিতে না পারায়।

কলকাতায় হৈহৈ করে কেটে যায় সময়। কিন্তু এখন যেন লন্ডনের টানটা বেশী। আসলে ওরা দুজন দুজনের পরিপূরক। দুই মা-বাবা মাঝেমধ্যে আসেন। তখন যেন ওরা আবার নতুন করে ফিরে পায় ওদের কলেজ জীবন। অফিস থেকে ফেরার পথে তখন বিগ বেনের সামনে দেখা করে ওরা দুজন। অভিরূপের আলতো চুমুতে সেই একইরকম উষ্ণতা এখনও। দুটো কালো কোট পুরনো প্রেম ঝালিয়ে নেয় প্রতীকী ঘড়িটার নীচে। হেঁটে পার হয় পাথুরে রাস্তা। বাড়িতে ঢোকার আগেও শেষ হয় না ওদের গল্প। আট বছর পরেও সেই কলেজের মতন বাড়ির অজান্তে প্রেম করার শিহরণ থাকে ওদের বিবাহিত জীবনে। বৃষ্টি নামে লন্ডনের রাস্তায়। বাষ্পে ভাসে বেডরুমের কাঁচ। মেঘবালিকা আজও নাম লিখে যায় ঘষা কাঁচে। আদরের তোরণে সাদা চাদরে ওম ছড়ায় নির্ভেজাল ভালবাসা। বছর পেরিয়ে যায় অনুরাগে-অনুভবে।

(২)

- "দশটা বছর কেটে গেল। এত বড় ভুলটা করলাম কী করে আমরা! এতটা স্বার্থপর হলাম, ভেবেই দেখলাম না কতটা ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে নিজেদের?" শ্রাবস্তীকে আঁকড়ে ধরে একই কথা বলে যায় অভিরূপ।

হিটারের আঁচেও যেন হিম-শীতল স্রোত বয়ে যাচ্ছে সারা ঘরটায়| ডক্টর কেভিনের কথার সাথেই শেষ হয়ে গেল ওদের ব্যক্তিগত স্বপ্নের ফানুসটা| গত দু'বছর ধরে সন্তান নেওয়ার সমস্ত চেষ্টা বৃথা হয়ে গেল ডক্টর কেভিনের কথায়| শারীরিক কোনও অসুস্থতা নেই দুজনেরই| শুধু তাই নয় দুজনেই বেশ ফিট এবং কর্মঠ| কিন্তু কোনভাবেই মা হতে পারে না শ্রাবস্তী| পর পর তিনবার মিসক্যারেজের পর ডক্টর বলেছিলেন আই ভি এফ করাতে| পর পর তিনবার - তাতেও কোনও কাজ হয় না| শুধু টাকার অঙ্কটা বাড়তে থাকে রোজ| আজকাল কেমন চুপ করে থাকে শ্রাবস্তী| বন্ধুবান্ধব, নাচগান, নাটক শেষ হলেই ঘরে দুটো মানুষের মাঝখানে একটা অদৃশ্য নিস্তব্ধতা| তৃতীয়বার গর্ভপাতের সময় শ্রাবস্তী তখন ছ'মাস অন্তঃসত্ত্বা| সেই ভয়াবহ রাতটার পর অভিরূপ আর আগের মতন করে পায় না ওর শ্রাবস্তীকে| সেদিন রাতে কান্নার আওয়াজে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল অভিরূপের| বাথরুমে গিয়ে গা শিউরে উঠেছিল ওর| সাদা মেঝের সবটাই তখন রক্তাক্ত আর শ্রাবস্তী বসেছিল হাতে একটা রক্তপিন্ড নিয়ে| গা গুলিয়ে উঠেছিল অভিরূপের কিন্তু সামলে নিয়েছিল নিজেকে সেদিন| কোনমতে শ্রাবস্তীকে পরিষ্কার করে নিয়ে গিয়েছিল হাসপাতালে| এতটুকু কাছছাড়া করতে চায় না সে শ্রাবস্তীকে তারপর থেকে|

- "চাই না কোনও সন্তান| আমি তোমাকে নিয়েই খুব ভাল আছি", শ্রাবস্তীকে বলেছিল অভিরূপ| কিন্তু এই প্রথমবার ওদের ঝগড়া হয়| এই প্রথমবার মনোমালিন্যের ভারটা সহজে নামতে চায় না মন থেকে| রোজ জমতে থাকে অভিমানের পাহাড়| ফোনে এখন বন্ধুদের সহানুভূতি| "হ্যাপি এন্ডিং" না হয়ে ট্রাজেডি হলে তখন সবাই শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে পড়ে| দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভালবাসা|

ছত্রিশের শ্রাবস্তীর "এগ কোয়ালিটি" খারাপ, তাই কোনভাবেই সুস্থ সন্তান হওয়া সম্ভব নয় ওদের| বয়সের সাথে সাথে এবং অগুন্তি গর্ভনিরোধক ওষুধ ব্যবহারের ফলে তার সন্তান ধারণ করা অসম্ভব|

- "কেন বাচ্চাটাকে মেরে ফেললাম আমরা? আমরা খুনী| আমরা খুন করেছি ওকে| তাই ও আর ফিরে আসে না" কেঁদে ওঠে মাতৃত্বের স্বাদ না পাওয়া শ্রাবস্তী|

"অভিরূপের হাসি আর শ্রাবস্তীর চোখ এই দেখেই চিনে নেব তোদের মেয়েকে", বন্ধুরা বলত ওদের| ওদের দুজনের ব্যক্তিগত পরিধিতে কেউ কোনদিনও ঢুকতে পারেনি| পরস্পরের ওপর একক অধিকার শুধু ওদের দুজনের| আজ অবধি কোনও কারণেই ভিন্নমত হয়নি দুজন|

- "আমি পারব না শ্রাবস্তী সারোগেসি মেনে নিতে| আমি চাই না সন্তান| কিন্তু অন্য কেউ আসবে না আমাদের পৃথিবীতে| প্লিজ শ্রাবস্তী আমি মেনে নিতে পারব না" অভিরূপ হাত জোড় করে বলে শ্রাবস্তীকে|

বিদেশে থাকার দরুণ দত্তক নেওয়ার অধিকার তাদের নেই| আইনত অপারগ ওরা| শ্রাবস্তীর অবসাদটা অসহনীয় হয়ে উঠছে রোজ| সব থেকেও যেন শূন্য সবটা| ক্যানভাসে তুলি ছোঁয়ায় অভিরূপ আবার নতুন করে শ্রাবস্তীকে ভালবাসায় সাজাবে বলে| সিঁদুর এঁকে দেয় কপালে| নিজের শরীরের উষ্ণতায় ভিজিয়ে দেয় শ্রাবস্তীর শরীর| ক্যানভাসে ফুটে ওঠে পূর্বরাগ|

- "কেমন লাগছে নিজেকে? আমায় সবটা ভালবাসা দেওয়া যায় না শ্রাবস্তী? আমায় তোমার কোলে মাথা রেখে শুতে দাও আবার প্লিজ" অভিরূপ শ্রাবস্তীর কপালে চুমু খায়|

- "চারদিকে রক্তপিন্ড আঁকো অভি| একটা ছুরি দিয়ে টেনে বার করে আনো আমার ছোট্ট মেয়েটাকে| কুপিয়ে খুন করি ওকে আমি| রক্ত আঁকো অভি!"

- "চুপ করো প্লিজ, কানে আঙুল দেয় অভিরূপ| রাজি হয়ে যায় সে "এগ ডোনার" নিতে| শুরু হয় প্রস্তুতি|

দু'মাস পর আবার প্রেগন্যান্ট শ্রাবস্তী| হাই রিস্ক প্রেগন্যান্সীতে শরীর বেশ খারাপ হলেও একটা অদ্ভুত ভাল লাগার আবেশ জড়িয়ে থাকে ওর মনে|

- "জানো অভি, আমি তোমায় আরও কাছে অনুভব করতে পারি আজকাল| মনে হয় শুধু আত্মিক নয়, এখন তোমাকে নিজের ভেতরও ধারণ করতে পারি আমি|" ক্লান্ত শ্রাবস্তীর চোখদুটো কথা বলে তার ভেতরে বাড়তে থাকা প্রাণের সাথে| অভিরূপ হাসে কিন্তু তবুও একটা অদ্ভুত অনুভূতি কাজ করে আজকাল| প্রথমে শ্রাবস্তীকে সে বলতে পারে না তার অস্বস্তির কথা| সে নিজেও কি জানে কষ্টটা আসলে কী? একটা প্রশ্ন কুরে কুরে খায় তাকে রোজ| অন্য কোনও মেয়ের সাথে

শ্রাবন্তী কীভাবে ভাগ করে নিল তাকে? অবিবেচক, অযৌক্তিক একটা প্রশ্ন তবুও কেমন হিংসা হয় আজকাল। কেটে গেছে আট মাস। অভিরূপ কাছে এলেই ছোট্ট প্রাণটা যেন ঠিক বুঝতে পারে তার উপস্থিতি। শ্রাবন্তী বলে, "দেখেছ, কেমন বাবার গন্ধ পায় তোমার মেয়ে?"

লন্ডনে এখন সবাই হঠাৎ আসা এই ভাইরাসের প্রকোপে ঘরবন্দি। শ্রাবন্তী বিরক্ত হলেও, অভিরূপ ভিডিও কলে ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে, "সারোগেটেড বেবি কি মায়ের সব বৈশিষ্ট্য পায়?"

উত্তরে ডাক্তার কেভিন বলেন, "দেখুন জেনেটিকালি না হলেও সাধারণত যিনি বাহক তাঁর অনেক কিছুই সন্তান পায়।"

ভিডিও কলের পর শ্রাবন্তী চিৎকার করে ওঠে। "ভালবাসতে পারো না ওকে তুমি? তোমারই তো সন্তান।"

অভিরূপ প্রথমবার রাশটা টানতে পারে না। চিৎকার করে বলে, "ভাল থাকতে না তুমি শুধু আমার সাথে? জানি আমি ভুল, তাও বলছি আমি শুধু তোমাকে চেয়েছিলাম। এইভাবে অন্য কারো সাহায্যে আমাদের ভালবাসাকে পরিপূর্ণ করতে চাইনি। আমার দমবন্ধ লাগে। আমি খারাপ। তাও আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না এটা। আমরা দুজনেই সময় নষ্ট করেছিলাম, কিন্তু তাই বলে তুমি আমায় দূরে সরিয়ে দেবে? ভাগ করে নেবে অন্য কারোর সাথে? আমি তোমার চোখ, তোমার হাসি চেয়েছিলাম আমাদের মেয়ের মধ্যে। এখানে তো তুমি নেই, এ তো অন্য কারোর।"

তীব্র ঘেন্নায়, রোষে, বিরোধিতায় কাঁপতে থাকে শ্রাবন্তী।

(৩)

ছোট্ট মিয়াকে হাতে নিয়ে পাথর হয়ে বসে থাকে অভিরূপ। ফোন আসছে একটার পর একটা। ঠোঁটদুটো একদম শ্রাবন্তীর মতন। চোখ বন্ধ করে কেমন গাল ফোলাচ্ছে ওদের মেয়ে মিয়া। শ্রাবন্তী অভিমানে এভাবেই গাল ফোলায়, তখন ওকে আদর না করলে রক্ষে নেই। অভিরূপ বুকের মধ্যে চেপে ধরে সদ্যজাত মিয়াকে। চোখ দিয়ে জলটুকু ফেলার অধিকারও তার আজ নেই। যে ভালবাসায় প্রতিশ্রুতি পেত সহজ প্রেমের গল্প, যে প্রেম কাহিনীতে এখনও জীবনটাকে সহজ করে দেখা যেত, তা সময়ের চক্রব্যূহে জতুগৃহ।

একটা সহজ প্রেমের গল্প লিখতে বসেছিল ওরা। হঠাৎ একটা ঝড়ে তছনছ হয়ে গেল সবটা। কারণটা নির্লিপ্ত।

- "আই অ্যাম ভেরি সরি অভিরূপ। প্রেসার এত নেমে গিয়েছিল, অক্সিজেন লেভেলও ওঠানো যাচ্ছিল না, ভেন্টিলেশন ছাড়া আর কোন উপায়ও ছিল না। ইন্টারনাল ব্লিডিং কিছুতেই আটকানো গেল না। মিয়াকে বাঁচাতে পারলেও শ্রাবন্তীকে পারলাম না কিছুতেই। মিয়াকে ক'দিন পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। দেখতে হবে যে ওর মধ্যে কোনও ভাইরাসের প্রকোপ আছে কিনা। আই অ্যাম ভেরি সরি ম্যান!" ডক্টর কেভিন অভিরূপের নুয়ে পড়া শরীরটা ধরে বলে গেলেন শেষ কথাটা।

কথা ছিল কোনদিনও একা না থাকার। হঠাৎ জ্বর আর শ্বাসকষ্টে শেষ হয়ে গেল সবটা। কিছু বুঝে ওঠার আগেই শ্রাবন্তী প্রতিশ্রুতি ভেঙে দিল।

সবাই বলত ওদের গল্পে ট্র্যাজেডি নেই। হাসপাতালের বেডে শ্রাবন্তীর গা ঘেঁষে শোয় অভিরূপ। চুল সরিয়ে দেয় কপাল থেকে। হাতদুটো চেপে ধরে শুধু বলে, "আমি পারব ভুল শোধরাতে। তোকে ফিরিয়ে আনবই আমার কাছে। আমাদের ভালবাসায় অহেতুক জটিলতা আনার শাস্তি দিয়েছিস তুই আমায়। কিন্তু তোর হুবহু প্রতিচ্ছবি মিয়া। ওর বড় হওয়ার প্রতেকটা মুহূর্তে তোকে আমি ফিরে পাবই। সময় এবার হারাতে পারবে না আমাদের। তখন তুই আমাকে ক্ষমা করে দিস প্লিজ।" বুকের ভেতরটা যেন কেউ দুমড়ে মুচড়ে দিচ্ছে! কিন্তু হাসপাতালের ঘরে কাঁচের জানলার পরিবেষ্টনে ঢাকা পড়ে যায় আর্তনাদ। বেঁচে থাকাটা দুর্বিষহ হয়ে উঠছে রোজ।

কেটে যায় একটা বছর। আজকাল মিয়াকে বুকে জড়িয়ে কষ্ট অনেকটা লাঘব হয়। এক বছর পর জীবনটাকে আর সহজ না লাগলেও সুন্দর লাগে অভিরূপের। পিতৃত্বের সম্পূর্ণতায় শুদ্ধ হয় ভালবাসার সংজ্ঞা। মিয়াকে নিয়ে অভিরূপের লড়াই সময়ের সাথে। বুকের জ্বালাটা ঠান্ডা করে মিয়ার প্রথম সবকিছু।

সবাই বলে মিয়া হুবহু শ্রাবন্তীর মতন দেখতে। অভিরূপের গায়ের রং ছাড়া আর কিছুই পায়নি সে। ক্যানভাসে মিয়ার ছোটবেলার সাথে রংতুলিতে মিশে যায় শ্রাবন্তীর উপস্থিতি। সময়ের জটিলতায় মানুষ দূরে যেতে পারে, সম্পর্কের গভীরতা কখনই দূর হয় না।

মেরি খ্রীস্টমাস

অমিত দে

আমার বান্ধবীদের মধ্যে আমি সবচেয়ে ভালবাসি লোপাকে। শ্যামলা রং, বড় বড় চোখ, লম্বা কোঁকড়া চুল, সারাক্ষণ হাসিখুশি; কম কথা বলে।

হাতের কাজটা সেরে আমি সোফায় এসে বসলাম। অনেকদিন লোপার সাথে কথা হয় না ভেবে ওকে কল করলাম। আমার বান্ধবীদের মধ্যে লোপা আর মুক্তিকারই কেবল সম্বন্ধ করে বিয়ে হয়েছিল। লোপার বিয়ের পঁচিশ বছর পার হয়ে গেছে। একথা ওকথা বলার পর ওকে বললাম, "লোপা, তোদের তিন নম্বর বিবাহ বার্ষিকীতে তোরা শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলি। ওখানে যেন কী একটা ঘটনা ঘটেছিল? মনে আছে?"

ও তো শুনেই হাসতে আরম্ভ করল। ঘটনাটা নিয়ে আলোচনা করার পর আমাদের দুজনেরই হাসি আর থামতেই চায় না। এবার বলি সেই মজার ঘটনার কথা।

লোপা বলেছিল –

"সেবার পঁচিশে ডিসেম্বরে শীতটা বেশ জাঁকিয়ে পড়েছিল। সঠিক সালটা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। আমাদের বিয়ের তারিখ জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে – তাই আমরা একসঙ্গে বড়দিন ও বিবাহ বার্ষিকী উদযাপন করার ইচ্ছায় শান্তিনিকেতনে বেড়াতে গেলাম। আরিয়ানকে মায়ের হেপাজতে রেখে প্রিয় মানুষটির উষ্ণ পরশ পাবার আশায় কেন মরতে কবিগুরুর আশ্রম বেছে নিয়েছিলাম জানি না।

ট্রেনে ওঠার আগে আমার কর্তামশাই বড়দিনের স্পেশাল কেক ও পেস্ট্রি নাহামস্ থেকে কিনে নিয়ে এসেছিলেন, শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে ঘুরে বেড়াবার সময় খাব বলে। ওমা, বোলপুর স্টেশনে এক কান্ড ঘটে গেল! ট্রেন থেকে নেমে একটু এগোতে না এগোতেই হঠাৎ আমার হাত থেকে ঝোলাটা ধাঁ করে শূন্যে উধাও হয়ে গেল। সম্বিৎ ফিরতে সংকোচের সঙ্গে দেখি বেশ কিছু লোক মজা করে হাততালি দিচ্ছে আর হাসছে; কারণ ওই কেক আর পেস্ট্রি আমাদের দুজন পূর্বপুরুষ মহা আনন্দে উঁচু পাঁচিলের ওপর বসে খেয়ে চলেছে। ঠ্যাং দুলিয়ে, দাঁত বার করে দুটো কালোমুখো হনুমান বড়দিন সেলিব্রেট করছে। আমার কর্তাটির গেল মুড অফ্ হয়ে। আমার দিকে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকালেন, কারণ আমার হাত থেকেই ঝোলাটি হনুমানদের হাতে গেছে। প্রথমত ওঁর প্রিয় কেক এখন হাতছাড়া, আর তার ওপর এতগুলো টাকাও গচ্চা গেল। দুঃখে আমার চোখেও জল আসার উপক্রম।

শান্তিনিকেতনে ঘুরে বেড়াবার সময় দেখলাম তিনি যথেষ্ট দূরত্ব রেখে পরপুরুষের মতো ব্যবহার করলেন। বড়দিন ছুটির দিন, তাই স্বভাবতই প্রচুর লোকজনের সমাগম হয়েছে। যখন রবিঠাকুরের প্রিয় মৃত্তিকা ভবন 'শ্যামলী'-র সামনে দাঁড়িয়ে আছি, কবিগুরুর লেখা কত গান, কবিতা আমার মনে আসছিল। কত ঘটনা, কত স্মৃতিই না আছে এখানে! এইসব ভাবনার মধ্যে হঠাৎ আমার কর্তাটি ঠেলা মেরে বললেন, "তাড়াতাড়ি চলো, হোটেলে এবার আর ভাত পাওয়া যাবে না; দুনিয়ার সব লোক দেখি বড়দিনে এখানেই এসে ভিড় করেছে!"

ভাবা যায়? এই রসকষহীন গোমস্তা সাহেবের (অ্যাকাউন্ট্যান্ট) কী হবে গো! তার কাছে রবীন্দ্রনাথের আবেগ, অনুভূতি বা নজরুলের প্রেরণা সবটাই বস্তাপচা বুলি ছাড়া কিছুই নয়। জীবনটা কেবলই খাদ্যময়! টাকাকড়ির হিসেবের গরমিলকে মিল করাতে করাতেই জীবন কাটবে বেচারির!

ফেরার সময় তাড়াতাড়ি বোলপুর স্টেশনে পৌঁছে গেলাম। ট্রেন আসতে অনেক দেরী। আমার কর্তা জুতো খুলে প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চে বেশ মৌজ করে বসলেন। আমিও আমার একটা প্রিয় গল্পের বই হাতে নিয়ে বসলাম। কিছুক্ষণ পরে তাকিয়ে দেখি আমার পার্শ্ববর্তী প্রিয়জনটি এই অপরিচিত পরিবেশে কী সুন্দর নাক ডাকাচ্ছে! কে বলবে মাত্র তিন বছর আগে আমাদের বিয়ে হয়েছে!

হাওড়াগামী ট্রেনে উঠে আর বিশেষ কোনও কথা হয়নি। আমার বেশ রাগই হয়েছিল। উনি নানাভাবে কথা বলার অছিলা খুঁজছিলেন – কখনো বর্ধমানে সীতাভোগ, মিহিদানা কিনে, কখনো শক্তিগড়ে ল্যাংচা কিনে আমার মনোরঞ্জনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন ঠিকই, কিন্তু ধোপে টেকেনি। আমি গোমড়া মুখে জানলার বাইরে অন্ধকার প্রকৃতির মাঝে আলো

খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা চালালাম। 'মনখারাপ' শব্দটা বড়ই নেতিবাচক শক্তি বয়ে আনে। তাই নিজের মনকে সংযত করে বাস্তবকে মেনে নিলাম।

বাড়ি ফেরার রাস্তায় হঠাৎ দেখি উনি রিকশা থামিয়ে একগুচ্ছ টকটকে লাল গোলাপ কিনলেন। বাড়ির কাছে পৌঁছে আমি এগোতে যাবার আগেই টের পেলাম উনি আমার কাঁধে হাত রাখলেন। সেই চেনা উষ্ণ পরশে মনটা একটু বিচলিত হ'ল অবশ্যই। ততক্ষণে রিকশাওয়ালা টিং-টিং ঘন্টি বাজিয়ে রওয়ানা হয়ে গেছে।

আমি অবাক হয়ে পেছনে তাকাতেই তিনি লজ্জারুণ হাসির আভা ছড়িয়ে আমার হাতে গোলাপ গুচ্ছটি দিয়ে আবেগঘন কণ্ঠে বলে উঠলেন, "শুভ বড়দিন"। আমি মাথার ওপর আকাশের দিকে তাকালাম। কেউ যেন ঝকঝকে মুখে আমাকে জিজ্ঞেস করছে, "কী গো মেয়ে, বড়দিন কেমন কাটল?"

আমি আমার স্বামীর দিকে এবার পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম। দেখি ও আমারই দিকে তাকিয়ে আছে। হাউ রোম্যান্টিক! মনের মালিন্য কেটে গিয়ে আমার হৃদয়ে তখন শরতের মেঘমুক্ত আকাশের স্বচ্ছতা। মুখে প্রশান্তির হাসি ছড়িয়ে বললাম – "মেরি খ্রীস্টমাস!"...

হলুদ গোলাপ

পৌষালী ঘোষ

খাটের উপর বসে রুক্মিণী। মোবাইলটা হাতে নিয়ে ঘড়ি দেখল, রাত দেড়টা। আর চোখে সত্যিই তাকাতে পারছে না। ওই ভারী বেনারসী ছেড়ে এখন আবার এই ফুলের সাজ। গলায় হাতে ও কিছুই পরতে অভ্যস্ত নয়। কিন্তু কে শুনছে সেসব? বনেদী বাড়ি, পুরনো দিনের আদবকায়দা – অনেক কিছুই আছে। দুই কাকীশাশুড়ি, তিন ননদ, বড় জা দুজন, পিসিশাশুড়ি তিনজন, শাশুড়ি মা ও তাঁর বোন, রাঙা ও ফুলমামী... সব মিলিয়ে ফুলশয্যার আগে এতজনকে প্রণাম করার ঠেলায় ওর কোমরে আর কিছু নেই। তাও তো কিছুজনের বাড়ি কাছে বলে তাঁরা রাত্রে আর থাকেননি। নয়তো এই ক'দিনে বরকে কতবার চোখে দেখেছে সন্দেহ।

বাড়ির একমাত্র আদুরে মেয়ে রুক্মিণী সান্যাল। স্কুলে বরাবর ফার্স্ট বই সেকেন্ড হয়নি। কলেজেও সে টপ করেছে। ইউনিভার্সিটির ফ্রেশার্সের দিনেই রণ-এর সাথে আলাপ। রণজয় দেব। কেমিস্ট্রি আর ফিজিক্স অনার্সের মেলবন্ধন। কমন ক্লাস কিছুই নেই। ক্যান্টিনের মধ্যেই একটু আধটু চোখের দেখা। কিন্তু কখন যে ভাল লেগে গেল। কলেজ স্ট্রিটে বই কেনা থেকে নন্দন চত্বর, ওরা ভার্সিটির হট কাপল। পড়াতেও একটু যেন ঢিলেই পড়ল। ফলে ইউনিভার্সিটিতে আর টপ করা হ'ল না রুক্মিণীর।

কেমিস্ট্রিতে মাস্টার্স করেই রণ গেল বিদেশে, রিসার্চ স্কলার হয়ে। তিন মাস পর থেকেই আর ফোন নেই। যোগাযোগ নেই। একে একে সব সোশ্যাল মিডিয়ায়ও ব্লকলিস্টে। কারণ কী? না সময় নেই। অথচ এই রুক্মিণীই ওর জন্যে কত পড়া নষ্ট করেছে। কত কীই করেছে।

হাসিখুশী জোভিয়াল মেয়েটা চুপ করে গেল। প্রাইভেট একটা নার্সিংহোমে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে রয়েছে। মাইনে খারাপ না হলেও ওর আরও ভাল কিছুই করার কথা।

বাবার কথা ফেলতে পারেনি রুক্মিণী। অসুস্থ ঠাম্মা, নাতনির বিয়েটা দেখে যেতে চান। তাই এইভাবে সম্পূর্ণ অচেনা একজন মানুষকে তিন মাসের দেখায় সে বিয়ে করল।

ছেলেটা খারাপ নয়। কিন্তু নতুন করে আর কাউকে চিনতে ইচ্ছে করে না ওর।

অর্কজ্যোতি সিংহ রায়। মাল্টিন্যাশনাল কম্পানীতে কর্মরত। দেখতে শুনতেও ভালই। পাঁচফুট ন'ইঞ্চি হাইট। টল, ডার্ক অ্যান্ড হ্যান্ডসাম। কথা খুব গুছিয়ে বলে আর ভীষণ ভাল বাস্কেট বল খেলে। চেহারার মধ্যেই একটা অ্যাথলেটিক ভাব। কিন্তু তাই বলে জয়েন্ট ফ্যামিলি? কী করে মানাবে ও?

ভাবতে ভাবতেই অর্ক এসে ঘরে ঢুকল। দরজা বন্ধ করে আলমারির সামনে গিয়ে কী যেন নিল। একি, আংটি-টাংটি দেবে নাকি? কিন্তু ও তো কিছুই কেনেনি। এসবে আর ওর মন নেই। ফুল দিয়ে সাজানো খাটে বসে পড়ল অর্ক। আগের মতো সাজানোর ধরন নয়। মাঝে গোলাপের পাপড়ি, আর চাদর দিয়ে হাঁস করা; খাটের একদিকে গোলাপি কাপড়। চারদিকে ফুলের স্টিক্স। বাক্সে করে কী যেন এনেছে অর্ক – বুঝল রুক্মিণী।

- "মাটনটা কেমন খেলে?"

এই প্রশ্নের জন্য এক্কেবারে তৈরী ছিল না রুক্মিণী।

- "হ্যাঁ, ভাল। কিন্তু আমার চিকেন বেশী পছন্দ। এত অয়েলি খাবার আমি অ্যাভয়েড করি।"

- "ও! আমার আবার রোববার মাটন চাইই চাই।"

একটা স্মিত হাসি হাসল রুক্মিণী।

- "এই নাও তোমার গিফ্ট!"

- "ক্যামেরা?"

- "হুম্, ডি এস এল আর, একদম লেটেস্টটা।"

- "কিন্তু..."

- "তোমার ফেসবুকে অ্যাড করোনি ঠিকই, প্রোফাইলও লক্। কিন্তু বাড়ির দেওয়ালে কত বাঁধানো ছবি। ওটা দেখেই বুঝেছিলাম।"

- "কিন্তু আমি তো কিছু নিইনি তোমার জন্য।"

- "তাতে কী? তোমার ফেসবুকে ম্যারেড উইথ আপডেট করবে – ওতেই আমি হ্যাপি। নাও শুয়ে পড়ো। মাঝে বালিশটা রাখলাম, বিশ্বাস করতে পারো।"

নিশ্চিন্ত হ'ল রুক্মিণী। তাই প্রতিবাদ না করেই শুয়ে পড়ল। কী ভাবল ওকে অর্ক? মনটা একটু খচখচ করছিল ঠিকই। কিন্তু ও তো এখনো রণকেই ভালবাসে...

একটু তাড়াতাড়িই উঠল আজ রুক্মিণী। স্নান সেরে শাড়ি পরে নীচে নামল। ঠাম বলেছেন, কদিন শাড়ি পরতে। এ বাড়িতে দাদু রয়েছেন, ঠাম্মি গত হয়েছেন আজ দশ বছর। কিন্তু ঠাম্মির অভাব কেউ বুঝতেই দেয় না ওঁকে। এমন ঝলমলে একটা পরিবারে এসেও কিছুতেই খুশী হতে পারছে না রুক্মিণী।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে না নামতেই কাকীমা ডাকলেন,

- "ওমা রুকু, আয়। আজ এত সকাল সকাল উঠলি কেন?"

এই নামেই এ বাড়িতে এখন ওকে ডাকছে সবাই।

- "আসলে কাম্মা, নতুন জায়গা তো। ঠিক ঘুম আসছিল না।"

- "আয় বোস, চা খাবি আয়!"

- "তোমরা খাও, আমি একটু বাগান থেকে ঘুরে আসছি।"

কোনোরকমে ওই ভিড় থেকে সরে এল ও। সবাই অচেনা। ওর কাছের মানুষরা, যারা ওকে সবচেয়ে বুঝত, তারা কেউ নেই। বাগানে দু'একপা হাঁটতে না হাঁটতেই চোখে পড়ল এক হলুদ গোলাপ গাছ। রণকে প্রথম এই রঙেরই ফুল দিয়েছিল সে। আজ যেন তার কোনো অস্তিত্বই নেই। একদৃষ্টে গোলাপের দিকে যখন সে চেয়ে দেখছিল, কাঁধে আচমকা কে যেন হাত রাখল। চমকে উঠল সে। অর্কর মা। হাতের গ্রীন টির কাপটা ওর দিকে এগিয়ে দিলেন।

- "তুই গ্রীন টি খাস না? তোর বাবাকে দিয়ে আনিয়েছিলাম তুইএ বাড়িতে আসার আগেই। দেখ, কেমন হ'ল? এসব তো আগে বানাইনি। আর শোন, তোর খাটের উপর দুটো কুর্তি আর লেগিংস রেখে এসেছি। জলে কেচে, শুকিয়ে একটু নরম করা আছে, ওটাই পরিস। শাড়ি পরতে হবে না। জানি, তুই ছোট প্যান্টগুলো পরিস। কিন্তু বুঝিসই তো মা। একসাথে থাকা। বাড়ি থেকে বেরোলে যা ইচ্ছে পরিস। বাড়িতেই যা একটু কষ্ট হবে তোর। একটু মানিয়ে নিস মা।"

- "মা...!"

অজান্তেই ডাকটা বেরিয়ে এল ওর। চোখের কোণে যেন এক বিন্দু জল!

- "পাগলী মেয়ে", চিবুক ছুঁয়ে চুমু খেয়ে বললেন তপতীদেবী।

- "চা'টা খেয়ে নে, জুড়িয়ে জল হয়ে গেল। আজ অফিস নেই তো? তোদের বাবা গলদা চিংড়ি এনেছে। তোর মাকে ফোন করেছিলাম। বললেন মালাইকারি তোর প্রিয়। আমি যাই রান্না

করি।”

চারদিকটা কেমন উজ্জ্বল হয়ে গেল। পছন্দের মানুষকে পায়নি ঠিকই। তবে ভাল মানুষদের পেয়েছে ও। একটা হলুদ গোলাপ ছিঁড়ল গাছ থেকে। এটাই আজ অর্ককে দেবে ও।

ভক্ত কুকুর ও বুনো শিয়াল

রঙ্গনাথ

এক কুকুর আমাদের বাড়িতে আর এক শিয়াল আমাদের বাড়ির সামনা-সামনি একটি বড় জঙ্গলে বাস করত। শিয়ালটি প্রতিদিন না হলেও মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে ঘুরে যেত। তার ঘুরে যাওয়ার প্রমাণ পেতাম যখন আমাদের দু-একটা হাঁস বা ছাগলছানা কমে যেতে দেখতাম। শিয়ালটি এত চতুর ছিল যে একে চাক্ষুষ দেখা প্রায় অসম্ভব ছিল। একদল শিয়াল যে জঙ্গলে থাকে তা জানতাম প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা ও মাঝে মাঝে মধ্যরাতে তাদের হুক্কা-হুয়া শুনে।

আমার যে কুকুরটি ছিল তাকে বাড়িতে আনার পর তার একটা নাম দিতে চেয়েছিলাম। যুক্তরাষ্ট্রে যেমন কুকুরের নাম যে যা চায় তাই দিতে পারে, আমাদের দেশে তা দেওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। আমার কুকুরের নাম কারো নামে হলে তার কাছে সেটা জঘন্য অপমানজনক এবং অমার্জনীয়। কে চায় কুকুরের সাথে নিজেকে তুলনা করতে? নানা চিন্তা-ভাবনা করে আমার কুকুরটির নাম ‘সুন্দরী’ রাখি। যদিও পরে জানতে পারি, আমাদের পাশের গ্রামের এক মহিলার নাম সুন্দরী ছিল। কেউ এ নিয়ে তাকে কিছু না বলায় রক্ষা পেয়েছি। একমাত্র আমিই সুন্দরীকে তার নামে ডাকতাম; প্রায় সময় তা চুপিচুপি।

শিয়াল বাড়িতে এলে সুন্দরী টের পেত। সুন্দরীর শিয়াল তাড়ানো বলতে খুব জোরে ঘেউ ঘেউ করা মাত্র, যা শুনে শিয়ালটির পালানো ছাড়া উপায় ছিল না। আমার দিদিমা বলত কুকুর যাতে শিয়ালের বদকাজে বাধা না দিতে পারে সেই কারণে কুকুরের বাচ্চাদের শিয়াল মেরে ফেলতে চায়। সুন্দরীর চারটি বাচ্চা হওয়ার পর বুঝতে পারি কুকুর আর শিয়ালের মধ্যে কীরকম শত্রুতা থাকতে পারে।

সেদিন রাত্রে সুন্দরীর উত্তেজনা ও ঘেউ ঘেউ শব্দ শুনছিলাম। বুঝতে পেরেছিলাম সে শিয়াল তাড়াচ্ছে। তারপর বাচ্চার কাঁউ মাঁউ শব্দ শুনে নিশ্চিত ছিলাম যে সুন্দরী তার বাচ্চা হারালো। ঐ রাত্রে দুবার এ ঘটনা ঘটে। এজন্য সুন্দরীকে চারটি বাচ্চা থেকে দুটি বাচ্চাকে হারাতে হয়। অপরিচিত মানুষ এলে একটা বা দুটো ঘেউ করে সুন্দরী চুপ করে থাকত। ও

কখনো মানুষদের নিয়ে মাথা ঘামাত না | ঘেউ করে সে তাদের হয়তো স্বাগতম জানাত আর আমাদের সজাগ করে দিত|

শিয়ালের আক্রমণ থেকে সুন্দরীর বাচ্চাদের রক্ষা করার ব্যাপারে সহজ কোন উপায় নেই ভেবে আমি তার বাচ্চাদের জন্য একটি ছোট খোপর বানিয়েছিলাম| একটা বাঁশ কেটে চারটি খুঁটি আর বেড়া দিয়ে খোপরটি বানাই | আমার ধারণায় শিয়ালের সাধ্য ছিল না সহজে খোপরের বেড়া ভেঙ্গে বাচ্চাদুটোকে নিয়ে যায়| সন্ধ্যা হলে আমি বাচ্চাদুটোকে নতুন খোপরে রেখে দিতাম| খুব সকালে ওদের বের করে দিতাম| সুন্দরী ওদের কাছাকাছি থাকত| এজন্য অনেকে অনেক কথা বলেছিল | আমার নাকি অন্য কোন কাজ ছিল না বলে কুকুর বাচ্চাদের তদারকি করি| তবে দুটো সুন্দর বাচ্চাকে রক্ষা করা আমার কাছে জরুরী কাজ বলে মনে হয়েছিল|

কুকুর একটু যত্ন পেলে খুব খুশী হয়, এ কথা আমরা সবাই জানি| পক্ষান্তরে, তার মনিব তাকে আদর-যত্ন না করে থাকতে পারে না| আমারও তাই হয়েছিল| আমি স্কুল থেকে ফেরার সময় মনে হতো সুন্দরী আমার অপেক্ষায় বসে থাকে| এ ভক্ত কুকুরটি আমাকে দেখলে লেজ নাড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাত | আমার গা ঘেঁষে ঘুরত | আমিও তার মাথা ছুঁয়ে দিতাম| খাবার সময় আমার খাবারের অর্ধেক তার প্রাপ্য ছিল| ঐ সময় যেহেতু আমাদের খাদ্যে সচ্ছলতা ছিল না, সেজন্য তাকে পৃথকভাবে খাবার দিতে পারতাম না| আমি সাধারণত দেরিতে একা একা খেতাম | খাওয়া শেষে যা বাকি থাকত, তাকে খেতে দিতাম| আমার খাবার আমি খাই বা না খাই এ নিয়ে কাউকে কিছু বলতে দিতাম না| যদিও আমি কী করি, তা আমার মা জানত | এজন্য হয়তো মা আমাকে ভাত একটু বেশী করেই দিত|

আমার কাছে শিয়াল ছিল একটা অদ্ভুত প্রাণী | মানুষের কাছাকাছি থাকে, কিন্তু এদের বাসস্থান কোথায় তা জানা যায় না| এদের আচরণ ও চিন্তা-ভাবনা অন্য রকম| শুধু অন্যের ক্ষতি করাটাই আমার চোখে পড়েছে| এরা কক্ষনো মানুষের কোন উপকারে এসেছে বলে প্রমাণ যদি থাকে তাহলে তা জানতে ইচ্ছা হয়| শিয়ালরা একসাথে থাকলেও আমার মনে হয়েছিল তারা কে কোন বাড়িতে যাবে তা ঠিক করে নিত| এতে যদি বিপদ আসে, তাহলে একটি শিয়ালকে শুধু ভুগতে হতো|

ইচ্ছা করলে ফাঁদ পেতে বুনো শিয়ালটিকে নাস্তানাবুদ করতে পারতাম| তা আমরা করতে চাইনি| মাঝে মাঝে সে যা ক্ষতি করেছে তা মেনে নিয়েছি| ভেবেছি, সে সারাদিন জঙ্গলে থাকার একঘেয়েমি দূর করতে আমাদের বাড়িতে ঘুরতে আসত| আরও একটা দিক বিবেচনা করেছি, ওকে যদি আমরা মেরে ফেলতাম তাহলে রাত্রিবেলা সুন্দরীর বাড়ি পাহারা দেওয়ার কোন কারণ থাকত না| দিনেরবেলা তাকে উঠানের কাঁঠাল গাছের নীচে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে দেখতেও পেতাম না|

আমার কাছে শিয়াল ও কুকুরের সহাবস্থান ভালই মনে হতো| এরা একে অপরের উপর নজর রাখে| প্রয়োজনে নিজেদের বুদ্ধি প্রয়োগ করে অপরের উপর টেক্কা দিতে চায়| এরা শত্রু বটে, কিন্তু তাদের শত্রুতা তেমন মারাত্মক নয়|

জয় পরাজয়

জয়া ঘোষ

সেদিন ফেসবুকে সম্ভাব্য বন্ধু তালিকায় গোলগাল চেহারার সেই মেয়েটির প্রোফাইল পিকচার দেখেই চিনতে পেরেছিল জিয়ানা। কিছুদিন হ'ল মেয়েটি চুপিচুপি আসা-যাওয়া করছে। ছবি আর নামের সঙ্গে মিলিয়ে নিতেই মনে পড়ে গেল এই সেই পপি গাঙ্গুলী, যে একদিন তমালকে বিয়ে করার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিল। তমাল তখন এঞ্জিনিয়ারিং-এর মেধাবী ছাত্র আর জিয়ানা উচ্চ মাধ্যমিকে ফার্স্ট ডিভিশন পেয়ে সবে কলেজে ভর্তি হয়েছে।

তমাল ও জিয়ানার একে অপরের সাথে দেখা হওয়া এবং প্রথম দেখাতেই প্রেমে পড়াটা যেন ঈশ্বরের আগে থেকেই তৈরী এক পরিকল্পনা। তা নাহলে সেবার হঠাৎ করে জিয়ার খুড়তুতো ভাইয়ের ক্লাবের অনুষ্ঠানে নাচের আমন্ত্রণটা আসত না। জিয়া ছোটবেলা থেকেই নাচ-পাগল ছিল। তাই বড়সড় পরীক্ষাগুলো সামলে সে নানা ধরনের নাচের অনুষ্ঠান করত। জিয়া ছিল বেশ চোখে পড়ার মতো মেয়ে। জিয়ার উপস্থিতির মধ্যে অদ্ভুত একটা উষ্ণতা অনুভব করত সকলে। ওকে প্রেমিকা বা পুত্রবধূ হিসেবে পাবার জন্য তখন বেশ একটা উন্মাদনা ছিল চারিদিকে। সেটা জিয়া মনে মনে উপভোগ করলেও তার ব্যক্তিত্বে একটা মিষ্টি আভিজাত্যে ভরা 'সহজে ধরা দিই না' ধরনের ছবি তৈরী করে রেখেছিল সে।

জিয়ার মনে আছে তমালের সাথে প্রথম দেখা হওয়ার দিনটা। অনুষ্ঠানের আগে তমাল এসেছিল ওকে গাড়ি করে অডিটোরিয়ামে পৌঁছে দিতে। গাড়ির আয়নায় নানা ছুতোয় তমাল ওকেই বার বার দেখছিল। নানা অছিলায় সেদিন ওদের অনেকবার মুখোমুখি হতে হয়েছে। দুজনে দুজনের প্রতি অদ্ভুত একটা আকর্ষণও অনুভব করেছিল। সেইদিন প্রথম দেখাতেই প্রেম। সেদিন মুখে কিছু না বললেও, মাস ছয়েক পরে জিয়ার ভাইয়ের সাথে তমালের হঠাৎ ওদের বাড়িতে চলে আসাটা জিয়া কোনভাবেই আন্দাজ করতে পারেনি। তমালের হৃদয় জুড়ে তখন শুধুই জিয়া। তমাল হস্টেলে ফেরৎ চলে গেলেও ওদের একে অপরের প্রতি আকর্ষণ যেন দিনে দিনে গাঢ় হচ্ছিল। ফাইনাল থিসিস সাবমিট করেই হঠাৎ একদিন জিয়াকে ফোন করে জোর তলব তমালের –

- আজ একবার দেখা করতে পারবে? খুব জরুরি দরকার ছিল।
- কী ব্যাপার, হঠাৎ এই জরুরি তলব? জিয়ার মনের ভেতরে একটা উত্তেজনা শুরু হয়ে যায় যখনই তমাল এই ধরনের রহস্যময় ব্যবহার করে।
- এখন বলব না, ওটা সারপ্রাইজ থাকল। চলে এসো আমাদের জায়াগায়, আজ ঠিক তিনটের সময়। বলেই তমাল ফোনটা কেটে দিল।

শনিবার দুটো পনেরোয় জিয়ার হিস্ট্রি ক্লাস থাকে। তিনটে পাঁচে ক্লাস শেষ হতেই কোনরকমে ছুটে গেটের কাছে এসে দাঁড়ায় জিয়া। হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসতেই চোখে পড়ে তমালের গাড়িটা একটু দূরে রাস্তার উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের প্রেমকাহিনী কলেজের বন্ধুদের জানতে বাকি নেই। তাই আর কারো দিকে না তাকিয়ে জিয়া সোজা দরজা খুলে উঠে বসে গাড়িতে।

- খুব খিদে পেয়েছে, চলো 'স্টেপ আপ'-এ যাই। স্টিয়ারিংয়ে হাত রেখে তমাল বলল।

জিয়ার পেটে তখন ছুঁচো ডাকছে, তাই ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে সিটে গা এলিয়ে দিয়ে সে তমালের দিকে তাকায়। তমাল যখন গাড়ি চালায় তখন ওকে পাশ থেকে আলগাভাবে দেখতে খুব রোম্যান্টিক লাগে জিয়ার। তমালের চেহারায় এমন একটা ঝকঝকে ভাব আছে, যা মেয়েদের কাছে যথেষ্ট আকর্ষণীয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ইন্দিরার কাছে এই চাইনিজ রেস্টুরেন্টটা ওদের দুজনের অত্যন্ত পছন্দের জায়গা। খাবারও দারুণ! সেখানে ঢুকেই সোজা দোতালায় ওদের চির পরিচিত টেবিলটায় গিয়ে বসে পড়ে দুজনে। অর্ধেকটা লিমকা শেষ করে তমাল বলতে শুরু করে, "জিয়া, তোমাকে একটা কথা বলার ছিল। আমি আমেরিকায় একটা ভাল ইউনিভার্সিটিতে ক্যাসুয়ালি অ্যাপ্লাই করেছিলাম, যেটা আগে তোমাকে বলা হয়নি। সেখান থেকে একটা উত্তর পেয়েছি গতকাল। আমাকে ওরা অ্যাকসেপ্ট করেছে। স্কলারশিপ নিয়ে মোটামুটি চলে যাবে আমার। জানি তোমার কাছে হয়তো সহজ লাগছে না ব্যাপারটা; কিন্তু আমি

ভেবে দেখলাম এইরকম সুযোগ সবসময় আসে না। মাত্র তো দুটো বছর। পারবে না আমার জন্য অপেক্ষা করতে?”
এক লহমায় সবকিছু কেমন যেন ওলটপালোট হয়ে যাচ্ছে জিয়ার। কী বলবে জিয়া! তমালের জীবনে উন্নতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবার মতো মেয়ে জিয়া নয়। বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠছিল, কিন্তু কাঁদো কাঁদো মুখে সে সম্মতি জানিয়েছিল।
- খবরটা আসার পর থেকে মন খুব অস্থির ছিল। তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছিল – বলে চেয়ারটা একটু কাছে টেনে এনে জিয়ার হাতটা চেপে ধরে তমাল।

তমাল আমেরিকায় পড়তে চলে যাবার পরেও ওদের সম্পর্ক একটুও নষ্ট হয়নি। একে অপরের থেকে দূরে থেকেও ভালবাসার পবিত্র বন্ধনে বেঁধে রেখেছিল নিজেদের। জিয়া নিজের পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত ছিল, আর বাড়ি বয়ে আসা অজস্র বিয়ের সম্মন্ধকে আটকাচ্ছিল নানা অছিলায়।
তমালের মতো একজন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের যুবককে যে ওদের পাড়ার কিছু মেয়ে পছন্দ করত, সেটা বলাই বাহুল্য। তাদের মধ্যে এই পপি গাঙ্গুলী ছিল সবচেয়ে ছুঁকছুকে ধরনের। ছেলেরা বোধয় এইরকমই হয় – যে বেশি গায়ে পড়ে তাকে গার্ল-ফ্রেন্ড হিসেবে পছন্দ করে না; আর যে মেয়ে বেশি পাত্তা দেয় না, তার দিকেই বেশি ঝোঁকে। জিয়ার ওই মিষ্টি ব্যক্তিত্ব আর ‘ধরা দেব না’ সম্মোহনে মুগ্ধ ছিল তমাল। তাই জিয়াতেই ওর মন মজেছিল।

অথচ এসব জেনেশুনেও এই পপি একদিন জিয়ার সঙ্গে তমালের সম্পর্কে ভাঙ্গন ধরাতে চেয়েছিল।
পপি এতই নাছোড়বান্দা, নির্লজ্জ যে একদিন তমালকে সরাসরি প্রেম নিবেদন করে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসে। সেবার তমাল গরমের ছুটিতে কলকাতায় এসেছে শুধু জিয়ার সঙ্গে দেখা হবে বলে। কিন্তু পপি সুযোগ বুঝে তমালকে ওর মনের কথা সরাসরি জানিয়েছিল যে সে তমালকে বিয়ে করতে চায়। তমাল সব কথা জিয়াকে জানিয়েছিল। তমাল তখন জিয়ার ভালবাসায় পাগল। কিছুতেই আর জিয়াকে ছেড়ে থাকতে পারছে না। এবার যা হয় হোক, জিয়াকে বিয়েটা করে ফেলতেই হবে। চাকরি পাবার পর সামাজিক বিয়ে হবে। আমেরিকায় ফেরৎ যাবার বেশ কিছুদিন আগে তমাল জিয়াকে কোর্ট ম্যারেজের প্রস্তাবটা দিয়েই ফেলে। বিয়েটা সেরে ফেললেই ওদের আর কেউ আটকাতে পারবে না, একথা জিয়া জানত বলেই বিয়েতে সম্মতিও দিয়েছিল।

তমাল জিয়ার বিয়ের খবরটা তখনও সবাই জানে না। ওই পপি গাঙ্গুলীও জানতে পারেনি যে ওদের ভালবাসা কতখানি গভীর। তমালকে কাছে পাবার আশায় পরিকল্পনা করে আমেরিকা অবধি চলে গিয়েছিল পপি। ভেবেছিল হয়তো কাছাকাছি থাকতে পারলে তমালকে বশ করা সহজ হবে। এমনকি জিয়া আর তমালের বিয়ের কথা জানার পরেও পপি তমালকে ফোন করে ন্যাকা ন্যাকা মেসেজ রাখত। জিয়া সবই জানত, কারণ তমাল সব কথাই জিয়াকে বলত। সব জেনেও সে ক্ষমা করে দিয়েছিল পপিকে। ওদের বিবাহিত জীবন যাতে নষ্ট হয়ে যায় তার জন্য নানারকম চেষ্টা করেছে পপি। তমাল এভাবে হাতের নাগালের বাইরে চলে যাবে সেটা পপি কোনদিন ভাবতেও পারেনি।

এতগুলো বছর পরেও জিয়ার কাছে হেরে যাবার দুঃখটা ভুলতে পারেনি পপি গাঙ্গুলী। জিয়ার এখন অনেক সুনাম; কিন্তু সেই সুনাম নষ্ট করার প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পপি। জিয়া যে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এতদিন কাজ করছে সেই প্রতিষ্ঠানের সিনিয়ারদের সঙ্গে ফেসবুকে বন্ধু হয়েছে পপি। প্রজেক্ট ম্যানেজারের কাছে ওর নামে কিছু বলেছে সেটা বুঝতে পারছে জিয়া। দেখছে যে কোনও বড় প্রজেক্ট থেকে জিয়ার নাম বাদ পড়ে যাচ্ছে। জিয়া চিরকালই সোজা কথার মানুষ। ঢং করে ন্যাকা কথা বলতে কোনদিনই পারে না সে। ঐরকম গায়েপড়া ধরনের মানুষ ও নয়।
এতগুলো বছর পরে আর নতুন করে কীসের লড়াই! তমাল তো জিয়াকেই ভালবেসেছে। প্রেমের জয় তো সেখানেই। তাই এখন প্রতিভার প্রতিযোগিতায় জিয়াকে হারাতে উঠে পড়ে লেগেছে পপি। এসব জিয়া বোঝে, লক্ষ্য করে, কিন্তু মাথা ঘামায় না।
সাফল্য হাসিল করার ইঁদুর-দৌড়ে জিয়ার মতন মানুষরা কখনও দৌড়ায় না, নিজের যোগ্যতায় যেটুকু পেতে পারে সেইটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকতে জানে তারা। বিরল প্রতিভা থাকলে সাফল্য এমনিই এসে ধরা দেয়। পৃথিবীতে লোভ-লালসা-হিংসার কোনদিনই জয় হয় না। জিয়া অনেকদিন

আগেই পপিকে ক্ষমা করে দিয়েছিল, সেইখানেই জিয়ার জয়। জিয়া এই ব্রহ্মান্ড, গ্রহ-নক্ষত্র, জন্ম-মৃত্যু, আধ্যাত্মিকতার গভীরে গিয়ে জীবনটাকে বুঝবার চেষ্টা করে। ক্ষমাতেই আছে আসল জয়। সীমাহীন লোভ-হিংসা মানুষের বিবেক-বুদ্ধি লোপ করে তাকে পাপের পথে পরিচালিত করে। পপি আবার সেখানে পরাজিত।

তেষ্টা

অযান্ত্রিক

এই ঝড়-জলের রাতে মিতুল সেলিমপুর স্টেশনে নেমে ভাবল, খুব ভুল হয়ে গেছে, আরো কিছুটা আগে বেরোনো উচিত ছিল। কিন্ত শেষ মুহূর্তে ওই পেশেন্টটি চলে না এলেই ভাল হতো, তার ড্রেসিং করে দিতে গিয়ে দেরী হয়ে গেল। যাক, কী আর করা যাবে।

বলে নেওয়া ভাল – মিতুল মানে, মিতালী সিংহরায়, একজন গাইনোকলজিস্ট, শহরে একটা ছোট্ট বেসরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের একজন কর্মী। উনি সেলিমপুরে এসেছেন, সেলিমপুর রাজবাড়ির পারিবারিক হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসক হিসেবে যোগ দিতে। যা কিছু যোগাযোগ সবই পত্র মারফৎ।

স্টেশনের বাইরে এসে মিতুল দেখল খাঁ খাঁ স্টেশন চত্বর। ওঁদের গাড়ি পাঠানোর কথা ছিল। এখানে সামান্য কয়েকটি গুমটি, তাও বন্ধ; হয়তো জল ঝড়ের জন্য। যাতায়াতের কোনও উপায় না দেখে, মিতুল ঠিক করল, স্টেশন মাস্টারের কাছে গিয়ে জানবে, এখানে কোনো ওয়েটিং-রুম আছে কিনা, বা এই ঝড় জলের রাতে কোনো মহিলার বাসযোগ্য জায়গা আছে কিনা? তার সঙ্গে বেশী কিছু মালপত্তর নেই – দু-এক দিন দেখে তারপর শহর থেকে বাকি জিনিস পত্তর নিয়ে এসে ঘর ছেড়ে দেবে। আজকাল শহরে একলা কোনো মহিলার পক্ষে একটা ঘর জোগাড় করা বিপত্তির ব্যাপার।

এইসব ভাবতে ভাবতে স্টেশনের দিকে পা বাড়াতেই, তার কানে এল একটা গাড়ির আওয়াজ, আর তীব্র আলো। মুহূর্তের মধ্যে সেই গাড়িটা তার সামনে এসে দাঁড়াল। মিতুল একটু ঘাবড়ে গেল। ওকে অবাক করে দিয়ে এক মেয়েলী অথচ পুরুষ কণ্ঠে তার দিকে প্রশ্ন ছুটে এল, "আঙ্গে, আপ্নেই কি ডাক্তার মিতালী সিংহ রায়? কৈলকেতা থিকা আসতেছেন? আইপনার লগে ছুটা রাজাবাবু গাড়ি পাট্টে দিলেন। আসেন আসেন দেরি হই যাচ্চে যে।" কোনরকম উত্তর দেওয়ার আগেই মিতুল যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতোই গাড়িতে গিয়ে উঠে পড়ল। আর গাড়িও চলতে শুরু করল। রাস্তা খালি, গাড়িতেও

শুধু ড্রাইভার আর মিতুল, আর ড্রাইভারটিও বড় অদ্ভুত – কোনো কথা বলে না। মিতুল জানতে চাইল, “দাদা, রাজবাড়ি কতদূর?” কোনো উত্তর নেই, যেন কথাটা শুনতেই পায়নি, মিতুল আর কথা বাড়াল না, বৃষ্টির জন্য গাড়ির ভিতরে বেশ শীত শীত করছে। গাড়ির কাঁচ তোলা থাকায় বাইরের কিছুই চোখে পড়ছে না। সামনে যতদূর গাড়ির আলোতে দেখা যাচ্ছে, শুধু কালো রাস্তা আর ঘন অন্ধকার। মাঝে মাঝে একটা মিষ্টি আতরের গন্ধ আসছে গাড়ির ভিতরে। একভাবে সেই কালো রাস্তা দেখতে দেখতে কখন যে মিতুলের চোখ লেগে গেছে, মিতুল বুঝতেই পারেনি। হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি লাগতেই সে চোখ খুলে দেখল গাড়িটা বিশাল দালান ঘেরা বাড়ির ফটক পেরিয়ে ঢুকছে। ভাগ্যিস ঘুমটা ভাঙল, নাহলে খুব অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়তে হতো। গাড়িটা মূল বাড়ির দরজায় গিয়ে দাঁড়াতেই, এক মাঝবয়সী দম্পতি এসে দাঁড়ালেন, হাতজোড় করে বললেন, “আসুন আসুন, কী সৌভাগ্য আমাদের। পথে কোনো কষ্ট হয়নি তো? আমি গিরিজা প্রসাদ চৌধুরী, আর ইনি মণিমালা দেবী, আমার স্ত্রী।”

মিতুল প্রতি নমস্কার করে গাড়ি থেকে নামতে নামতে বলল, “না না, বরং আমার দেরি করে আসায় আপনাদেরই অসুবিধায় পড়তে হ’ল, তার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।”

ভদ্রলোক বললেন, “এ আবার কী বলছেন আপনি? আপনি এসেছেন আমাদের মুক্তি দিতে; আপনার হাতে দায়ভার তুলে দিয়ে আমরা মুক্তি পাব।” কথাটা শুনে মিতুলের একটু খটকা লাগল কিন্তু কিছু বলল না। হাতে ব্যাগ নিয়ে এগোতেই একজন বুড়ো চাকর গোছের লোক যেন হাওয়া থেকে উদয় হয়ে বলল, “আরে, করেন কী, করেন কী? আমায় দিন, কত্তাবাবু দোতল্লায় আপনার থাকার ব্যবস্থা করেছেন।” এই বলে ব্যাগ নিয়ে হনহন করে হাঁটা দিল। কত্তাবাবুর সাথে মিতুলও সেই পথ ধরল। একটা লম্বা মতো প্যাসেজ পার করে ওরা একটা শ্বেত পাথরের সিঁড়ির সামনে এসে পড়ল। মিতুলের নাকে সেই গাড়ির মিষ্টি গন্ধটা তখনও লেগে আছে, বুঝল সেটা যেন আরও প্রকট হয়ে উঠছে। মিতুল ভাবল হয়তো রাজবাড়িতে এমনই হয়। যাইহোক গিরিজাবাবু মিতুলকে ওর ঘরে পৌঁছে দিয়ে বললেন, “ঘরের লাগোয়াই স্নানঘর আছে, এতদূর থেকে আসছেন একটু ফ্রেশ হয় নিন। আমি খাবারটা আপনার ঘরে পাঠিয়ে দিচ্ছি। অনেক রাত হ’ল, কালকেই নাহয় আমাদের মহল, হাসপাতাল ঘুরিয়ে দেখাব।” বলেই চলে গেলেন। মিতুল ঘরটা দেখতে লাগল, আগেকার দিনের রাজবাড়ির মতোই। বড় বড় একমানুষ সমান জানলা, সাদা তেলতেলে মার্বেলের মেঝে, আসবাব বলতে একটা টেবিল, একটা আলমারি, ঘরের ঠিক মাঝখানে কালো চকচকে আবলুস কাঠের খাট, তাতে সাদা চাদর ঢাকা বিছানা পাতা। সেই টেবিলের পাশে রাখা তার ব্যাগটা খুলতে গিয়েই তার হাত-ঘড়িতে চোখ পড়ল। ওমা বারোটা তো প্রায় বাজতে গেল! তড়িঘড়ি সে জামা কাপড় নিয়ে স্নানঘরে ঢুকে পড়ল। গা-সওয়া গরম জলে স্নান সেরে মিতুলের বেশ আরাম লাগল। ঘরে এসে নরম বিছানায় পিঠ ঠেকাতেই চোখ জুড়িয়ে আসতে লাগল। ঠিক তখনই দরজায় ঠকঠক, “দিদিমণি, রাতের খাবার এনেছি গো।”

- “এসো, দরজা ভেজানোই আছে...” বলতেই দেখা গেল বিশাল এক থালা হাতে সেই বুড়ো চাকর লোকটি ঢুকল। খাটের সামনে একটা টি-টেবিলের উপর থালাটা রাখল। মিতুল ভাবল ওমা, এই টেবিলটা তো তখন চোখে পড়েনি!

আর ঠিক তখনই চাকরের পিছন পিছন ঘরে এসে ঢুকলেন গিরিজাবাবু, বললেন, “আরেকবার বিব্রত করতে চলে এলাম। আপনি কিন্তু রাতে শোবার সময়, দরজা বন্ধ করে শোবেন। সকালের আগে ভুলেও জানলাগুলো খুলবেন না, বাইরে বড্ড পোকামাকড়ের উপদ্রব।” মিতুল ধন্যবাদ জানাতেই উনি এমনভাবে বেরিয়ে গেলেন যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন। এবার মিতুল থালার দিকে তাকিয়ে প্রায় ভিরমি খাওয়ার উপক্রম; এত রকমের খাবারের কথা সে শুধু রূপকথার গল্পেই পড়েছে। থালা থেকে কিছু খাবার বেছে নিয়ে খেয়ে এলিয়ে পড়ল বিছানায়। আর পড়তে না পড়তেই ঘুম।

মিতুল ঘুমিয়ে পড়লেও ওর ঘুম খুব পাতলা। মাঝরাতে একটা খুট করে আওয়াজ হতেই ওর ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভেঙে দেখল ঘরের মধ্যে গিরিজাবাবু ও মণিমালা দেবী, সারা ঘর ভরে আছে সেই মিষ্টি অথচ তীব্র আতরের গন্ধে; আর দুজনেই একদৃষ্টে চেয়ে আছে তার দিকেই। তাদের লাল গনগনে আগুনের মতো দৃষ্টি দেখে মিতুলের ভিতরটা কেমন যেন করে উঠল? মিতুল চোখ খুলেছে

বুঝতেই গিরিজাবাবু বলে উঠলেন, “আসলে আপনাকে আমার মৃত মেয়ের মতো দেখতে, আর আমার স্ত্রী আপনাকে আরেকটিবার দেখতে চাইল তাই নিয়ে এলাম।” মিতুল প্রথমেই মনে করার চেষ্টা করল যে শোয়ার সময় তো দরজা দিয়েই শুয়েছিল! দরজার দিকে একবার তাকাতেই সে বুঝতে পারল দরজা ভিতর থেকেই বন্ধ। সে চিৎকার করে বলে উঠল, “এ কী অসভ্যতা?” মণিমালা দেবী খিলখিল করে হেসে উঠে বললেন, “সেকি গো মেয়ে, অসভ্যতা হতে যাবে কেন? তুমি তো আমাদের মেয়ে, এতদিন পরে কাছে পেয়েছি, একটু বুকে নেব না?” বলেই বুকে জড়িয়ে ধরলেন মিতুলকে, আর অমনি মিতুল ওর ঘাড়ের কাছে অনুভব করল তীব্র ছুঁচ ফোটানোর যন্ত্রণা। মিতুল এক ঝটকায় মণিমালাকে ঠেলে ফেলে দরজার দিকে দৌড়াল। তার পিছনে গিরিজাবাবু আর মণিমালাও হইহই করে ছুটে এলেন মিতুলের দিকে। মিতুল দরজা খুলে সিঁড়ির দিকে ছুটতে লাগল। পিছনে তাকিয়ে দেখল গিরিজাবাবু, মণিমালা আর সেই চাকরটি তারই পিছনে ছুটে আসছে; আর তাদের দেহ থেকে মাংস খসে খসে পড়ছে, সেইসঙ্গে সেই সুরম্য রাজপ্রাসাদ পোড়ো বাড়ির মতো রূপ ধারণ করছে। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে জমাট অন্ধকারে মিতুল যেন হারিয়ে গেল। মিষ্টি আতরের তীব্র গন্ধে তার দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। জমাট অন্ধকার থেকে কেউ যেন চিৎকার করে বলে উঠল, “পালাও মিতুল, পালাও, ওরা তোমায় বাঁচতে দেবে না।” কিন্তু মিতুলের পা যেন পাথরের থেকে ভারী, আর ঐ আতরের গন্ধ ওর ফুসফুসে হাওয়া ঢুকতে দিচ্ছে না। বাতাসের মধ্যে কিছু একটা আঁকড়ে ধরতে গিয়েও মিতুল পড়ে গেল মেঝেতে। তারপর আর কিছু মনে নেই।

সকালে পাখির ডাকে ঘুম ভাঙল মিতুলের। চোখ খুলে দেখল, কাল রাতের দেখা ঘরেই সে আছে, নিচেরতলা থেকে কিছু লোকের কথার শব্দ আসছে। চারিদিকে তাকাতে তাকাতে সে ভাবল, ওমা কিছুই তো হয়নি, তাহলে যা দেখছে সব দুঃস্বপ্ন ছিল! নিজেই নিজের বোকামির জন্য একটু হেসে স্নানঘরে চলে গেল। কিন্তু আয়নায় নিজের মুখ দেখে চমকে উঠল মিতুল। একী, তার ঘাড়ে গলায় এত ফুটো কী করে হ’ল, আর সবকটা ফুটো থেকে রক্ত বেরিয়ে শুকিয়ে আছে। ভয়ে শিউরে উঠে মিতুল চিৎকার করে উঠল। আয়নায় দেখল তার মুখের ছোট গজ-দাঁতদুটো মাংসাশী পশুর মতো বড় এবং তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। সে ভয় পেয়ে ছুটে স্নানঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির কাছে আসতেই তার চোখে পড়ল নীচে পুলিশের লোকেরা একটা মৃতদেহ ঘিরে রেখেছে, আর মৃতদেহটি অবিকল তারই মতো দেখতে।

মিতুলের বুকের ভিতরটা শুকিয়ে আসছে, খুব তেষ্টা পাচ্ছে, কিন্তু সেটা জলের জন্য নয়...

সুরার সুড়সুড়ি

রাজর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়

তারাপদ রায়ের 'মাতাল সমগ্র' বইটি যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানবেন যে মাতালরা মোটেই খারাপ মানুষ নন। বা অল্পস্বল্প মাতলামি করাটাও মোটেই খারাপ ব্যাপার নয়। বরং, একটু তলিয়ে দেখলে এই সিদ্ধান্তে আসাই যেতে পারে যে মাঝে মধ্যে মাতলামি করা শরীরের পক্ষে একটা ভাল ব্যাপার। যে কথা আপনি তথাকথিত ভদ্র অবস্থায় বলে উঠতে পারেন না, মাতাল অবস্থায় তা বলে দিয়ে সেই চাপা ক্ষোভ, হতাশা, রাগ, গ্লানি, অভিমান, অপমান ইত্যাদি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। আমি যেরকম অনেক বছর আগে টিচার্স হুইস্কির সাথে কিংফিশার বিয়ার মিশিয়ে দু-তিন গ্লাস খেয়ে (আমরা বাঙালিরা সবই খাই – সে মাছ-ভাতই হোক, বা বিড়ি- সিগারেট বা মদ; তাই আর কষ্ট করে 'পান' কথাটি ব্যবহার করলাম না) এক বান্ধবীর প্রতি অনেক ক্ষোভ ফোনের মধ্যে উগরে দিয়ে শান্তি পেয়েছিলাম, তাই 'প্রেম হতে হতেও হ'ল না'।

এরকম ঘটনা আকছার শোনা যায়। বিশেষ করে কলেজ জীবনের নাইট-আউটে যদি 'মদ খেয়ে ছড়ানো' না হয়ে থাকে, তাহলে পরের দিন সকালে উঠে লোকজন মনে করে যে টাকাটা জলে গেল। পরবর্তী জীবনে বহু আড্ডার একটা মূল বিষয় হয় এইসব ছড়ানোর গল্প। অর্থাৎ বলাই বাহুল্য যে সামাজিক আড্ডার পরিপ্রেক্ষিতে মদের গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমান ভারতীয় তথা বাঙালি সমাজে মদ ব্যাপারটার প্রতি একটা অদ্ভুত 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি'র মতো আচরণ।

অনেক বছর দিল্লিতে কাটিয়েছি। সেখানে দেখেছি লোকজন প্রচন্ড গরমে গাড়ির মধ্যে পুরোদমে এ সি চালিয়ে চিকেন ললিপপ সহযোগে হুইস্কি খাচ্ছে। আশেপাশে মাঝে মধ্যে হাবিলদার ঘোরাঘুরি করলে তাদের হাতে নয় ৫০ টাকা বা একটা ছোট বোতল (নিপ) গুঁজে দিচ্ছে। তারাও হাসিমুখে (একটা হালকা সেলাম ঠুকে) অন্যদিকে চলে যাচ্ছে। হাবিলদার এবং মদ্যপদের এ এক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। হাবিলদার জানে যে এই মানুষগুলো মোটেই খারাপ নয়, এরা মদ খেয়ে বা না খেয়ে কখনই কোনো হাঙ্গামা করবে না। এদের শুধু মদ খাওয়ার কোনো জায়গা নেই। নিয়মিত, মানে ধরুন যারা সপ্তাহে এক-দুদিন মদ খায়, তাদের পক্ষে সবসময় বার-এ যাওয়া সম্ভব নয়। ভ্যাট, জি এস টি-র অত্যাচারে দামও তিনগুণ। অতঃপর গাড়ি, এ সি, নিপ ও হাবিলদারের এই চতুরঙ্গ জমে উঠেছে। এবার এসব শুনে মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে যে বাড়ি কী দোষ করল? সেখানে বেশ পা ছড়িয়ে বসে টিভি-তে 'কোক-স্টুডিও' বা 'শিলা কি জাওয়ানি' (যার যেমন রুচি) চালিয়ে মদ খেতে আপত্তি কোথায়? হুঁ হুঁ বাবাঃ, সেখানেই তো আসল খেলা! সেটি করা যাবে না। বাড়ির সবাই জানে যে তুমি মদ খাও, এটাও জানে যে যেদিন খেয়ে ফিরবে সেদিন তোমাকে কেউ কোনো জটিল প্রশ্ন করবে না। শাশুড়ি-বৌয়ের মধ্যে যদি ভাল সম্পর্ক থাকে তাহলে রাতের খাবারের মিনিট পনেরো আগে নেশাটা হালকা নামানোর জন্য এক গ্লাস লেবুর জলও পেয়ে যেতে পারো। অর্থাৎ পোস্ট-নেশায় তোমার জীবনটা যতটা মসৃণ করা যেতে পারে, তার একটা পরোক্ষ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু যদি বাড়িতে বসে মদ খেতে চাও, তাহলেই কুরুক্ষেত্র। তখন মা হাহাকার করবে, বৌ মুখ-ঝামটা দেবে, আর নিজেকে চরম অপরাধী মনে হবে। অতএব, চতুরঙ্গ!

কলকাতায় কখনো এই গাড়িতে বসে মদ খাওয়ার চলটা দেখিনি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে কলকাতা এই ব্যাপারে সাংঘাতিক প্রগতিশীল। বরং, কলেজে পড়া ছেলে মদ খেয়ে বাড়ি ফিরলে মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের মায়েরা ভগবানের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে যে ভয়ানক নাটকটি শুরু করেন তা খারাপ বাংলা সিরিয়ালকে যে কোনদিন হার মানাতে পারে। তাই পাড়ার কাকু-জ্যেঠুকে দেখলে সিগারেট পেছনে করে নেওয়া (যার ফলে মাথার পেছন থেকে ধোঁয়া উঠে বেশ একটা বাবাজিসুলভ হ্যালোর সৃষ্টি করে), বাবুঘাটে ঠাকুর ভাসানের গোলযোগের মধ্যে লরির ড্রাইভারের পাশে বসে টুক করে দু'ঢোঁক মেরে নেওয়া – এভাবেই বাঙালি ছেলে-ছোকরাদের নেশার হাতেখড়ি হয়।

প্রচুর গৌরচন্দ্রিকা হ'ল। এবার এই লেখার আসল বিষয়ে আসা প্রয়োজন। আমার এই নাতিদীর্ঘ জীবনে মদ সংক্রান্ত নেশা নিয়ে যেসব অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটেছে, তারই

একটা রোজনামচা পেশ করার ইচ্ছে আছে। কারুর মনে যদি প্রশ্ন জাগে যে আমার জীবনটা ঠিক কতটা নাতিদীর্ঘ, তাহলে এটুকু বলতে পারি যে আমি ১৫ বছর হ'ল এঞ্জিনিয়ারিং পাস করেছি আর জীবনে কখনো ফেল করিনি। বাকিটা সবাই নিশ্চয়ই হিসেবে করে নিতে পারবে।

শুরু থেকেই শুরু করা ভাল। দক্ষিণ কলকাতায় মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারে আমার বড় হওয়া – বাবা কেন্দ্রীয় সরকারী গবেষণাগারের গবেষক, মা একটি এন জি ও-র উচ্চপদস্থ অধিকারিকা। বাবা কাকাকে কোনদিন মদ খেতে দেখিনি। আর মা'র একটা প্রধান কাজ ছিল ড্রাগ ও অ্যালকোহল অ্যাডিক্টদের ভাল করা। তো, বাড়ির পরিবেশ কল্পনা করতে কারুরই বিশেষ অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। এহেন বাড়িতে আমি হলাম প্রহ্লাদকুলে দৈত্য। ঢুকলাম এঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। পি এন পি সি (পরনিন্দা-পরচর্চা) বাঙালিদের অত্যন্ত প্রিয়; আর যাদবপুরের এঞ্জিনিয়ারদের পি এন পি পি – পড়াশুনা-নেশা-প্রেম-পলিটিক্স (পড়াশুনাটা বোধহয় শেষে রাখা উচিত ছিল)। এই চতুরঙ্গে (আবার চতুরঙ্গ) না জড়িয়ে ডিগ্রি পেলে ডিগ্রি জ্বালিয়ে দেবার আশঙ্কা থাকে। অতঃপর এঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সময়ই আমার মদের হাতেখড়ি, থুড়ি 'বোতলখড়ি'!

জীবনে প্রথম মদ খাওয়া পুরীতে – সেকেন্ড ইয়ারের পরীক্ষার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে। সেই মদের নাম আজও মনে আছে – খুর্দা রোডে বানানো একটা লোকাল ভদকা – 'ফিনিক্স'! কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন – সেইরকম ব্যাপার আরকি! খেতে কেমন ছিল সেটা একেবারেই মনে নেই। কতটুকু খেয়েছিলাম বা খেয়ে একটুও নেশা হয়েছিল কিনা সেটাও সঠিক মনে নেই। শুধু এইটুকু মনে আছে যে তারপর একটা দোকানে চাইনিজ খেতে গিয়ে খাবার দিতে দেরি হচ্ছিল বলে রান্নাঘরে ঢুকে বেশ কিছুটা হাঙ্গামা করেছিলাম।

সেই যে কলেজের সেকেন্ড ইয়ারে আমার মদের গাড়ি চলতে শুরু করল, তা আজও চলছে। আমি যে খুব বেশি মদ খাই তা নয়, কিন্তু মদ খেতে ভালবাসি (এইটা পড়ে সবাই নির্ঘাত ঠোঁট টিপে হাসতে শুরু করেছে – ভাবছে পৃথিবীর কোনো মাতালই আজ পর্যন্ত স্বেচ্ছায় নিজেকে মাতাল বলেনি; এ তার মানে পাকা মাতাল কোনো সন্দেহ নেই)। বিভিন্ন ধরনের মদ নিয়ে পড়াশুনাও করে থাকি। যেহেতু রাসায়নিক কারিগরি বিদ্যা পাস করেছি, তাই পড়তেও বেশ আগ্রহ লাগে। মদও বানিয়েছি বেশ কয়েকবার। সেই কাহিনী ক্রমশ প্রকাশ্য। যাইহোক, সেই বোতলখড়ির পর মদ খাওয়া চলতে থাকল। সঙ্গী কখনো পাড়ার বন্ধু, কখনো কলেজের বন্ধু। মদের ভাল-মন্দ কেউই বুঝি না তখন। ভাল মদ কেনার পয়সাও কারুর কাছে নেই। প্রায় কেউই বিয়ার খেত না – কারণটা ঠিক বলতে পারব না; তবে খুব সম্ভবত ৫-৬% অ্যালকোহলের জন্য পয়সা খরচ করতে গায়ে লাগত। হুইস্কি, রাম আর ভদকা – এগুলোই মোটামুটি তখন পেয় বস্তু; এবং অবশ্যই প্রায় সবচেয়ে সস্তা ব্র্যান্ডগুলো।

আমার থেকে দু'বছরের বড় পাড়ার এক বন্ধু তখন পড়াশুনার পাশাপাশি টুকটাক কাজকর্ম করছে। সে মাঝেমধ্যে বেশ দামী মদ কিনে এনে আমাদের খাওয়ায় – বন্ধুমহলে তার বেশ রেলা! তার বাড়িতেই এক অষ্টমীর দিন সকালে অঞ্জলি দেওয়ার পর 'অ্যাবসলিউট ভদকা' দিয়ে ব্লাডি মেরি বানানো হ'ল। জীবনে সেই প্রথম আমার ককটেল খাওয়া!

ফাস্ট-ফরওয়ার্ড টু কলেজের ফাইনাল ইয়ার। চিংড়িঘাটার কাছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ক্যাম্পাস আছে – সেকেন্ড ক্যাম্পাস। সেইখানকার বাড়িগুলো বেশ উঁচু, ৮-৯ তলা। ওই ক্যাম্পাসে আমাদের ফেস্টের প্রথম দিন, অর্থাৎ 'কার্টেন রাইজ' হয়। ঠিক হ'ল ঐদিন আমরা সেই বিল্ডিংয়ের ছাদে বসে মদ খাব। পরিকল্পনা মাফিক সবাই যখন লক্ষ্মীছাড়ার 'পড়াশুনায় জলাঞ্জলি'-র সঙ্গে নাচছে, তখন আমরা কয়েকজন বন্ধু সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে শুরু করলাম; সাততলায় গিয়ে দেখি সেখানে গ্রিল দেওয়া, আর তাতে তালা লাগানো। কিন্তু জনতার উত্তেজনা তখন তুঙ্গে! এক বন্ধু প্রায় স্পাইডারম্যানের মতো ঝুলে গ্রিলের অন্যদিকে পৌঁছে গেল। উপর থেকে লাথি মারলে মোমেন্টাম বেশি পাওয়া যায়। সে বেশ বলশালী ছেলে। তার তিন-চার লাথিতে গ্রিলের লক কুপোকাত। পেছনে লক্ষ্মীছাড়ার গান, ৯-তলার উপর ন্যাড়া ছাদ, রাতের ফুরফুরে হাওয়া আর কিছুটা দূরে বাইপাসের আলো – মদটা সামান্যই, 'হোয়াইট মিসচিফ' ভদকা – কিন্তু সেদিনের অভিজ্ঞতাটা আজও স্পষ্ট!

ফাইনাল ইয়ার ফেস্টের আরেকটা ঘটনা। কলেজের শেষ বছর, সকলেই খুব নস্টালজিক। তাই প্রতিদিন মদ খেতে হবে। শেষদিন বড় অনুষ্ঠান, সেদিন গ্র্যান্ড মদ খাওয়া। তার জন্য সবাই পয়সা বাঁচিয়ে রেখেছে। ফলতঃ, শেষের আগের দিন সকলেরই প্রায় 'ভাঁড়ে মা ভবানী'। কারুর পকেট থেকেই ৫-১০ টাকার বেশি বেরোচ্ছে না। কিন্তু এক বন্ধু নাছোড়বান্দা; মদ সে কিনবেই। কোনোক্রমে ১৮০ টাকা জোগাড় হ'ল। সেই টাকা নিয়ে সে হাওয়া! বেশ অনেকক্ষণ বাদে একটা বড় বোতল হাতে নিয়ে হাজির হ'ল। হুইস্কি – নাম 'ম্যাজেস্টিক'। জীবনে ওই প্রথম ও শেষবার ওই ব্র্যান্ড খাওয়া। এরপর কখনো কোথাও সেই বোতল চোখে বা চেখে দেখার সুযোগ হয়নি। জনাকুড়ি ছেলে মিলে একটা ৭৫০ মি লি-র বোতল শেষ করেছিলাম। এক একজনের কপালে জুটেছিল চরণামৃতের সামান্য বেশি। ভাগ্যিস! বেশি খেলে হয়তো এই লেখাটা লেখার জন্য আর বেঁচে থাকতাম না।

চাকরি করতে ঢুকলাম আসামে ইন্ডিয়ান অয়েলের এক রিফাইনারিতে। মদের মান কিছুটা বাড়ল। বাড়িতে একটা 'রয়্যাল চ্যালেঞ্জ' হুইস্কির বোতল রেখেছিলাম। আমার মা আসামে বেড়াতে গিয়ে সেটা আবিষ্কার করল। তারপর শুরু হ'ল সেই বক্তৃতা, যা যে কোনো ছেলেমেয়ের কাছে বিভীষিকা! গোটা চাকরি জীবনে মা কত মাতালের কতরকম সর্বনাশ দেখেছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণের পর মায়ের অমোঘ বাণী, "আমি জানি তুমি কলেজ থেকেই মদ খাও। বাইরে খাবে খাও, বাড়িতে খেও না (সেই এক সমস্যা, বাড়িতে খাওয়া মহাপাপ!)। তবে হ্যাঁ, এই মদটার দেখলাম অনেক দাম; এটা কিনেছ যখন, তখন শেষ করো, কিন্তু এরপর আর কিনো না!" গোলপার্ক-পঞ্চাননতলার মোড়ে পানের দোকানের মালিক এবং সব পেপারমিন্ট কম্পানিকে সু করতে ইচ্ছে হয়েছিল আমার সেইদিন!

চাকরিতে ঢোকার এক বছরের মাথায় কলকাতায় গেলাম। সেবার অনেক বন্ধুবান্ধব একত্রিত। তখন দামি মদ কেনার ক্ষমতা হলেও, নস্টালজিয়ার বসে ঠিক হ'ল যে 'রয়্যাল স্ট্যাগ' হুইস্কি খাওয়া হবে। কলেজ জীবনে এটা ছিল আমার প্রিয়। 'Appy Fizz' বলে একটা জিনিস পাওয়া যেত তখন। আপেলের স্বাদওয়ালা একটা সোডা পানীয়। দিব্যি লাগত রয়্যাল স্ট্যাগ-এর সঙ্গে মিশিয়ে খেতে। সেটা বানিয়ে একচুমুক দিলাম। মনে হ'ল যেন সর্ষের তেল খাচ্ছি! উপলব্ধি করলাম কলেজ জীবন একবার ছেড়ে গেলে আর ফেরৎ পাওয়া যায় না!

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এভাবেই মদের গাড়ি এগিয়েছে। কর্মসূত্রে এবং বেড়ানোর তাগিদে দেশে বিদেশে বহু জায়গায় ঘুরতে হয়েছে। যে কোনো জায়গায় গেলেই আমি সেখানকার স্থানীয় পানীয় চেখে দেখার চেষ্টা করি। সিকিমের ছাং, বিহারের মহুয়া, উড়িষ্যার তাড়ি থেকে শুরু করে ডেনমার্কের আকভ্যাভিট, সুইডেনের স্ন্যাপস্ বা ব্রেজিলের কাচাসা – কিছুই বাদ নেই! সেসবের প্রচুর দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা, সব লিখতে গেলে আরেকটা 'মাতাল সমগ্র' হয়ে যাবে। যেমন গোয়ায় গিয়ে এক ট্যাক্সিওয়ালার বাড়িতে বানানো এক বোতল কাজু-ফেনী খেয়ে আমরা তিন বন্ধু বীচ থেকে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ঘরে ফিরেছিলাম। সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথম দৃশ্য চোখে পড়ল – ঘরে একটা বিশাল ডোবারম্যান কুকুর ঘুমন্ত এক বন্ধুর কান চেটে দিচ্ছে! সে কুকুর কার, কেনই বা আমাদের ঘরে ঢুকল, সে সবের বিস্তারিত বিবরণে আর গেলাম না!

২০১১ সালে প্রথম বিদেশ ভ্রমণ, কলেজের বন্ধুদের সাথে – মালয়েশিয়া আর সিঙ্গাপুর। তখনও বয়স তিরিশ পেরোয়নি; বেশ ভালই মদ খেতে পারি আমরা সকলে। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম যে সিঙ্গাপুরে মদের প্রচন্ড দাম। তাই কলকাতা বিমান বন্দরের ডিউটি-ফ্রি থেকেই ৬-বোতল মদ তোলা হ'ল (মদ কখনো কেনা বা নেওয়া হয় না, সবসময় তোলা হয়)। প্রথম গন্তব্য মালয়েশিয়া, তারপর সড়কপথে সিঙ্গাপুর। মালয়েশিয়ায় দু বোতল মদ শেষ হ'ল – রইল বাকি চার। সিঙ্গাপুর বর্ডারে কাস্টমস্-এ গিয়ে খেলাম ধাক্কা। মালয়েশিয়া থেকে সিঙ্গাপুরে সড়কপথে ঢুকলে এক বোতল মদও অনুমোদিত নয়; ডিউটি দিতে হবে। আমাদের মাথায় হাত! অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আমরা খেয়াল করলাম যে কোনো চোরা-গোপ্তাভাবে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব কিনা। দেখলাম সব ব্যাগ স্ক্যান হচ্ছে, কোনোই আশা নেই। অবশেষে সেই চার বোতল মদ ডিক্লেয়ার করা হ'ল। হিসেব কষে ডিউটি যা দাঁড়াল তাতে 'ঢাকের দায়ে মনসা বিকিয়ে' যাওয়ার জোগাড়। অতঃপর, দু বোতল রেখে বাকি দু বোতল দান করে দিলাম।

পুলিশগুলো চোখের সামনেই বোতলগুলো ভেঙে ফেলল। সেদিনের কথা ভাবলে আজও বুকটা টনটন করে ওঠে!

মেক্সিকো সিটিতে গিয়ে জানতে পারলাম যে আমরা যেভাবে ঢক করে টেকিলা (Tequila) গিলে ফেলে তারপরেই নুন-লেবু মুখে ঠুসে দিই, সেটা মোটেই টেকিলা খাওয়ার নিয়ম নয়। এক বয়স্ক মেক্সিকান ভদ্রলোক যত্ন করে আমাকে শেখালেন কীভাবে টেকিলা খেতে হয়। মেক্সিকোর বার-এ টেকিলা অর্ডার করলে, তার সঙ্গে আরেকটা পানীয় দেওয়া হয়। লাল রঙের নন-অ্যালকোহলিক পানীয়, নাম 'সাংরিটা' (Sangrita সাংরিয়া নয়, যেটা ওয়াইন দিয়ে বানানো হয়)। অত্যন্ত সুস্বাদু এই সাংরিটা বস্তুটি। সম-পরিমাণ টেকিলা ও সাংরিটা দুটো আলাদা শট-গ্লাসে দেওয়া হয়। সঙ্গে কয়েক টুকরো লেবু ও নুন। আগে থেকে লেবুর উপর নুন ছড়িয়ে রাখতে হবে। তারপর একচুমুক টেকিলা ও একচুমুক সাংরিটা মুখের মধ্যে মিশিয়ে তারপর গিলতে হবে। তারপর ইচ্ছে হলে সামান্য লেবু চুষে নেওয়া যেতে পারে। তবে এই পানীয়র মিশ্রণ এতই সুস্বাদু, যে লেবুর প্রয়োজন হয় না বললেই চলে। তা, এভাবে বেশ কিছুদিন খাওয়া হ'ল টেকিলা। ভারতে ফেরার সময় এক বোতল টেকিলা, এক বোতল মেজক্যাল ও এক বোতল সাংরিটা নিয়ে দিল্লি বিমান বন্দরে পৌঁছলাম। সেবারই হঠাৎ কাস্টমসের বাবুদের ইচ্ছে হ'ল যে আমার ব্যাগ স্ক্যান করবে। তথাস্তু! স্ক্যান করে তিনটি বোতল দেখে ব্যাগ খোলানো হ'ল। দু'বোতল মদের অনুমোদন আছে, তৃতীয়টার জন্য ডিউটি দিতে হবে। আমি জানালাম লাল পানীয়টা মদ নয়। পুলিশ সে কথা শুনতেই চায় না; বলে মদ না হলে এত দূর থেকে বয়ে এনেছ কেন? আমিও ছাড়ার পাত্র নই। এর আগে বহুবার, দুই কেন, চার, পাঁচ এমনকি সাত বোতল মদ নিয়ে বীরদর্পে কাস্টমস্ পার করেছি; কেউ টিকিটাও ছুঁতে পারেনি। তাহলে এবার কিছু না করেই কেন পয়সা দেব? আমি বললাম, মদ যদি হয় তো অ্যালকোহলের মাত্রা কোথায় লেখা আছে দেখাও। স্টিকার স্প্যানিশ-এ লেখা, পুলিশ তা পড়তে পারছে না। তারও জেদ চেপে গেছে, পয়সা সে নেবেই। শেষে কোথা থেকে একজন যাত্রীকে ধরে নিয়ে এল, যে স্প্যানিশ পড়তে পারে। ভাগ্যক্রমে সে মেক্সিকান। বোতল দেখেই সে পুলিশকে বলল যে এই পানীয়টি মদ নয়। অতএব, সত্যমেব জয়তে!

২০১৪ কিংবা ১৫ সালে হঠাৎই এক বন্ধু বলল, "চল, বাড়িতে ওয়াইন বানাই।" বেশ কথা, বানানো যাক। কাঁচের কার্বোয়, এয়ার-লক, ইস্ট ইত্যাদি সরঞ্জাম কেনা হ'ল। তারপর একদিন সকাল সকাল বাড়ির কাছের ওখলা মান্ডি (তখন দক্ষিণ দিল্লিতে থাকি) থেকে ১২ কিলো আঙ্গুর নিয়ে এলাম। তা থেঁতো করতে শিরদাঁড়া বেঁকে যাওয়ার জোগাড়। দিনের শেষে সবকিছু তৈরী হ'ল। এবার অপেক্ষা। প্রথম ১২-১৪ ঘন্টা সব শান্ত। ভাবলাম সব খাটনি জলে গেল বোধহয়। তারপর অল্প অল্প করে কার্বন-ডাইঅক্সাইডের বুদবুদ ওঠা শুরু হ'ল। তারপর তা বেড়ে এমন পর্যায় দাঁড়াল যে ফেনা বেরিয়ে চারিদিকে উপচে পড়ল। দিনদুয়েক বাদে আবার বুদবুদ ওঠা কমতে শুরু করল। ৬-সপ্তাহ বাদে কার্বোয় থেকে বার করে চুমুক দিলাম দুরু-দুরু বুকে। নিজেরা বানিয়েছি বলে বলছি না, খেতে সত্যিই ভাল হয়েছিল। বন্ধু-বান্ধবরা খেয়ে পয়সা দিয়ে কিনেও নিয়ে গিয়েছিল! পরে আরো কয়েকবার ওয়াইন ও মিড বানিয়েছি। সেসব সরঞ্জাম টেনেও এনেছি হিউস্টনে। দেখি কবে আবার বানানো যায়!

শুরুতেই লিখেছি যে টিচার্স হুইস্কির সাথে কিংফিশার বিয়ার মিশিয়ে খেয়েছিলাম একবার। এই পাপের জন্য যে আমায় নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। মদ নিয়ে বহু মজার চুটকি-মিম ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়। তার মধ্যে যেটা আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছিল, সেটা সম্বন্ধে একটু লিখছি। একটি কার্টুন ছবি – তাতে দেখা যাচ্ছে যে দুই ব্যক্তি নরকের সিঁড়ি দিয়ে নামছে।

প্রথম ব্যক্তি: আপনি কী পাপ করেছিলেন?

দ্বিতীয় ব্যক্তি: ও সে প্রচুর – খুন, রাহাজানি, ধর্ষণ কত কী! গুনে শেষ করা যাবে না। তখন কি জানতাম যে নরক বলে সত্যিই কিছু আছে। আর আপনার কী পাপ?

প্রথম ব্যক্তি: আমি 18 Y.O. Glenfiddich আর কোকাকোলা মিশিয়ে খেতাম!

দ্বিতীয় ব্যক্তি: আগে যান দাদা, আমার থেকে আপনার দু'ঘা বেশি বেত খাওয়া উচিৎ!

এই লেখা কলেবরে যেভাবে বেড়ে চলেছে, রাশ না টানলেই নয় | আরো কতকিছু মাথায় আসছে | কিন্তু যে জিনিসটা সম্বন্ধে না লিখে শেষ করা একেবারেই সম্ভব নয়, সেটা হ'ল 'ওল্ড মঙ্ক' রাম! বিদেশীরা ভারতীয় খাবারের আর কিছু জানুক বা না জানুক, যেরকম 'বাটার চিকেন'টা জেনে গেছে, সেরকমই ভারতীয় পানীয় বলতে কিংফিশার বিয়ার আর ওল্ড মঙ্ক রাম – এই দুটোর নাম মোটামুটি সবাই জানে | কলেজ জীবনে মদ খেয়েছে কিন্তু ওল্ড মঙ্ক খায়নি – এমন লোক ভারতে খুঁজে পাওয়া ভার | এক পাড়াতুতো ভাইয়ের জন্মদিন উপলক্ষ্যে একবার দুজনে মিলে জুলাই মাসের গরমে এক বোতল ওল্ড মঙ্ক খেয়েছিলাম, এক কেজি ফ্রায়েড-চিকেনের সঙ্গে (সোয়াইন-ফ্লু-এর সুবাদে তখন আরামবাগ চিকেনে ৫০% ছাড় দিচ্ছিল)| এখন সেসব ভাবলেও গা গুলিয়ে ওঠে | পরে বহু ভাল ভাল রাম খেয়েছি | কিন্তু ওল্ড মঙ্কের সঙ্গে Thumbs-Up মিশিয়ে উপর থেকে সামান্য লেবু চিপে দিলে যে নস্টালজিয়াটা সৃষ্টি হয় বাঙালিদের মনে, তার কাছে পৃথিবীর তাবড় তাবড় রাম হার মানতে বাধ্য! ওল্ড মঙ্কের সৃষ্টিকর্তা মারা গেছেন কয়েক বছর হ'ল | সেই খবর জানতে পেরে ফেসবুকে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য জ্ঞাপন করেছিলাম | সেটা দিয়েই ইতি টানব এবারের মতো |

ফেসবুকে দেওয়া লেখা:
কালকে রাতেই খবরটা শুনেছিলাম | আর আজকে তো বিভিন্ন হোয়াটস্অ্যাপ্ দলে আর ফেসবুকে খবরটা ছেয়ে গিয়েছে |
কপিল মোহন – যাঁর হাত ধরে 'Old Monk Rum' বাচ্চা-বুড়োর গলায় পৌঁছে গিয়েছিল – তিনি আর আমাদের মধ্যে নেই | খুবই বিষণ্ন লাগছিল খবরটা শুনে | কিন্তু তার থেকেও বেশি ঘিরে ধরেছিল নস্টালজিয়া | ওল্ড মঙ্ককে জড়িয়ে কত যে স্মৃতি!

আমার ওল্ড মঙ্ক খাওয়া শুরু আর সকলের মতোই কলেজ জীবনে | সে সময় ওল্ড মঙ্ক খাওয়াটা কারুরই বোধহয় ঠিক ইচ্ছাকৃতভাবে হয়নি | অনেকটা এলিমিনেশন পদ্ধতিতে ওল্ড মঙ্কটা খাওয়া শুরু হয় | কলেজ জীবনে হাতে যেটুকু পয়সা থাকত, তাতে ওল্ড মঙ্ক আর রয়্যাল স্ট্যাগ ছাড়া অন্য কিছু কেনার কথা ভাবতেই পারতাম না | শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা – ওল্ড মঙ্কই ভরসা | গত রবিবারই বাড়ির ওল্ড মঙ্ক-এর বোতলটা শেষ হ'ল |
বৌয়ের তৈরী রাম-এ চোবানো ক্রিস্টমাস কেক তো এবার একেবারে সুপারহিট | Happily Unmarried ব্র্যান্ডের ওল্ড মঙ্কের মেটাল পোস্টার বাইরের ঘরে জাজ্বল্যমান | এভাবেই ওল্ড মঙ্ক আমার জীবনের অলিতে-গলিতে, আনাচে-কানাচে বিদ্যমান | আমার বৌয়ের সঙ্গে যেদিন প্রথম কথা বলেছিলাম – মানে ফেসবুক চ্যাট আরকি – সেদিনও উঠেছিল ওল্ড মঙ্ক প্রসঙ্গ |

চাকরি জীবনে হাতে কিছুটা পয়সা আসার পর অন্যান্য বিভিন্ন ডার্ক রাম খেয়েছি | তাদের সবারই দাম ওল্ড মঙ্ক-এর থেকে অনেক বেশি | কিন্তু এক ভাগ ওল্ড মঙ্ক-এ দেড় ভাগ Thumbs-Up, সামান্য জল, একটি পাতিলেবুর চারভাগের এক ভাগের রস আর দু টুকরো বরফ – এর যা অনবদ্য স্বাদ তা আর অন্য কোনো রামে পাইনি | এটাই আমার ওল্ড মঙ্ক-এর প্রিয় রেসিপি | একটা হোয়াটস্অ্যাপ্ দলে হাহাকার হতে হতে একজন বলল যে ওল্ড মঙ্ক-এর মধ্যে মধু আর গরম জল – এটা তার সবচেয়ে প্রিয় | এভাবেই সবাই তাদের নিজস্ব রেসিপিতে ওল্ড মঙ্ককে আপন করে নিয়েছে | আর তাছাড়া, ওল্ড মঙ্ক-এ গরম জল আর লেবু দিয়ে খেলে যে সর্দি কাশি সেরে যায়, সেটা অনেকে মাতালদের বাজে বকা বলে উড়িয়ে দিলেও যারা একবার চেষ্টা করে দেখেছে, তারা কোনভাবেই অস্বীকার করতে পারবে না |

ওল্ড মঙ্ক সম্বন্ধীয় একটা ছোট চুটকিও মনে পড়ে গেল | একটি ছেলে, নাম অযোধ্যা; নতুন চাকরি নিয়ে নতুন শহরে গেছে | কোনোদিন মদ খায়নি | প্রথম উইকেন্ডেই অফিসের বন্ধুদের খপ্পরে পড়ে মদ খেতে বসল | সেই ওল্ড মঙ্ক! দু'চুমুক দিয়েই এত ভাল লেগে গেল যে তাকে আর থামায় কে! বোতলের পর বোতল একাই সাবড়ে দিচ্ছে | শেষে একসময় সে বোতল হাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল | ডাক্তার এসে বললেন, বেশি মদ খাবার দরুণ ছেলেটির মৃত্যু হয়েছে | বাড়িতে খবর তো দিতেই হবে; কিন্তু এই মর্মান্তিক ঘটনা সরাসরি বলা মুশকিল | তাই ছেলেটির বাবাকে ফোন করে এক অফিস কলিগ বলল, মেসোমশাই, "সে রাম নেই, সে অযোধ্যাও নেই |"
বেঁচে থাকুক আমাদের 'Old Monk'!

ওরা অকারণে চঞ্চল

কল্যাণী মিত্রা ঘোষ

আমেরিকার পশ্চিম প্রান্তের রাজ্য ক্যালিফোর্নিয়ার স্যান ডিয়েগো কাউন্টির ভেতর একটি ছোট্ট শহর, ভিস্তা, ছবির মতো সুন্দর। সেখানকারই একটি হাই-স্কুলের সামনে আমি অপেক্ষারত। আজ থেকে আমাকে একটা নতুন দায়িত্ব দিয়েছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। আজ আকাশ মেঘলা, এখানে অবশ্য সারা বছরই খরা, মাঝেসাঝে নামমাত্র বৃষ্টির দেখা পাওয়া যায়। আজ হয়তো তেমনই একটা দিন, অন্ততঃ আবহাওয়ার পূর্বাভাস তাই বলছে। স্কুলের সামনের বড় বড় থামগুলোর একটাতে হেলান দিয়ে আমি অপেক্ষা করছি, আর সেলফোনে টুকটাক মেসেজগুলোতে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছি। এমন সময় দূর থেকে হলুদের ওপর বুকের কাছে কালো স্ট্রাইপ দেওয়া স্কুল বাসটা আসতে দেখলাম। খুব মজার দেখতে এই বাসটা, ঠিক যেন বড় স্কুল বাসটাকে পেটের কাছ থেকে আড়াআড়িভাবে কেটে ফেলা হয়েছে, একটা আধখানা বাস। এটা হ'ল এই স্কুলের বিশেষভাবে সক্ষম ছাত্রছাত্রীদের জন্য নির্ধারিত বাস। আমি এই স্কুলের বিশেষভাবে সক্ষম বিভাগের রিসোর্স স্পেশালিস্ট হিসেবে কাজ করি। নবম শ্রেণীর যেসব ছাত্রছাত্রীরা পড়াশুনোয় একটু পিছিয়ে আছে – হয়তো তারা সামান্য অটিস্টিক অথবা মনঃসংযোগ করতে পারে না, কিংবা কানে একটু কম শোনে অথবা ভীষণ আতঙ্কে ভোগে..., আমার কাজ হ'ল তাদের অনুপ্রাণিত করে এগিয়ে যেতে সাহায্য করা, অঙ্কের ভীতি দূর করে সেটাকে উপভোগ্য বিষয় করে তোলা। আজকের কাজটা অবশ্য তার থেকে একটু অন্য; আসছি সে কথায়।

বাসটি আমার সামনে এসে থেমে গেল। ড্রাইভার নেমে এসে হাসিমুখে আমাকে "গুড মর্নিং" বললেন; আমিও সেটা ফিরিয়ে দিলাম। এরপর ওঁর পেছন পেছন মোট সাত-দশজন ছাত্রছাত্রী নেমে এল, এরা সবাই বিশেষভাবে সক্ষম। এদের নিরাপত্তার জন্যই এই আলাদা বাসের ব্যবস্থা। আমি যাকে নিয়ে যেতে এসেছি, সে মেয়েটি হাঁটতে পারে না। ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে কাজ করার আগে আমাদের তাদের IEP-টি (Independent Education Plan) খুব ভাল করে পড়ে নিতে হয়। তাদের অসুখ, সুবিধা-অসুবিধা, তাদের জন্য নির্ধারিত বিশেষ সুবিধা ইত্যাদি বিষদভাবে লেখা থাকে এই প্ল্যানে। সেভাবেই আমি জেনেছি যে আমি আজ যাকে নিতে এসেছি তার নাম মিরিন্ডা। সে শৈশবে পোলিও রোগে আক্রান্ত হয় এবং সেরিব্রাল পলসির শিকার হয়; তার পা দুটো অসম্ভব সরু, কিন্তু লেখাপড়ায় সে বড়ই ভাল।

ড্রাইভার এবার বাসের পেটের কাছটায় এসে বাইরে থেকে বাসের আধখানা খোলস টেনে মাটিতে নামালেন। তারপর আমি মিরিন্ডাকে দেখতে পেলাম হুইল-চেয়ারে বসে আছে, দু'পায়ে রেইন বুটের মতো জুতো, ওদেরই আশ্রয়ে রয়েছে তার অসম্ভব সরু দুটো পা। এবার ড্রাইভার আর একটা সুইচ টিপলেন আর তার ফলে মিরিন্ডা হুইল-চেয়ার সমেত নীচে নামতে লাগল, মানে বাসের ওইটুকু জায়গা তখন এলিভেটরে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। এবার আরো একটা সুইচ টেপার ফলে এলিভেটর থেকে আর একটা লোহার ঢালু পাত বেরিয়ে এল, যেটা শেষমেশ রাস্তার সঙ্গে মিশে গেল। পুরো সময়টাই মিরিন্ডা বেল্টবাঁধা অবস্থায় সুরক্ষিত ছিল। আমি ওকে মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম, ঠিক যেন সিংহাসনারূঢ়া কোনো দেবী স্বর্গ থেকে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হলেন। পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে এতটাই অভিনব যে কিছুক্ষণের জন্য আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম।

ড্রাইভার "বাই মিরিন্ডা, হ্যাভ এ ওয়ান্ডারফুল ডে" বলতেই আমি সম্বিত ফিরে পেলাম। এগিয়ে গেলাম; তাকে আমার পরিচয় দিয়ে বললাম, এখন ক'দিন আমিই ওকে রিসিভ করব। ওকে সারাদিন দেখাশোনা করার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ একটি এজেন্সীকে দায়িত্ব দিয়েছে। ক'টা দিন তাদের আসতে দেরী হবে তাই আমি সকালটুকু সামলে দেব।

মিরিন্ডা সঙ্গে সঙ্গে একগাল হেসে বলল, "হাই মিসেস জি, নাইস টু মিট ইউ।"

লক্ষ্য করলাম ওর হাত এবং আঙুলগুলো বাঁকা, ওর মুখের কিয়দংশও তাই, সেইজন্য কথাও বেশ জড়ানো।

আমাকে ওর হুইল-চেয়ার ঠেলতে হ'ল না, ওটা স্বয়ংক্রিয়। ও নিজেই হাত দিয়ে গিয়ার ও স্পীড বদলে বদলে গড়গড় করে চালাতে লাগল, আমিও পাল্লা দিতে প্রায় ছুটতে লাগলাম।

ওর প্রথম ক্লাসই অঙ্কের। ক্লাসরুমে আমার কাজ হ'ল ওকে ঠিকমতো বসিয়ে খাতাপত্র বার করে দিয়ে এজেন্সীর মেয়েটির জন্য অপেক্ষা করা। ক্লাসে ঢুকেই প্রথম বাঁদিকের ডেস্কটা ওর জন্য নির্দিষ্ট। আমি ডেস্কটা সামনে এগিয়ে দিতে ও সুন্দরভাবে তার ভেতর ঢুকে গিয়ে হুইল-চেয়ারটিকে অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে ব্যাক গিয়ার দিয়ে পেছনের ডেস্কের সঙ্গে মিলিয়ে পার্ক করে ফেলল। ক্লাসের অন্যান্য ছেলেমেয়েরা হাততালি দিয়ে উঠল, "হোয়াট এ পারফেক্ট পার্কিং, মিরিন্ডা!"

ওর ফর্সা মুখে লজ্জারাঙা আভা; হেসে বলল, "থ্যাংক ইউ!"

আরও আধঘন্টা ওর সঙ্গে রইলাম। হুইল-চেয়ারে ঝোলানো বিশাল ব্যাকপ্যাক থেকে ওর খাতা, পেন্সিল, ক্যালকুলেটর ও ক্রোম-বুক বার করে ওর সামনের ডেস্কে গুছিয়ে দিলাম। ও পটাপট একটার পর একটা অঙ্ক করে ফেলতে লাগল। জীবন যুদ্ধে হার না মানা মেয়ে অঙ্ক পারবে না, তা কী হয় নাকি! এ মেয়ে অনেক দূর যাবে সমস্ত প্রতিকূলতাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে। একটু পরেই এজেন্সীর মেয়েটি চলে এল, আর আমিও "খুব ভাল থেকো মিরিন্ডা" বলে ওর কাছ থেকে বিদায় নিলাম। মনটা এক অপার্থিব আনন্দে ভরে গেল। জীবন – তা সে যেরকমই হোক না কেন, সেটা কেবলমাত্র একটাই; তাই প্রাণ ভরে বেঁচে নিতে হবে। আমি এদের কী অনুপ্রেরণা দেব, উল্টে আমিই এদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখি প্রতিনিয়ত।

এবার চললাম আমার রুটিন অনুযায়ী অঙ্ক ক্লাসে। সেখানে আমাদের বিভাগের মোট সাতজন ছাত্রছাত্রী অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মিলেমিশে অঙ্ক শিখছে। বিশেষভাবে সক্ষম শিক্ষা পদ্ধতিতে একে বলা হয়, 'inclusion'। মনে করা হয় এই 'inclusion secures opportunities for students with disabilities to learn alongside their non-disabled peers in general education classrooms.'

এইখানে কিন্তু আমার কাজটা ভীষণ চ্যালেঞ্জিং। এরা অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের মাঝে ভীষণ হীনমন্যতায় ভোগে, ফলে এরা এই ক্লাসে দেখাতে চায় যে তারা ভীষণ স্মার্ট। আমার কাছ থেকে কোনও সাহায্যই নিতে চায় না। এগুলো অবশ্য প্রতি বছর অগাস্ট মাসের ঘটনা, কারণ ওই সময়ই স্কুলে নতুন ব্যাচ আসে, যারা নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী। আমার ভাগ্যে ওই ফ্রেশম্যানরাই আসে। জানি ওরা কাদার তাল, গড়ে নিতে হবে, তবুও খুব কঠিন কাজ, প্রায় দু'মাস লেগে যায় জেদী ঘোড়া বশ করতে। অক্টোবরের মাঝামাঝি ওরা বুঝে যায় আমি ওদের বন্ধু; তখন আর এক মুশকিল, ভীষণ মায়ায় বেঁধে ফেলে আমাকে।

এইসব কাজের জন্য আমাদের নিয়মিত নানান ট্রেনিং নিতে হয় আর নিত্য নতুন স্ট্র্যাটেজি অবলম্বন করতে হয়। আজ কী আছে কপালে – এই ভেবে অঙ্ক ক্লাসে ঢুকেই দেখি কিয়ারা ডেস্কের ওপর মাথা নীচু করে রয়েছে, বুঝলাম ঝড়ের পূর্বাভাস। শিক্ষিকাকে ইশারায় জিজ্ঞেস করলাম, "কী ব্যাপার?" উনি বললেন, "She is not responding since morning!"

ঝুঁকি না নিয়ে আমাদের বিভাগীয় প্রধানকে ফোন করলাম। উনি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন, পিছু পিছু কাউন্সিলর এবং প্রিন্সিপ্যালও। কী অসম্ভব যত্ন নেন এঁরা প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর জন্য তা নিজে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। প্রিন্সিপ্যাল কিয়ারার ডেস্কের ওপর প্রায় আধশোয়া হয়ে ফিসফিস করে ওর সঙ্গে কথা বলে চললেন, ও নিস্পন্দ, কে জানে ওর মনের অতলে কী চলছে! হয়তো মা আবার ড্রাগ নিয়েছে, কিংবা বাবা ভর্ৎসনা করেছে অথবা এই ক্লাস খুব কঠিন মনে হওয়ায় নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। সে কিছুতেই মাথা তুলল না। প্রিন্সিপ্যাল ও কাউন্সিলর বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

এবার আমাদের বিভাগীয় প্রধান একটু কড়া সুরে বললেন, "তুমি এখানে অন্যদের পড়ার ক্ষতি করছ, আমি বলি কি তুমি আজ কাউন্সিলরের ঘরেই বাকি দিনটা কাটাও। উনি তোমার সমস্যার সমাধান করতে পারবেন।"

হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে মেয়েটি নিজের ব্যাকপ্যাক নিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল, পেছন পেছন প্রিন্সিপ্যাল, কাউন্সিলর ও বিভাগীয় প্রধান। হাতের ওয়াকি টকিতে সিকিউরিটিকে জানানো হ'ল ব্যাটারী-চালিত গাড়িগুলো করে যেন ওর পিছু ধাওয়া করা হয় নিরাপদ দূরত্ব রেখে। সারা ক্লাস থমথম করছে। এ ধরনের ঘটনায় সত্যিই অনেকটা ক্ষতি হয়ে যায়। এর পর শিক্ষিকা একটা শিক্ষামূলক ভিডিও চালিয়ে সকলের মনে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলেন।

নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা স্টাডি স্কিলস ক্লাস করতে আমাদের এই বিশেষভাবে সক্ষম ক্লাসটিতে আসে প্রতিদিন | তখন কিন্তু এই বিশেষভাবে সক্ষম ছাত্রছাত্রীরা অনেক শান্ত এবং পরিশীলিত, কারণ তারা জানে এই ক্লাসে ওরা সবাই অভিন্ন, এটা তাদের 'অন্য জগৎ'|

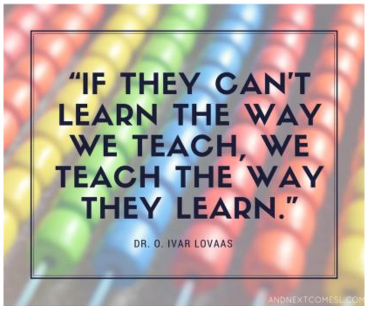

লাঞ্চের পর আমি ক্লাসে গিয়ে দেখলাম কিয়ারাও এসেছে, কেঁদে কেঁদে চোখ মুখ ফোলা, কিন্তু অনেক শান্ত | ওকে আমরা ড্রয়িং খাতা আর রং পেন্সিল দিয়ে বসিয়ে দিলাম | আজ আর ওকে দিয়ে পড়াশোনা করানো যাবে না | এবার আমার কাজ ভীষণ ছটফটে নিককে অঙ্কের হোমওয়ার্ক করিয়ে দিতে হবে | ওকে নিয়ে ক্লাসের একদম শেষে গোল টেবিলে গিয়ে বসলাম | খুব দুরন্ত, এমনিতেই ওর ADHD-র সমস্যা | আজ দেখি আরও অন্যমনস্ক, দু'বার তিনবার বলার পরও বলে, "Ha? What did you say?"

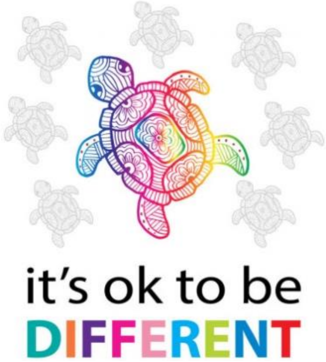

আমি দেখলাম আজ এমনিতেই এত কিছু ঘটে গেছে একে আর বেশী না ঘাঁটানোই ভাল |

আস্তে করে বললাম, "তোমার আজ একদমই মন নেই দেখছি, এগুলো তাহলে আমরা কাল করব | আমি টিচারকে বলে দেব'খন!"

ও কেমন একটা স্বপ্নালু চোখে বলল, "মিসেস জি, আমার মনে বারবার ওই মেয়েটির মুখ ভেসে উঠছে, কিছুতেই ভুলতে পারছি না ওকে!"

সব্বোনাশ! বলে কী এই ছেলে! কিছু উত্তর দিই না |

ও বলে চলে, "কাল একটা ঘরোয়া পার্টিতে আলাপ হ'ল মেয়েটির সঙ্গে, আমাকে চুমু খেল | I can't forget the kiss Mrs. G! I was so happy yesterday!"

আহা রে কিশোর প্রেম! আমার বুকটা টনটন করে উঠল | এবার বললাম, "এত মনখারাপ করো না, আবার নিশ্চয় তোমাদের দেখা হবে, আবার তুমি হ্যাপি হবে, দেখে নিও!"

নিষ্পাপ মুখটা উজ্জ্বল হাসিতে ভরে উঠল |

এভাবেই আমার প্রতিটা দিন জুড়ে থাকে কিছু মুখ, যাদের কোনো মুখোশ নেই |

আমরা অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আমাদের পত্রিকার একজন লেখক "সফিক আহমেদ" সম্প্রতি কলকাতার "প্রসাদ" পত্রিকার কাছ থেকে "পুজো সাহিত্য ২০২১" সম্মান অর্জন করেছেন।
সফিকের এই পথ চলা শুরু "প্রবাস বন্ধু" পত্রিকার হাত ধরে।
প্রবাস বন্ধু পত্রিকার সবার পক্ষ থেকে সফিককে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।
সফিক এভাবে আমাদের এই স্থানীয় পত্রিকাকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলুক।

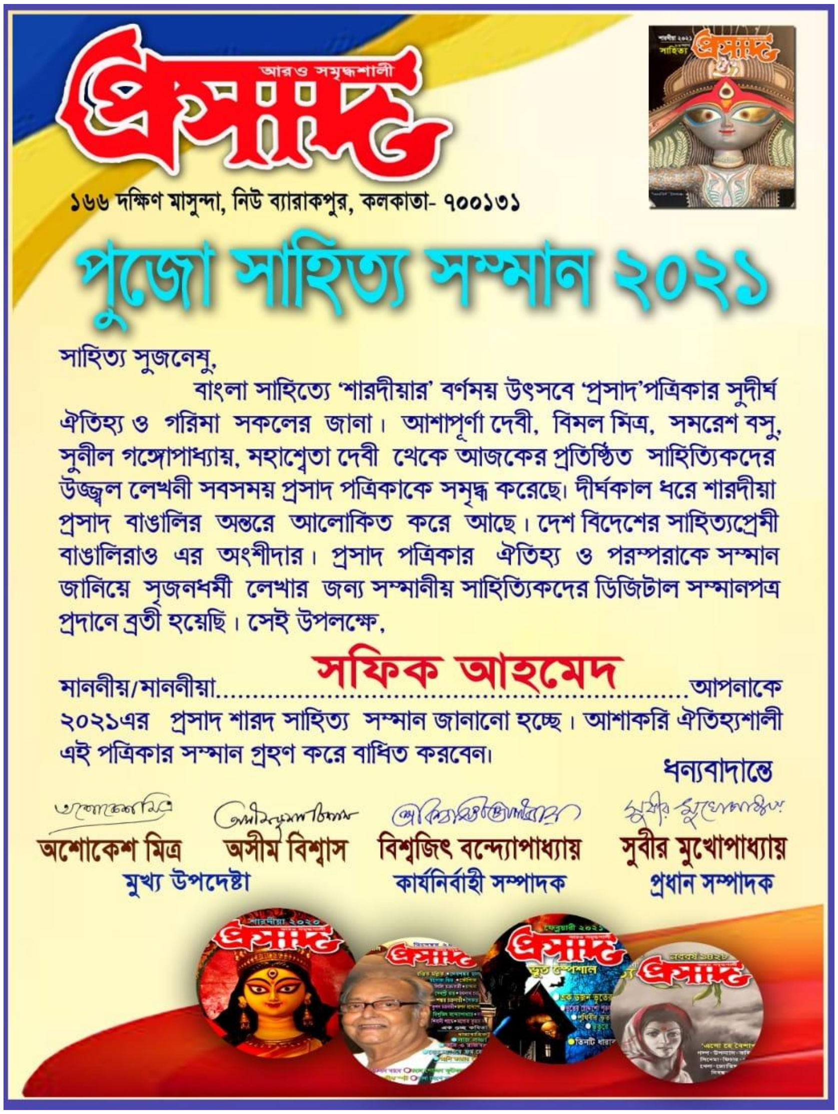
প্রসাদ
আরও সমৃদ্ধশালী
১৬৬ দক্ষিণ মাসুন্দা, নিউ ব্যারাকপুর, কলকাতা- ৭০০১৩১

পুজো সাহিত্য সম্মান ২০২১

সাহিত্য সুজনেষু,
বাংলা সাহিত্যে 'শারদীয়ার' বর্ণময় উৎসবে 'প্রসাদ'পত্রিকার সুদীর্ঘ ঐতিহ্য ও গরিমা সকলের জানা। আশাপূর্ণা দেবী, বিমল মিত্র, সমরেশ বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী থেকে আজকের প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের উজ্জ্বল লেখনী সবসময় প্রসাদ পত্রিকাকে সমৃদ্ধ করেছে। দীর্ঘকাল ধরে শারদীয়া প্রসাদ বাঙালির অন্তরে আলোকিত করে আছে। দেশ বিদেশের সাহিত্যপ্রেমী বাঙালিরাও এর অংশীদার। প্রসাদ পত্রিকার ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে সম্মান জানিয়ে সৃজনধর্মী লেখার জন্য সম্মানীয় সাহিত্যিকদের ডিজিটাল সম্মানপত্র প্রদানে ব্রতী হয়েছি। সেই উপলক্ষে,

মাননীয়/মাননীয়া........**সফিক আহমেদ**........আপনাকে ২০২১এর প্রসাদ শারদ সাহিত্য সম্মান জানানো হচ্ছে। আশাকরি ঐতিহ্যশালী এই পত্রিকার সম্মান গ্রহণ করে বাধিত করবেন।

ধন্যবাদান্তে

অশোকেশ মিত্র, অসীম বিশ্বাস — মুখ্য উপদেষ্টা
বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় — কার্যনির্বাহী সম্পাদক
সুবীর মুখোপাধ্যায় — প্রধান সম্পাদক

"প্রবাস বন্ধু" পত্রিকার আর একজন অত্যন্ত সুদক্ষ লেখক "সুজয় দত্ত"-র প্রথম গদ্য সংকলন
"এক বাক্স চকলেট" প্রকাশিত হ'ল "বাতায়ন" প্রকাশনালয় থেকে।
সুজয়ের লেখার মান ও ভঙ্গী সত্যিই খুব উঁচু দরের। অতি সাবলীল গতিতে সুজয় পৌঁছে দেন
তাঁর সমস্ত গল্পকথা আমাদের কাছে। ভাষা তাঁর কলমে সুললিতভাবে কথা কয়।
শুধু গদ্যেই নয়, কবিতা রচনাতেও তিনি সমান পারদর্শিতার নিদর্শন রেখেছেন।
সুজয়কে আমাদের পাঠচক্রের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।
সুজয়ের রচনা আমাদের পত্রিকার খুব বড় সম্পদ।

সুজয় দত্ত বর্তমানে আমেরিকার ওহায়ো রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যানতত্ত্বের (statistics) অধ্যাপক। জৈবপরিসংখ্যান বিশ্লেষণতত্ত্ব (biostatistics) তাঁর গবেষণার বিষয়। তিনি কলকাতার বরানগরের ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন ছাত্র। কিন্তু তরুণ বয়স থেকেই সাহিত্য তাঁর সৃজনশীলতার মূল প্রকাশমাধ্যম, সাহিত্য তাঁর মনের আরাম। ছোটগল্প, বড় গল্প, প্রবন্ধ ও রম্যরচনার পাশাপাশি নিয়মিত কবিতাও লেখেন। এছাড়া করেছেন বহু অনুবাদ – হিন্দি থেকে বাংলায় এবং বাংলা থেকে ইংরেজিতে। গত পনেরো বছরে আমেরিকার বেশ কয়েকটি সাহিত্য-পত্রিকায় ও পূজাসংখ্যায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি দীর্ঘদিন হিউস্টনের "প্রবাস বন্ধু" ও সিনসিনাটির "দুকুল" পত্রিকার সম্পাদনা ও সহসম্পাদনার কাজও করেছেন। এছাড়া অস্ট্রেলিয়ার "বাতায়ন" পত্রিকাটির জন্মলগ্ন থেকে সেটির সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছেন। এই তিনটি পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাগুলি ছাড়াও "অপার বাংলা" ও "গল্পপাঠ" নামক ওয়েব-ম্যাগাজিনদুটিতে, নিউজার্সির "আনন্দলিপি" নামক পত্রিকাটিতে, ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত পূজাসংকলন "মা তোর মুখের বাণী"তে আর ভারতের মুম্বাই থেকে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ "কবিতা পরবাসে" রয়েছে তাঁর লেখা। সম্প্রতি নিউ জার্সির "আনন্দ মন্দির" তাঁকে "গায়ত্রী গামার্স স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কারে" সম্মানিত করেছে। সাহিত্যরচনা ছাড়া অন্যান্য নেশা বই পড়া, দেশবিদেশের যন্ত্রসঙ্গীত শোনা ও কয়েকটি বাদ্যযন্ত্র বাজানো।

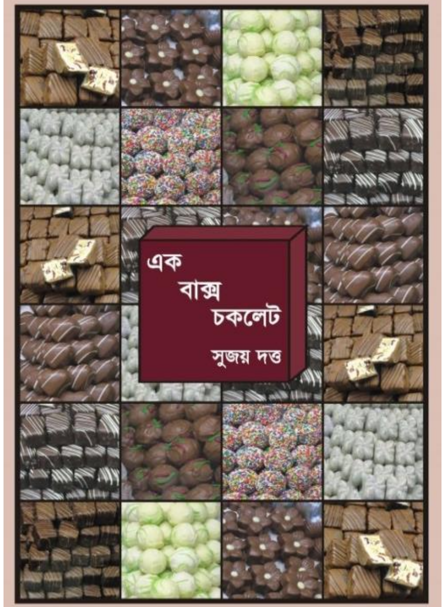

"সুজয়ের গল্প পাঠে উপভোগ্য। শব্দে ও কথায় এই বুনোট তৈরী করা মুখের কথা নয়। এখানেই গল্পকারের সিদ্ধি।"

"আঙ্গিকের কেরামতি দিয়ে গল্পকে স্যিউডো-আধুনিক কিংবা দুষ্পাঠ্য করেননি সুজয়। অনাড়ম্বর কথাশৈলী, পরিমিতিবোধ, বিষয়ের বিন্যাস, এবং বর্ণনা ও গতির মাত্রাবোধ বুঝিয়ে দেয় তিনি লেখায় অতি যত্নবান।"

"সুজয়ের যেকোনো লেখা পড়তে পড়তে একটা কথা মনের ভিতর থেকে উঠে আসে। মনে হয় লেখায় কোনো চাতুর্য্য নেই। জোর করে পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করার প্রয়াস নেই। তাঁর লেখার আন্তরিক ভঙ্গী মন ছুঁয়ে যায়।"

Price US $ 12
AUD $ 15

ISBN: 978-0-6487688-6-9

প্রবাস বন্ধু

শারদীয়া সংখ্যা ১৪২৮ (2021)

প্রবাস বন্ধু পত্রিকায় আমরা শুধুমাত্র বাংলা লেখা প্রকাশ করি।
যাঁরা এই পত্রিকায় লেখা বা আঁকা পাঠাতে ইচ্ছুক,
তাঁরা স্বরচিত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠান।
কেবলমাত্র Google বাঙলায় টাইপ করা লেখা নেওয়া হবে।
https://www.google.com/intl/bn/inputtools/try/ এই ওয়েবসাইটে গিয়ে টাইপ করুন।
লেখা pdf করে পাঠাবেন না। Word-এ পাঠাবেন। প্রসঙ্গত Vrinda টাইপও ঠিক হবে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা:

Malabika Chatterjee
6 Wimberly Court
Decatur, GA 30030
e-mail address: c.malabika@gmail.com

অথবা

Sujay Datta
41 Rotili Lane
Copley, OH 44321
e-mail address: sujayd5247@yahoo.com

সাহিত্য সভার সভ্য হবার বাৎসরিক চাঁদা পরিবার পিছু ২৫ ডলার।
প্রতি মাসের শেষ রবিবার সাহিত্য সভার অধিবেশন পরিচালিত হয় বিভিন্ন সভ্যের বাড়িতে।
বছরে দুবার (নববর্ষ সংখ্যা ও শারদীয়া সংখ্যা) ‘প্রবাস বন্ধু’ পত্রিকা প্রকাশিত হয়।
লেখা পাঠাবার ইচ্ছা থাকলে নববর্ষ আর দুর্গাপুজোর এক মাস আগে লেখা জমা দিন।
এই পত্রিকা প্রকাশিত হয় প্রবাস বন্ধু ওয়েববসাইটে **https://www.prabashbandhu.org/**
রবি ও চন্দ্রা দে-র বাড়িতে পাঠচক্রের গ্রন্থাগারে বেশ কিছু বাংলা বই আছে।
সেগুলি সভ্যরা ব্যবহার করতে পারেন।
সাহিত্য সভার সভ্য হওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন রবি ও চন্দ্রা দে-র ঠিকানায়।

Rabi & Chandra De
8 Prospect Place
Bellaire, TX 77401
Phone: 713-669-0923
e-mail address: rabide@yahoo.com

পূজা অভিনন্দন